জানা অজানা জাপান

প্রথম পর্ব

জানা অজানা জাপান

প্রবীর বিকাশ সরকার

জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন
১৩৮/৭, বি. সি. রোড (বেহালা)
কোলকাতা - ৭০০ ০৩৪
৯৮৩৩৯৫৪৫৮৭

জানা অজানা জাপান

Known Unknown Japan

1st Published in February, 2005

Cover Design . Layout : P. B. Sarker

Publisher : Noriko Miyazawa
Manchitro Publishers Japan
4-15-16-601, Shiratori
Katsushika-ku
Tokyo 125-0063, Japan
Tel+Fax: 81-3-5680-3485
e-mail: noriko@manchitro.net

India Distributor: Ananda Prakashan
C-8, College Street, Kolkata-7
Tel: 9433343532, 55290983

উৎসর্গ

একুশ বছর ধরে জাপানে যাঁদের অশেষ ভালবাসা,

যত্ন আর আদরে

আমার জীবন ধন্য হয়েছে

তাঁদের প্রতি অনন্ত কৃতজ্ঞতাস্বরূপ——

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে (রাজনৈতিক ছড়া)
মানচিত্র পাবলিশার্স জাপান (১৯৯৫)
অবাক কান্ড (শিশুতোষ ছড়া)
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (২০০২)
তালা (উপন্যাস)
স্বরব্যঞ্জন (২০০৫)

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

টিনার জন্য ছড়া (শিশুতোষ ছড়া)
ঘরকা না ঘাটকা (রাজনৈতিক ছড়া)
ইতিহাস আছে, ইতিহাসে নেই: জাপানে রবীন্দ্রচিহ্নের সন্ধানে (ইতিহাস)
জানা অজানা জাপান (প্রবন্ধ, দ্বিতীয় পর্ব)
সাকুরা সাকুরা (প্রবন্ধ)
অপরাহ্নে বৃষ্টি (উপন্যাস)
অভিজিৎ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস)
গভীর গোপনে বাজে (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস)
লাল ফড়িং (মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস)
জলস্মৃতি (পুনর্জন্ম বিষয়ক উপন্যাস)
শিমুল ফুটেছে মনে (অতীত দিনের কাহিনী)

সবিনয় নিবেদন

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকা, সাময়িকী এবং ইন্টারনেট ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। বিক্ষিপ্ত এই রচনাগুলো হারিয়ে যাবার আশংকায় গ্রন্থস্থ করা। যতখানি সম্ভব সংশোধন এবং সংযোজন করার চেষ্টা করেছি। কয়েকটি প্রবন্ধ বাদ দিলে আর সবগুলোই চিন্তাশীল গবেষণার বিষয়। অবশ্য গবেষণার তাড়নায় এগুলো লেখার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হয়নি একমাত্র সময় স্বল্পতার কারণে। চাকরী, সংসার এবং কাগজ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে চলে গেছে প্রবাসের অধিকাংশ সময়।

এশিয়ার প্রথম শিল্পোন্নত দেশ জাপানের সুপ্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে লিখতে যাওয়া সময় ও শিক্ষাসাপেক্ষ ব্যাপার। অতুলনীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাচেতনার বিস্ময় এই দেশের সর্বত্র বিদ্যমান! পর্যাপ্ত সময় না থাকলে তা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। জাপানের অনেক বিষয়ই বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত তুলে ধরা হয়নি। দেশটিকে আমরা খোলাচোখে 'ইলেক্ট্রোনিক্স সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে চিনি, জানি কিন্তু প্রকৃত জাপান সম্পূর্ণ অন্য জিনিস! গ্রন্থে জাপানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একটি ধারনা বাঙালি পাঠক-পাঠিকাকে দেবার চেষ্টা করেছি। তাতে অনেক অজানা ঘটনা ও তথ্য পাঠ করে অনেকেই জাপানকে এখন থেকে স্বদৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা ও বোঝার সুযোগ পাবেন বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

অনেক প্রবন্ধে পাঠক একই তথ্য, ঘটনা বা বিষয়ের পুনরাবৃত্তি খুঁজে পাবেন---যা বিরক্তিকর হলেও আমি অপারগ এই কারণে যে, রচনাগুলো বিভিন্ন সময় রচিত ফলে প্রসঙ্গক্রমে বারংবার এসেছে। বিষয়টি পাঠক সঙ্গত দৃষ্টিতে দেখলে কৃতার্থ হব।

অনুজ পীযূষকান্তি সরকার নিজে অধিকাংশ প্রবন্ধের পান্ডুলিপি কম্পিউটারে অক্ষরবিন্যাস এবং সংশোধন করে দিয়েছেন। তাকেসহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

'ইউনিভার্সাল ডিজাইন' ধারণাকে স্মরণে রেখে মুদ্রাক্ষর বড় রাখা হল, যাতে করে সকল বয়সী পাঠকের পড়ার সুবিধে হয়।

সূচিপত্র

জাপান-বাংলা
সম্পর্কের
প্রাণপুরুষ
তেনশিন
প্রিয়ম্বদার জন্য তেনশিনের আকুলতা-ব্যাকুলতা
বঙ্গভূমির প্রতি গভীর ভালবাসার জন্ম দিয়েছিল তাঁর
মনে। প্রিয়সখাকে জলবৎ আকৃত্রিমভাবে পাবার জন্য
একটি চিঠিতে বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহ ব্যক্ত
করেছিলেন। কিন্তু তা থেকে গেল চিরদিনের জন্য
অসমাপ্ত

জাপানের ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা, এদেশে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাস রচনা এবং আলোচনায় যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি কাকুজো ওকাকুরা তেনশিন (১৮৬২-১৯১৩), তেনশিন তাঁর ছদ্মনাম। জাপানি সমাজে একটি নমস্য নাম। তিনি কানাগাওয়া-জেলার বন্দরনগরী য়োকোহামার সামুরাই বংশোদ্ভূত ধনী রেশম বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কানায়েমোন এবং মাতার নাম কোনো। শিশুকালেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। জন বেলার (John Baller) এর প্রাইভেট স্কুলে ইংরেজি শিক্ষালাভ করেন শিশুবয়সে। ১৮৭১ সালে তাঁর পিতা তাঁকে নাগানোবে বৌদ্ধ মন্দিরে চীনা ভাষা শিক্ষার্জনের জন্য প্রেরণ করেন।

কৈশোরে তাঁর পিতা য়োকোহামা থেকে রাজধানী টোকিয়োর নিহোনবাশি, তৎকালীন প্রসিদ্ধ নগরীতে স্থানান্তরিত হলে তিনি টোকিয়ো গাইকোকুগোগাক্কো তথা টোকিয়ো বিদেশী ভাষা বিদ্যালয় এবং পরে টোকিয়ো কাইসেইগাক্কো (পরবর্তীকালে টোকিয়ো ইম্পেরিয়াল ইউনি-ভার্সিটি)তে শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফ্যাকাল্টি অব লেটার্স বিভাগে অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষার্জন করেন। তিনি ছিলেন এই বিভাগের প্রথম শিক্ষার্থীদলের অন্যতম। এই সময়ে জাপানে বসবাসরত জনৈক আমেরিকাবাসী সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আর্নেস্ট ফেনোলসা (১৮৫৩-১৯০৮) মেইজি সরকারের আমন্ত্রণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন ১৮৭৮ সালে। তাঁর কাছে তেনশিন দর্শন শিক্ষালাভ করেন। তাঁর প্রভাবেই তেনশিন ক্রমে ক্রমে কলাশিল্পের ইতিহাসে মনোযোগী হন। তাঁর জীবনে ফেনোলসার চিন্তা এবং কর্মকান্ড গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শুধু ফেনোলসাই নয়, আরও কতিপয় বিদেশী গবেষক ও শিক্ষাবিদের কর্মক্ষেত্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। যাঁরা তখন জাপানি ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি এবং শিল্পকলার উপাদানসমূহ সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন। জাপানি সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীদের এই আগ্রহ তাঁকে স্বদেশ এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক কলাশিল্পের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে।

১৮৮০ সালে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সঙ্গীত গবেষক হিসেবে

নিযুক্ত হন। অধ্যাপক ফেনোলসার সঙ্গে তিনি নারা, কিয়োতোর প্রাচীন শিনতো ও বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন এবং ব্যারন রিউইচি কুকিসহ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরসমূহের জরিপকাজ সম্পাদন করেন ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত। ১৮৮৫ সালে চিত্রকলা সংরক্ষণ সমিতি (Society for the Appreciation of Paintings) প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষাগুরু ফেনোলসার সঙ্গে যৌথভাবে। ১৮৮৬ সালে এক বছরের জন্য তিনি শিল্পকলার গবেষক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও য়োরোপ সফর করেন। ফিরে এসে সরকারি পরিকল্পনাধীনে ১৮৮৭ সালে টোকিয়ো বিজুৎসুগাক্কো (বর্তমানে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ও সঙ্গীত বিভাগ (টোকিয়ো গেইজুৎসু দাইগাকু) প্রতিষ্ঠা করেন অন্যান্য শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায়। পরবর্তীকালে তিনি হন এর অধ্যক্ষ। এটাই জাপানের প্রথম জাতীয় চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর এখান থেকেই নতুন শিল্পকলা আন্দোলনের সূচনা আর তেনশিনেরও অগ্রযাত্রার দুয়ার একটার পর একটা উন্মুক্ত হতে থাকে এই সময়ে। একাধিক সরকারি-বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন। ১৮৮৮ সালে রাজকীয় দপ্তরের অধীন জাতীয় জাদুঘর (বর্তমানে টোকিয়ো ন্যাশনাল মিউজিয়াম) এর রক্ষক-প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার হাতে নেন। ১৮৮৯ সালে তিনি প্রকাশ করেন রিউইচি কুকি এবং আসাহিশিম্বুন পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামলেখক কেনজো তাকাহাশি এর সঙ্গে জাপানের প্রথম কলাশিল্প বিষয়ক সাময়িকী 'কোক্কা' বা 'জাতীয় সৌরভ'। এই সমায়িকী জাপানি এবং কলকাতাকেন্দ্রিক 'ইয়াংবেঙ্গল' কলাশিল্পীদের আন্দোলন, চিন্তাবিনিময়কে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। প্রকাশিত হয়েছে জাপানি তরুণ চিত্রশিল্পীদের পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু প্রমুখের চিত্রকর্ম। ১৮৯০ সালে তেনশিন টোকিয়ো বিজুৎসুগাক্কোর অধ্যক্ষ এবং একইসঙ্গে রাজকীয় শিল্পকলা আকাদেমির বিচারক নিযুক্ত হন। ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন জাপান তরুণ চিত্রশিল্পী সমিতি (Japanese Association of Young Painters)। ১৮৯৬ সালে জাপান চিত্রকলা সমিতির সহযোগী পরিচালক, প্রাচীন শিনতো ও বৌদ্ধ মন্দির সংরক্ষণ

কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৮ সালে রাজকীয় জাদুঘরের ট্রাস্টী।

কিন্তু ১৮৯৮ সালেই তেনশিনকে রাজকীয় জাদুঘরের ট্রাস্টী এবং টোকিয়ো বিজুৎসুগাক্কোর অধ্যক্ষের পদ থেকে জোরপূর্বক অপসারণ করা হয় ব্যারন রিউইচি কুকির স্ত্রী হাৎসুকোর সঙ্গে পরকীয়া প্রেমঘটিত কেলেঙ্কারির কারণে। তাতে মোটেই দমে না গিয়ে অগ্রসরবাদী তেনশিন তাঁর চার জন বিশ্বস্ত অনুসারীকে নিয়ে বিকল্প 'জাপান আর্ট ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৯০১ সালে ইবারাকি-জেলার সমুদ্রতীরসংলগ্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অমরাবতী 'ইজুরা' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তর এবং সেখানে চার অনুসারী--পরবর্তীকালের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী তাইকান য়োকোয়ামা, কানজান শিমোমুরা, শুনসো হিশিদা এবং বুজান কিমুরার জন্য বসবাসেরও ব্যবস্থা করেন।

১৯০২ সালে তাঁর প্রথম ভারত ভ্রমণ তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা। জাপান ও ভারতের মধ্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। বিশেষ করে নতুন এক আলোকিত বন্ধুর সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটে। ভারতীয় শিল্পীরা প্রাচ্যেরই আরেক সমৃদ্ধ কলাশিল্পের ধারণার সঙ্গে নিজেদের চিন্তার বিনিময় ঘটানোর সুযোগ অর্জন করেন।

১৯০৫-৬ সালে আমেরিকার বোস্টন জাদুঘরে স্থাপিত চীন ও জাপানি কলাশিল্প বিভাগের প্রধান পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তেনশিন স্বদেশী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯১২ সালে চীন, ভারত এবং য়োরোপ সফর করে আমেরিকায় যান। ১৯১৩ সালে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ফিরে আসেন স্বদেশে। ফিরে এসেই প্রাচীন শিনতো ও বৌদ্ধ মন্দিরের দেয়ালচিত্রগুলোকে রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। মনে মনে হয়তো একাজ করার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা বাধ সেধেছিল। এই বছরেই ২রা সেপ্টেম্বর মাত্র ৫১ বছর বয়সে অসাধারণ প্রতিভাধর পন্ডিত, বিংশ শতকের এক মহান চিন্তানায়ক তেনশিন ওকাকুরা ইহলোক ত্যাগ করেন।

যুগপুরুষ তেনশিন দীর্ঘায়ু লাভ না করলেও জীবিতকালে তাঁর দর্শন, একাধিক কর্মকান্ড অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার একথা না বললেও চলে।

বিশ্বজনীনতা এবং প্রাচ্যাদর্শ ছিল তাঁর সারা জীবনের আরাধনা ও সাধনা। আর এদুটি প্রবৃত্তির স্ফুরণ ঘটেছিল তাঁর শিশুকালেই যখন তিনি বিদেশী শিক্ষক ও বিদেশী ভাষা-সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি এতই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজি ভাষার প্রতি যে আপন মাতৃভাষা পর্যন্ত আত্মস্থ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক নির্দেশনা বা ভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির উজ্জ্বল রশ্মি তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি-সভ্যতার গুপ্ত-সুপ্ত সৌন্দর্যের উপর আলো ফেলেছিল। তুলেছিল ছাত্রজীবনে তাঁর ভেতরে গভীরতর আলোড়ন। ফলে উদ্যোগে আপন সংস্কৃতির সুরক্ষা ও মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছিলেন--কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অসাধ্য সাধনের দায়িত্বভার। দায়িত্ব পালন, সুযোগের সদ্ব্যবহার যে সবসময় মসৃণভাবে সম্পাদিত হয়েছে তা নয়; ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বা ভুল-ভ্রান্তির কারণে বাধা এলেও কোন অবস্থাতেই তিনি কখনো পিছপা হননি। প্রবল জাতীয়তাবাদী, চীনা কনফুশীয় পন্থানুসারী সামুরাই বংশের উত্তরাধিকারী তেনশিনের ভেতরেও মৃত্যু পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল স্বাদেশিকতার স্রোত। আপন সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পাশে স্থাপন করার তাগিদ আমৃত্যু অনুভব করেছিলেন। পাশাপাশি পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নাসিকতা, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ, রাজনৈতিক শোষণ এবং বৈষম্য তাঁকে ঘোর জাতীয়তাবাদীতে পরিণত করেছিল। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর অনন্যসাধারণ গ্রন্থ 'দি বুক অফ টী' এই চিন্তাচেতনারই অসামান্য ফসল। যা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির দাম্ভিকতা এবং অবজ্ঞার প্রতি প্রাচ্যসংস্কৃতির এক তীব্র প্রতিবাদ বললে কমই বলা হয়। গত একশ বছর ধরেই 'চায়ের বই' আমেরিকা ও য়োরোপে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আছে। অন্যদিকে আপন সংস্কৃতির উৎস খুঁজতে গিয়ে তেনশিন এশিয়ার চীন ও ভারত--এই দুই মহান সভ্যতার বুকে প্রদক্ষীণ করে খুঁজে পেয়েছিলেন এক আপ্তদর্শন 'এশিয়া এক--এশিয়া ইজ ওয়ান'।

তেনশিন সম্পর্কে বাংলাভাষী পন্ডিত.রবীন্দ্র-গবেষক.বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. কাজুও আজুমা বলেন, "আধুনিক ভারত তার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রস্থল বঙ্গদেশ। ঠিক এ সময়ে জাপানেও আধুনিক কলাশিল্পের নতুন ধারাটি তেনশিন ওকাকুরা এবং তাঁর

'নিহোন বিজুৎসুইনে'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অর্থাৎ একই সময় উভয় দেশেই কলাশিল্প, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিকাশ ঘটেছিল। ভারত ও জাপানের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দুই স্রোতের মিলন হয়েছিল এই বঙ্গভূমিতে। এই মিলন ঘটানোর প্রথম মানুষ হলেন তেনশিন ওকাকুরা। সেদিন তেনশিন ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপানের কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সহায়ক হয়েছিলেন। সেদিন তিনি শুধু নিজেকেই ভারত কল্যাণে বিলিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং শোওকিন কাৎসুতা প্রমুখকে বঙ্গভূমিতে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বিরাট ভূমিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য।" বঙ্গভূমিতে তেনশিনের গমন এবং তৎকালীন জাতীয়তাবাদী বাঙালি নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে সখ্যতা ভারতে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিল --রেখেছিল সুদূরপ্রসারী প্রভাব। বিপ্লবপন্থী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা 'অনুশীলন সমিতি' গঠনে পরোক্ষভাবে প্রেরণা এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন তেনশিন। স্বাধীনতা অর্জনের যে অনল-মন্ত্র বাংলার বিপ্লবীদের অন্তরে তিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন তার উত্তাপ পরবর্তীকালে জাপান পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল তেনশিনের দেশ জাপানের কল্যাণেই। কলকাতায় তাঁর গুপ্ত কর্মকান্ড, শলাপরামর্শের কথা বৃটিশ প্রশাসনের কানেও পৌঁছেছিল। ফলে তাঁর গতিবিধির উপর ছিল গোয়েন্দাদের কড়াদৃষ্টি। বন্ধুবর স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর এই ধরনের সংহিস চিন্তাকে সমর্থন করেননি। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ভারতের অভীষ্ট মুক্তি যে সহজে আসবে না সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তেনশিন ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন।

তেনশিন যখন তাঁর বান্ধবী ভগ্নি নিবেদিতার আমন্ত্রণে ভারত ভ্রমণ করেন তখন কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি নবজাগরণের আলোড়ন লক্ষ করেন তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দনাল বসু প্রমুখের মধ্যে। তাঁদের অগ্রণী ভূমিকায় বাংলার শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত নতুন পল্লবে পল্লবিত হচ্ছিল। এই সময় তিনি কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নন্দলাল বসু, লর্ড কার্জন প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত

হন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্যতা গড়ে ওঠে। তাঁর নামের 'কুরা' শব্দটিকে বাংলা 'খুড়া'র মতো শোনায় বলে স্বামীজী তেনশিনকে 'আঙ্কেল' বলে সম্বোধন করতেন। স্বামীজীর চিন্তা ও আদর্শ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। স্বামীজীকে তখন জাপানের কিয়োতো নগরে অনুষ্ঠিতব্য এক ধর্মসম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে স্বামীজী যোগদান করতে পারেননি।

কলকাতায় তেনশিন আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। ভারতে দশ মাসব্যাপী অবস্থানকালে বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থস্থান, মন্দিরসমূহ পরিদর্শন করেন। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্রভূমি বুদ্ধগয়াতে জাপানিদের জন্য একটি সরাইখানা এবং মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তাঁকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন স্বামীজী, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, লর্ড কার্জন প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। এখানেই রচনা করেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত দুটি গ্রন্থঃ 'The Awakening of the East' এবং 'The Ideals of the East' এর পান্ডুলিপি। এই গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর এশিয়া-কেন্দ্রিক চিন্তাচেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর আপ্তদর্শন 'এশিয়া ইজ ওয়ান' এই বাক্যবন্ধের মধ্যে নিহিত আছে। প্রাচ্যের ধ্যান-জ্ঞান-ধর্ম-আদর্শ-দর্শনকে সমুন্নত রাখার প্রকল্প হিসেবে ভারত-জাপান শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যৌথভাবে। অবশ্য তেনশিনের মৃত্যুর পর ১৯২৪ সালে জাপান ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক বক্তৃতায় বন্ধুবর তেনশিনের এশিয়াবাদী চিন্তাপ্রসূত 'এশিয়া ইজ ওয়ান' এই দর্শনের মধ্যে বিশ্ব-জনীনতার পরিবর্তে চিন্তার সংকীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে বলে সমালোচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তেনশিন এশিয়ার সকল সংস্কৃতির মধ্যে এক ঐক্যের সুর আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার স্বপ্নও দেখেছিলেন। আন্তর্জাতিকতাবাদের তিনি কখনোই বিরোধী ছিলেন না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে বহু কিছু নিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যবাসীর উদারতা ও সংকীর্ণতা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর উদারনৈতিক মানস গড়েছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে--তেনশিনও

তাই। দুজনে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই চীন-ভারত-জাপান প্রাচ্যের এই তিন মহাশক্তি যা সমগ্র এশিয়াকে জড়িয়ে রেখেছে তার আধ্যাত্মিক পরিচয়কে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিলেন তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে। তেনশিন তাঁর এশিয়া তথা প্রাচ্যবাদী চিন্তা-দর্শনের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমকক্ষ হতে চেয়েছিলেন। এশিয়াকে বাদ দিয়ে বিশ্বজনীনতার প্রসঙ্গ আসে কি করে? নিজকে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত ব্রহ্মাকে, বিশ্বকে, সর্বোপরি বিশ্বমানবকে জানার চেষ্টা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়--এটাই ছিল তাঁর মূলবাণী। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাপানি রাজকীয় সামরিক বাহিনী জাতীয়তাবাদী দুই মনীষী যথাক্রমে তেনশিন এবং রবীন্দ্রনাথের 'এশিয়া ইজ ওয়ান' এবং 'প্রার্থনা' কবিতাকে তাঁদের প্রচারণা কাজের স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন শ্বেতাঙ্গ শাসিত মহাএশিয়ার মুক্তির লক্ষ্যে। আজ এশিয়ার অধিকাংশ জাতিই মুক্ত। আজকে জাপান নিজেকে আবিষ্কার করে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ শুধু নয়--অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে ছাড়িয়ে গেছে। সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন হতে না পারলেও তার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের দেশ দুই বাংলা বা ভারতবর্ষ কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে আছে তা আর না বললেও চলে। বলা যায় আধুনিকতা এসে ভারতবর্ষ নামক অচলায়তনটিকে নাড়া দিয়েছে জাপানের শতাধিক বছর পরে।

তথাপি একদিন তেনশিন ও রবীন্দ্রনাথের পৌরহিত্যে জাপান-বাংলা সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কের যে সূচনা হয়েছিল গত ২০০২ সালে শততমবর্ষ অতিক্রম করেছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত নীরবে, নিঃশব্দে! ঘটা করে একটি বড় স্মরণসভার আয়োজন কিংবা তাঁদের উদ্দেশে একুশ শতকের আলোমাখা একটি অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করা যেত নাকি?

তেনশিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করলেও বাংলা অঞ্চল তাঁর হৃদয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই, তা নাহলে তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে ভারতে পাঠাতেন না, নিজেও পুনরায় ১৯১২ সালে কলকাতা ভ্রমণ করতেন না। তাঁর প্রথম ভারত অভিজ্ঞতা প্রকাশ উপলক্ষে তিনি জাপানে ফিরে এসে তৎকালীন তেইকোকু বিশ্ববিদ্যালয়ে (টোকিয়ো

বিশ্ববিদ্যালয়) একটি বক্তৃতার আয়োজন করেন। দুঘন্টার অনুষ্ঠান ছিল সেটি। বক্তৃতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টসহ বেশ কয়েকজন তখনকার যশস্বী অধ্যাপক। সেদিন ছিল বৃষ্টির দিন, তা সত্ত্বেও প্রায় সত্তর জন বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তি উপস্থিত থেকে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন।

কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে জাপানি কলাশিল্পের যে অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মূলে রয়েছে তেনশিন ওকাকুরার বিরাট ভূমিকা ও পরবর্তীকালে তাঁরই শিষ্যদের একাগ্রতা। যাঁরা শান্তিনিকেতনে জাপানি চিত্র আঁকার কলাকৌশল শিক্ষাদান করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। বিশেষ করে তেনশিনের অন্যতম প্রধান শিষ্য চিত্রশিল্পী কাম্পো আরাই এর অবদান অনেক। শিক্ষাগুরু তেনশিনের মতোই কাম্পো আরাই তথাগত বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর ভারতভ্রমণ লিপিতে ঘুরে ফিরে রবীন্দ্রনাথের কথা, শান্তিনিকেতনের স্মৃতি আবর্তিত হয়েছে। তাঁর আঁকা চিত্র কবিগুরুর কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

ভারত ভ্রমণকালে তেনশিন কলকাতা ছাড়াও বুদ্ধগয়া, গোয়ালিওর, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে ভারতের হৃদয়সত্ত্বাকে বোঝার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরই আহবানে রবীন্দ্রনাথ জাপান ভ্রমণ করেন, কিন্তু তখন বন্ধুবর তেনশিন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পরিতাপের বিষয় যে, পন্ডিত তেনশিন বেঁচে থাকলে তিনি কবিগুরুকে কিভাবে গ্রহণ করতেন তা ভাবলে নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ জাপান ভ্রমণকালে ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখে জানান যে, জাপানে তেনশিনের মতো এমন পন্ডিত আর কেউ নেই।

তেনশিন ছিলেন জাপানি কলাশিল্পের নবজাগরণের অগ্রদূত, জাপানে বৃহত্তর এশিয়া ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার দ্বার উন্মোচনকারী। মাত্র চার জন শিষ্য নিয়ে নিহোন বিজুৎসুইন গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর শিল্পকলা আন্দোলনের সঙ্গে সেদিন যাঁরা সহযোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চিত্রশিল্পী তাইকান য়োকোয়ামা ১৯৩৭ সালে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হন (Order of Cultural Merit) আধুনিক জাপানি

চিত্রকলাশিল্পে বিশেষ অবদান রাখার জন্য। একইসঙ্গে তিনি ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলার পুরোধা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী। কলকাতায় অবস্থানকালে তাইকান অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জাপানি চিত্র-জাপানি চিত্রকলার 'ওয়াশপদ্ধতি' শিখিয়েছিলেন।

শেষ জীবনে ভারতবর্ষের যে বিষয়টি তেনশিনকে প্রভাবিত করেছিল তা হল হিন্দু জীবনধারার চার পর্বের তৃতীয় পর্ব বানপ্রস্থ। বার্ধক্য এসে গেলে ঈশ্বরের সাধনায় নিয়োজিত হতে হবে সংসার ও সর্বপ্রকার মায়া-বন্ধন ত্যাগ করে পর্বতে বা অরণ্যের কোন আশ্রমে চলে গিয়ে। সেখানেই ইহলীলা সাঙ্গ হবে। তেনশিন টোকিয়োর ব্যস্ত ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন একেবারে সমুদ্রের ধারে নিরিবিলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অমরাবতী 'ইজুরা' নামক স্থানে। সেখানেই তাঁর স্থাপিত শিল্পকলা গবেষণা কেন্দ্রে মৃত্যু পর্যন্ত শিল্পভাবনা আর মানবপ্রেমে আত্মমগ্ন ছিলেন। এই বানপ্রস্থ তাঁকে জীবনের শেষে বেলায় এক অপ্রত্যাশিত স্বর্গীয় আনন্দে উদ্বেলিত করেছিল।

১৯৯৭ সালে ইজুরাতে তেনশিনের আপন বসতবাড়িতে 'তেনশিন মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অব আর্ট, ইবারাকি' উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী প্রদর্শনী ছিল 'তেনশিন ও ইজুরার সাক্কাতাচি' বা 'তেনশিন ও ইজুরার শিল্পীবৃন্দ' শীর্ষক এক শিল্পকলা প্রদর্শনী। তেনশিন ও তাঁর শিষ্যদেরকে কেন্দ্র করেই মূলত জাদুঘরটি স্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে তেনশিনের চিত্রকর্ম, দলিলপত্র, ব্যবহার্য সামগ্রী। সংযুক্ত করা হয়েছে ভিডিও থিয়েটার যেখানে ভিডিওর মাধ্যমে তেনশিনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে চিত্রায়িত তথ্যাদি দর্শন করা সম্ভব। এখানে সংরক্ষিত আছে তেনশিনকে লিখিত বাংলাদেশের মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪টি দুর্লভ চিঠি। তেনশিনের মৃত্যুর পর তাঁর অনুজের বাড়িতে সেগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল। কলকাতাতেই নীরবে, নিভৃতে তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল নিষ্কাম প্রেমের সম্পর্ক। যার প্রকাশ ঘটেছে তেনশিনকে নিজ থেকে লেখা প্রিয়ম্বদার প্রথম পত্রের মাধ্যমে। তেনশিন তাঁকে ১৯টি চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলো বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত আছে।

প্রিয়ম্বদা ১৮৭১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের যশোহরে এক ব্রাহ্মণ

জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কৃষ্ণকুমার, মাতা প্রসন্নময়ী চৌধুরী। তাঁর মাতামহ দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। প্রসন্নময়ী বিয়ের পরও তাঁর পিতার সঙ্গে থাকতেন, ফলে তাঁর পক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। দুর্গাদাস ছিলেন সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এক কুসংস্কারমুক্ত উদার ব্যক্তিত্বের মানুষ। তাঁরই মেয়ে প্রসন্নময়ী ছিলেন তাঁর সময়কালে অগ্রসর এক কবি।

প্রসন্নময়ীর তিন পুত্রকন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন খ্যাতিমান ব্যারিস্টার, মেয়ে প্রিয়ম্বদা কবি এবং কনিষ্ঠপুত্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক.প্রাবন্ধিক এবং 'সবুজপত্র' সাময়িকীর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। প্রিয়ম্বদা ১৮৮২ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৯২ সালে তাঁর বিয়ে হয় আইজনজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের মাত্র তিন বছর পর স্বামী যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯০৬ সালে তাঁদের একমাত্র সন্তান ছেলে তারাকুমারও মাত্র এগারো বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করে।

১৯১২ সালে তেনশিন যখন কলকাতায় বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথের বাড়ির অতিথি---সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখে সুরেন্দ্রনাথ এক সুধীসমাবেশের আয়োজন করেন। সেখানে ৪১ বছর বয়স্কা বিধবা প্রিয়ম্বদাও আমন্ত্রিত হন। শুভ্ররঙের শাড়ি পরিহিতা প্রিয়ম্বদাকে দেখে তেনশিন বাকরহিত মুগ্ধ হয়ে পড়েন। প্রিয়ম্বদাও আলোড়িত হন তেনশিনকে দেখে। আবার ৬ই অক্টোবর এক চা-সমাবেশেও দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু কেউ কাউকে তাঁদের ভালোলাগার কথা প্রকাশ করেননি তখনও। জাপানে ফিরে আসার পর তেনশিন প্রিয়ম্বদার কাছ থেকে অকস্মাৎ একটি চিঠি পান। তেনশিনও তার যথারীতি উত্তর দেন। এইভাবেই দুজনের মধ্যে অনেকগুলো চিঠির আদানপ্রদান ঘটে। সংবেদনশীল চিঠিগুলো প্রমাণ করে দুজনের মধ্যে গভীর একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কের অন্তঃস্থলে সৃষ্টি হয়েছিল অদৃশ্য এক উন্মাতাল নদীর। যা তাঁরা অতিক্রম করে কোনদিন আর মিলিত হতে পারেননি। বাধা হয়েছিল অজেয় সময়। ১৯১৩ সালে তেনশিন মৃত্যুলোকে যাত্রা করেন। আর প্রিয়ম্বদা তাঁর ছোট্ট কুঠরিতে

বার্ধক্যজনিত মৃত্যু পর্যন্ত তেনশিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর দিনপঞ্জিতে তেনশিনকে নিয়ে অনেক কথা লিখে রেখে গেছেন।

এটা ঠিক যে, নারীর প্রতি তেনশিনের আর্দ্রতা, দুর্বলতা একটু বেশি ছিল। একাধিক নারীকে তিনি প্রেম নিবেদন থেকে শুরু করে বিয়ে পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন। কারও কারও উষ্ণ সান্নিধ্যও লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হাৎসুকো, ভগিনী নিবেদিতা, সরলা ঘোষাল, এম্‌মা থার্সবি, ইসাবেলা গার্ডনার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়েছিলেন বাংলার এক নারী কবির প্রেমে। প্রিয়ম্বদার জন্য তেনশিনের আকুলতা-ব্যাকুলতা বঙ্গভূমির প্রতি গভীর ভালবাসার জন্ম দিয়েছিল তাঁর মনে। প্রিয়সখাকে জলবৎ অকৃত্রিমভাবে পাবার জন্য একটি চিঠিতে বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তা থেকে গেল চিরদিনের জন্য অসমাপ্ত।

আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়, সবকিছু ছাড়িয়ে ছাপিয়ে তাঁদের এই মানবিক সম্পর্ক জাপান-বাংলা সম্পর্কের অমরত্ব রচনা করে গেছে।

তেনশিন ওকাকুরা আধুনিক জাপানের ইতিহাসে এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর নাম আজ বিস্মরণের তলে তলিয়ে যেতে বসেছে যেন। কিন্তু প্রবীণদের মনে তিনি ঈশ্বরের মতোই প্রবল ভাবমূর্তি নিয়ে বিরাজিত। তার প্রমাণ রয়েছে মৃত্যুর পর এক বছরব্যাপী তাঁর সমাধিতে মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের যে ঢল নেমেছিল সেই ঘটনার মধ্যে!

তথ্যসূত্র:

১. ওকাকুরা তেনশিন (জীবনী)
২. ওতাকুরা তেনশিন প্রদর্শনী প্রকাশনা/ওয়াতারিউম, জাপান
৩. মেইজি বুনগাকু সংগ্রহ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies এর Autumn ২০০৩ সংখ্যায় বন্ধুবর নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ Naughty and Lotus Heart: The Okakura-Priyambada Correspondence থেকে কিছু তথ্য গ্রহণ করেছি

---

* ১৯৯৮ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত
* আলোকচিত্র: হেইবোনশা পাবলিশার; রেইতাকু বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

১০০ বছর একটি শতাব্দী! সুদীর্ঘ একটা সময়! কত ঘটনা, কত স্মৃতি এর গর্ভে জমা হয়ে আছে। আমরা কি সব জানি? ২০০২ সাল ছিল জাপান এবং বাংলা অঞ্চলের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের শতবর্ষপূর্তি। আমরা কি তার খবর রাখি? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল এই ১০০টি বছর নিঃসন্দেহে।

জাপান ঐ বছরই ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ ও ৩০বর্ষপূর্তি পালন করেছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ঐ শতবর্ষপূর্তির ঘটনাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়! কিন্তু বাস্তবতা এই যে, শতবর্ষপ্রাচীন এই অমূল্য ইতিহাস আজ দুই অঞ্চলেই বিস্মরণের তলে তলিয়ে গেছে। এই বিস্মরণের অন্যতম কারণ একদিকে মার্কিনী ও য়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রবল প্রতাপ, অর্থনৈতিক ব্যবধান আর অন্যদিকে নিদারুণ অবহেলা। শতবর্ষপূর্তির কথাটি ভুলে গেছেন দুই অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী, গণমাধ্যম এবং অবশ্যই সরকারি কর্তাব্যক্তিরাও। ফলে সাধারণ মানুষ যেমন এই বিষয়ে আদৌ কিছু জানেন না, তরুণরা জানবে এমনটি আশা করা অযৌক্তিক। জাপানে যাঁকেই জিজ্ঞেস করেছি এই বিষয়ে কিছু জানেন কিনা, এক কথায় উত্তর ফিরে এসেছে: 'শিরিমাছেন' অর্থাৎ 'জানি না'। ভারতবর্ষেও অনুরূপ।

যখন জানতে চেয়েছি কলাশিল্পের ইতিহাসবিদ, সুপণ্ডিত তেনশিন (কাকুজো) ওকাকুরা (১৮৬২-১৯১৩) সম্পর্কে জানেন কিনা---প্রবীণ কেউ কেউ নাম শুনে থাকলেও অধিকাংশ ভদ্রলোক ও তরুণ নামই জানেন না বললেন! শিল্পকলা নিয়ে ভাবেন, চর্চা করেন এমন তরুণকেও জিজ্ঞেস করে বিফল হয়েছি। অবশ্য অনেকেই নিজ দেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাস জানলেও বিশ্বইতিহাস সম্পর্কে আদৌ কোন জ্ঞান রাখেন বা এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত কোথাও পড়েছেন বলে মনে হয়নি। তাঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই কেননা তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়নি এই ইতিহাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান হেরে যাওয়ার পর। জাপানি বুদ্ধিজীবীদেরও ইচ্ছে নেই এই ইতিহাস নিয়ে কিছু বলার বা লেখার, তেমনি গণমাধ্যমগুলোও নিস্পৃহ। কিন্তু কেন? এর একটিমাত্র

সাধারণ উত্তর হতে পারে: এসব চর্চা করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সুতরাং বৃথা এ ভাবনা।

ভারতের কোন ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন বা ইতিহাস শিক্ষালাভ করে এসে জাপানে যেমন চাকরী পাওয়া যায় না, তেমনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে গেলে না খেয়েই মরতে হয় জাপানিদের। অথচ জাপানে ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্ম আগমনের পর বা আগে থেকে জাপানিদের ধর্ম ও জীবনযাপনে ভারতবর্ষ ছিল আদর্শ একটি দেশ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রাচীন চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যুদ্ধের পর ৬০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে জাপানিদের চালচলন, রীতিনীতি, সমাজ, জীবনজীবিকাসহ সর্বক্ষেত্রে। আজকের জাপানে সত্যিকারভাবেই প্রাচ্যাদর্শবাদী জাপানি নাগরিক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যে-কারণে খুব সহজেই বিস্মরণের অতলে তলিয়ে গেছেন এই দেশেরই অগণিত স্মরণীয়-বরণীয় বিজ্ঞব্যক্তি, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সংস্কৃতিজীবী, রাজনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক যাঁরা শতবর্ষপ্রাচীন জাপান-বাংলা সম্পর্কের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ১২ কোটি জাপানি নাগরিকের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কতিপয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব––একান্তভাবেই যাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার দিক দিয়ে গভীরভাবে যুক্ত তাঁরা ছাড়া এই শতবর্ষপূর্তিকে স্মরণ করেননি! তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট জাপানি রবীন্দ্র-গবেষক ও বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড.কাজুও আজুমা 'ভারত-জাপান রবীন্দ্র সংস্থা'-র সাধারণ সম্পাদক যিনি স্বউদ্যোগে ভারত থেকে একটি নাট্যদলকে জাপানে আমন্ত্রণ জানিয়ে কয়েকটি শহরে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' মঞ্চস্থ করিয়েছেন। আর অন্যদিকে 'জাপান-বাংলা এসোসিয়েশন' তেনশিনের জন্মস্থান য়োকোহামা বন্দরনগরীর 'কাইকোকিনেনকান' মিলনায়তনে ড. আজুমার পৃষ্ঠপোষকতা এবং আর্থিক সহযোগিতায় অনাড়ম্বর এক আলোচনা-সভার আয়োজন করেছে। অথচ এই উৎসবটি আরও ঘটা করে বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও সরকারিভাবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় পালন করতেই পারত। ১৯৮৮ সালে এদেশে যদি ভারত-উৎসব এক বছরব্যাপী পালিত

হতে পারে তাহলে শতবর্ষপূর্তির মতো এত বড় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কেন নীরবেই রয়ে গেল তার কোন ব্যাখ্যা নেই। এই ঘটনাটিকে আরও স্মরণীয় এবং দুই অঞ্চলের আগামী প্রজন্মের কাছে বরণীয় করে তোলার জন্য জাপানি কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের উপর একটি জাদুঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করতেই পারত। এটি স্থাপিত হলে পরে তাঁর সঙ্গে স্মরিত হতেন তেনশিন ওকাকুরা, য়োকোয়ামা তাইকান, কানজান শিমোমুরা, সুনশো হিশিদা, কাৎসুদা শোওকিন, কাম্পো আরাই, আর. কিমুরা, জিনজো নারুসেই, ৎসুশো বিয়োদো, ওয়াতানাবে শোওকো, ড. হাজিমে নাকামুরা, জিননোসুকে সানো, শিনজো তাকাগাকি, শোতোকু হোরি, ওওকুরা কুনিহিকো, ইয়াসাবুরো শিমোনাকা, মাদাম তোমি কোরা, এইইচি শিবুসাওয়া, রিয়োহেই মুরায়ামা, তোমিতারো হারা, মাকি হোশি, ফুকু আকিনো এমনি আরও অনেক নমস্য ব্যক্তিত্ব যাঁরা রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসেছিলেন কিংবা রবীন্দ্র-সৃষ্টির আলোকে আপ্লুত হয়েছিলেন। তা হলে এই সাংস্কৃতিক ধারাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার একটি মঞ্চ দুই অঞ্চলের তরুণরা খুঁজে পেত। বিশেষ করে জাপানি তরুণ প্রজন্ম তো এশিয়া সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। কে রবীন্দ্রনাথ, কে তেনশিন? তাঁদের কর্মকান্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হত। এই সকল মনীষীরা কি জাপানসহ সমগ্র এশিয়া মহাদেশের গৌরব নয়?

উল্লেখ্য যে, এই শতবর্ষ সম্পর্ক এর সূচনা করেছিলেন জাপানি মনীষীরাই। ভারতীয় বা বাঙালিরা নন। আর সূচনা করেছিলেন এ জাতির নমস্য ব্যক্তিত্ব তেনশিন ওকাকুরা। তিনি ১৯০২ ও ১৯১২ সালে দুবার ভারত ভ্রমণ করেন। তাঁর ধ্যান ও আদর্শই ছিল এশিয়াকেন্দ্রিক। এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন, তাই প্রচার করতে চেয়েছিলেন: 'এশিয়া এক' বা 'Asia is One' এই অভিজ্ঞা। এশিয়ার জাতিসমষ্টির চিন্তা ও চেতনার ভিতরে প্রবেশ করে দেখেছিলেন বিশ্বায়নের স্বপ্ন। তিনি সংকীর্ণ আন্তর্জাতিকতার পক্ষপাতিত্ব করেননি। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অনুসারীও কখনো ছিলেন না। প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্য তথা শ্বেতাঙ্গদের বিরূপ ধারণা ও উন্নাসিকতা সম্পর্কে তিনি বরাবরই ছিলেন সজাগ, সচেতন। কাজেই তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য

প্রয়োজন ছিল নিজস্ব একটি শক্তিশালী অবস্থান। আর সেটা অর্জন করার জন্যই এশিয়ার হাজার হাজার বছরের অগ্রসর চিন্তা, দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য ঘটাতে পারলেই বিদেশীদের কাছে 'সমানে সমান' হওয়া সহজ হবে এই ছিল তেনশিনের মূল দর্শন। তিনি সজ্ঞানে অনুভবও করেছিলেন প্রাচ্যবাসীর মধ্যে একই চিন্তা, চেতনা ও সংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্য। বলা যায় আজকের য়োরোপীয়ান ইউনিয়নের (EU) মতোই একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'বাঙালি নবজাগরণ' তাঁর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল 'এশিয়া এক' এই অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর চিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে একাত্ম হয়েছিলেন এশিয়ার প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বাঙালি কবি, চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তেনশিন ১৯০২ সালে কলকাতায় ছিলেন প্রায় দশ মাস। এই সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ঘনিষ্ঠতা হয় এই পরিবারেরই শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই তিনি কলকাতায় বসেই লেখেন তাঁর গ্রন্থ যথাক্রমে 'The Awakening of the East' এবং 'The Ideals of the East' দুটির পাণ্ডুলিপি। পরবর্তীকালে যা বিখ্যাত হয়েছিল, খুলে দিয়েছিল এশিয়া মহাদেশের আধ্যাত্মিক চেতনার দুয়ার পাশ্চাত্যবাসীর কাছে। কলকাতায় তিনি আরও ঘনিষ্ঠ হন তৎকালীন বাঙালি নবজাগরণের পুরোধা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দেরও তিনি প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। এই এখান থেকেই মূলত সূত্রপাত জাপান-বাংলা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের। তেনশিন যখন ভারতে তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন জনৈক তরুণ ভিক্ষু শিতোকু হোরি। রবীন্দ্রনাথ তেনশিনকে অনুরোধ করে তাঁকে শান্তি-নিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র করে নেন। শিতোকুই হচ্ছেন শান্তি-নিকেতনের প্রথম বিদেশী ছাত্র। তেনশিন জাপানে ফিরে এসেই ১৯০৩ সালে তাঁরই শিষ্য চিত্রশিল্পী য়োকোয়ামা তাইকান ও শুনসো হিশিদাকে কলকাতায় প্রেরণ করেন। তাঁরা ভারতীয় শিক্ষার্থীদেরকে জাপানি চিত্রকলার 'ওয়াশপদ্ধতি' শেখান। পরস্পর মত ও চিন্তার বিনিময় করেন। পাশাপাশি ইলোরা, অজন্তা, সাঁচিসহ অন্যান্য বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠের গুহা-

চিত্র, দেয়ালচিত্রের অনুলিপি করার কাজে বিভিন্ন স্থানে যান। ১৯০৫ সালে শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু ক্রীড়া শেখানোর জন্য যান জিননোৎসুকে সানো রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে। তিনি ক্রীড়াচর্চার পাশাপাশি জাপানি ভাষা শিক্ষা দেবার দায়িত্বও নিয়েছিলেন। ১৯০৫-৮ সাল পর্যন্ত তেনশিনের সুপারিশে চিত্রকর শোওকিন কাৎসুতা শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোতে চিত্রাঙ্কনশিক্ষা বিনিময়ের কাজ করেন। ১৯১৭-১৮ সাল পর্যন্ত আরেক জন চিত্রশিল্পী কাম্পো আরাই কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি এবং শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পরবর্তীকালে পুনরায় ইতালির রোমে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

বন্ধুবর তেনশিন ওকাকুরার দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক আগেই আসার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন। সেই ইচ্ছে পূরণ হল ১৯১৬ সালে 'ইনদো-জাপানিজ এসোসিয়েশনে'র তৃতীয় সভাপতি শিল্পপতি ব্যারন এইইচি শিবুসাওয়ার আমন্ত্রণে প্রথম জাপান ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর তিন বছর পূর্বে ১৯১৩ সালে মাত্র ৫১ বছর বয়সে দেহ রাখেন তেনশিন। তাঁর পরিবর্তে জ্যেষ্ঠপুত্র কাজুও ওকাকুরা এবং তাইকান য়োকোয়ামা প্রমুখ শিষ্য রবীন্দ্রনাথকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। দিন দশেক আতিথ্যগ্রহণ করেন শিল্পী তাইকানের ওয়েনো শহরের বাসভবনে। তারপর য়োকোহামা বন্দরনগরীর বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি ও শিল্পানুরাগী তোমিতারো হারার সুদৃশ্য বাগানবাড়ি 'সানকেইএন'-এ তিন মাসের মতো অতিথি ছিলেন। ঐ সালেরই জুন মাসে ওয়েনো শহরের বিখ্যাত কানয়েইজি বৌদ্ধ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন উপলক্ষে যে বিরাট সংবর্ধনাসভার আয়োজন করা হয় তৎকালে তা ছিল অবিশ্বাস্য ঘটনা! এই সংবাদ প্রকাশ করেছিল জাপানের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র, যেমন টোকিয়ো আসাহিশিম্বুন, টোকিয়ো মাইনিচিশিম্বুন, য়োমিউরিশিম্বুন, হোচিশিম্বুন, জিজিশিম্বুন, য়োকোহামা বোচিশিনপো, ওসাকা আসাহিশিম্বুন, য়োরোজু চোচো প্রভৃতি। তাদের সংবাদ থেকে একটি উদ্বৃতি দেয়া যেতে পারে: "গত ১৩ই জুন, ১৯১৬ ইং টোকিয়োর ওয়েনো এলাকার কানয়েইজি মন্দিরে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়

এর উদ্দেশে এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উক্ত সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীওকুমা, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীতাকাদা, কৃষিমন্ত্রী শ্রীকৌনো, টোকিয়ো মহানগরীর মেয়র শ্রীওকুদা, টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শ্রীইয়ামাকাওয়া, ব্যারন শ্রীকানদা, ব্যারন শ্রীতাকাগি, ব্যারন শ্রীওকুরা, সোতো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীইশি-কাওয়া, নিচিরেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ফুজিওয়ারা, তাইশোরিননোজি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ড. মুরাকামি, ড. আমানো, ড. ফুজিওয়ারা, ড. তানাকা প্রমুখ। এছাড়া বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীস্টধর্মের বহু বিশিষ্ট লোক, বিখ্যাত চিত্রকর, সাহিত্যিক, পন্ডিতমন্ডলী এবং ব্যবসায়ীরা সব মিলে প্রায় ২১৮ জন যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারত থেকে এসেছিলেন মি.এ্যানড্রু, মি.পিয়ারসন এবং তরুণ চিত্রশিল্পী মুকুল দে। রবীন্দ্রনাথের একপাশে প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা অন্যপাশে বসেছিলেন জেন্ বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রী হিয়োকি।"

উল্লেখ্য যে, এশিয়া মহাদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রথম নোবেল পুরস্কার অর্জন করায় তাঁর মর্যাদা ছিল জাপানে পর্বত-সমান। এই অভ্যর্থনা সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ড.জুনজিরো তাকাকুসু উদ্বোধনী ঘোষণা করেছিলেন। তারপর প্রবীণ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীশুজি কাওয়াসে বক্তৃতা মঞ্চে উঠে বলেন, "বৌদ্ধধর্ম শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় ভারত। প্রাচীনকালে জাপানের এক রাজপুত্র শোতোকু তাইশি মহাযান বৌদ্ধধর্মকে রাজনীতির মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের সুন্দর নীতিসমূহ মর্মস্থলে প্রবেশ করে আজও পর্যন্ত আমাদের জীবনধারায় অবিচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে।" মহাভিক্ষু মোকুসেন হিয়োকি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা বুদ্ধের চিন্তাধারার সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে।" রবীন্দ্রনাথের সুমধুর বক্তৃতা শুনে সেদিন প্রধানমন্ত্রী ওকুমা এবং আচার্য ইয়ামাকাওয়ার চোখে অশ্রু নেমেছিল।"

স্বনামধন্য জাপানি শিল্পপতি ব্যারন এইইচি শিবুসাওয়া (১৮৪০-১৯৩১) টোকিয়োস্থ ওওজি শহরের আসুকায়ামা বাসভবনে রবীন্দ্র-সম্মানে এক জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই

সরকারের মাধ্যমে কবিগুরুকে জাপানে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। আমন্ত্রণ করার জন্য দূত হিসেবে বৌদ্ধপন্ডিত রিউকান কিমুরা কলতাকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দৈনিক আসাহিশিম্বুন পত্রিকার মালিক রিয়োহেই মুরায়ামার বাসভবনেও আয়োজন করা হয় রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন উপলক্ষে জাপানি ঐহিত্যবাহী 'চাদোউ' বা চা-অনুষ্ঠানের। গীতাঞ্জলি তাৎক্ষণিকভাবে জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়। পরে আরও কয়েকবার। দ্বিতীয়বার যখন আসেন ১৯১৭ সালে তখনও আন্তরিক সংবর্ধনা লাভ করেন। এই সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কিয়োতো, নারা, ওসাকা এবং কোবে ঘুরতে যান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। তৃতীয়বার ১৯২৪ সালে আগমনকালে সাক্ষাৎ ঘটে তৎকালীন গণমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা বলে কথিত মিৎসুরো তোয়ামা, হিরাওকা কোতারো প্রমুখের সঙ্গে। বর্তমান ওয়েনো শহরে অবস্থিত তৎকালীন সুদৃশ্য 'সেইয়োকেন্' ভবনের মিলনায়তনে তাঁকে এক উষ্ণতর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সামরিক অফিসারসহ তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রায় ৩০ জন। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও মধ্যস্থতা করেছেন জাপান প্রবাসী মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

উল্লেখ্য যে, প্রথম জাপান সফরকালেই রবীন্দ্রনাথ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে এক বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় জাপানের অতিরিক্ত জাতীয়তাবাদী মনোভাব ভালো নয় বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তার ফলে অনেক জাপানি বন্ধু তাঁর প্রতি শীতল মনোভাব প্রদর্শন করেন। ১৯২৯ সালে শেষ জাপান ভ্রমণের পর পুনরায় তিনি জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সামরিক শক্তি ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি মূলত জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয় চেয়েছিলেন। চীনের সাধারণ লোকের ওপর জাপানের অমানুষিক অত্যাচার, জাপানের উপনিবেশকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড জাপানের জীবনাদর্শের বিপরীত বলে মন্তব্য করেছিলেন। জাপানি জাতীয়তাবাদ নিয়ে বন্ধুবর কবি য়োনেজিরো নোগুচির সঙ্গেও এক পত্র-

বিতর্কে লিপ্ত হন। অনেকে বলে থাকেন অন্ধ জাতীয়তাবাদী দম্ভীতার ফল জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পেয়েছে এবং সেই ফলের বাজে দিকগুলো নিয়ে এখন ভুগছে। বাজে দিক বলতে ক্রমশ এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিশ্ব রাজনীতি থেকে অপসারণ, অমেরিকার এক প্রকার উপনিবেশে পরিণত হওয়া, জাতিসত্ত্বার বিলুপ্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমালোচনা উঠে আসছে সচেতন জাপানিদের চিন্তা ও লেখনী থেকেই।

রবীন্দ্রনাথকে জাপানিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কবির চেয়ে দার্শনিক হিসেবেই যেন মূল্যায়ন করতে শুরু করেন বেশি। এর কারণ হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, জাপানের উগ্র সমরতন্ত্রের উত্থান অদূর ভবিষ্যতে ভুলের মাশুল হিসেবে দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় তারই অকাট্য প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন বুদ্ধিজীবীরা। যাইহোক, তাঁকে ঘিরেই আবার জাপানি এবং বাঙালিদের মধ্যে চিন্তাচেতনা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিনিময় জোরদার হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ পাঁচ-পাঁচবার জাপান ভ্রমণ করেছেন (১৯১৬, ১৬১৭, ১৯২৪ এবং ১৯২৯ সালে দুবার)। যতবারই এসেছেন ভ্রমণসঙ্গী হয়েছেন শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ। জাপান থেকেও তাঁর অনুরোধে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন একাধিক শিক্ষক, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ। এছাড়া প্রফেসর ড. কাজুও আজুমার ভাষ্য থেকে জানা যায় যুদ্ধ পূর্ব সময় পর্যন্ত কমপক্ষে হাজার জন জাপানি বিভিন্ন পেশার কারিগর, পারদর্শী তখন ভারতের কলকাতা ও বাংলাদেশের ঢাকা অঞ্চলে প্রশিক্ষক হিসেবে গিয়েছেন, অবস্থান করেছেন। বেশ কিছু সংখ্যক স্বনামধন্য অধ্যাপক, গবেষক এবং ধর্মীয় চিন্তাবিদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা, পালি ভাষা, চিত্রকলা এবং সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে গিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁদের মধ্যে প্রশিক্ষক হয়ে গিয়েছেন জুজুৎসু খেলোয়াড় জিননোৎসুকে সানো, শিনজো তাকাগাকি; টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ভারততত্ত্ববিদ ৎসুশো বিয়োদো, ধর্মীয় নেতা.তুখোড় পন্ডিত রিউকান কিমুরা, ইকেবানা ও চা-অনুষ্ঠানের শিক্ষিকা রাসবিহারী বসুর স্ত্রী তোশিকো বসুর মাসতুতো বোন মাকি হোশি, সঙ্গীতজ্ঞ গেনজিরো মাসু

প্রমুখ। কেউ কেউ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বাংলা অঞ্চলে। যেমন আইচি-জেলার উয়েমোন তাকেদা এবং তার ভাই দুজনেই ঢাকা ও কলকাতায় বিয়ে করে ব্যবসাও স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং নাটক জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, মঞ্চস্থ হয়েছে। গীতাঞ্জলির কবিতা ছাড়াও তাঁর অনেক কবিতাই এদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে মুদ্রিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজপাঠ পুস্তকে তাঁর কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। ১৯২৯ সালে তিনি যখন শেষবার আমেরিকা থেকে স্বদেশ ফেরার পথে জাপানে আসেন আসাহিশিম্বুন পত্রিকার অনুরোধে একটি কবিতা জাহাজে বসে লিখেন। ইংরেজিতে লেখা 'A Weary Pilgrim' কবিতাটি আসাহিশিম্বুন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবারের সংবর্ধনায় নতুন একটি জিনিস সংযোজিত হয় সেটি হল রবীন্দ্রনাথের গান জাপানি ভাষায় অনুবাদ। কাজটি সম্পাদন করেন প্রখ্যাত সুরকার আয়াসুজি কিয়োসে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর লিখিত ইংরেজি কবিতা সংকলন 'The Gardener.' গ্রন্থের ৩১ নম্বর কবিতাটি জাপানি ভাষায় সুর করা হলে গেয়ে শোনান উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের গায়ক ও আবৃত্তিকার এইজো তেরুই। ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণের সময় জাপানে প্রথম মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাবিদ জিনজো নারুসেই এর অনুরোধে নাগানো-জেলার কারুইজাওয়া মহিলা মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছাড়াও সেখানে একাধিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই স্মৃতি এখন নির্জন এক পাহাড়ের পাদদেশে রবীন্দ্রনাথের 'অহিংসমানব টেগোর শান্তিমূর্তি' নামক আবক্ষমূর্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি নির্মিত হয় রবীন্দ্রভক্ত নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী, প্রাক্তন ডায়েট সদস্যা মাদাম তোমি কোরার উদ্যোগে ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুবরণ করেন ৭ই আগস্ট ১৯৪১ সালে তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। দামামা বাজছে এশিয়াতেও। ঐ সালের ডিসেম্বরেই যুদ্ধ বাঁধে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের। তার আগেই য়োরোপশাসিত এশিয়ার দেশগুলোতে স্বাধীনতার জাগরণ সৃষ্টি করেছে জাপান। তার সঙ্গে হাত

মিলিয়েছেন জাপান প্রবাসী ভারতীয় মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু, তারকনাথ দাশ, রমানাথ রায়, হেরেম্বলাল গুপ্ত, এ.এম. নায়ার, সত্যেন সেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু; ফিলিপিন্সের হোসে (Hosc P. Laner); বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) বামো (Bhamo) প্রমুখ স্বাধীনতাকামী নেতা। গঠিত হয়েছে গ্রেট এশিয়া কোপ্রসপেরেটি স্পীয়ার (Great Asia Coprosperity Sphear)। এই সংস্থা থেকে কয়েকটি মহাসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ায়। অনুষ্ঠিত হয়েছিল টোকিয়োতে 'গ্রেট ইস্ট এশিয়া কংগ্রেস' সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন নেতাজি। আর পেছনে রবীন্দ্রনাথ যুগিয়েছেন প্রেরণা। 'তোহো' প্রকাশনী নামক একটি প্রকাশনা সংস্থা তখন জাপানের ওয়ারগ্রাফিক ঢাউস ম্যাগাজিন 'ফ্রন্ট' (FRONT) প্রকাশ করছিল। অনেকগুলো সংখ্যার মধ্যে প্রকাশ করেছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল সাতরঙা প্রচ্ছদবিশিষ্ট একটি ভারতীয় সংখ্যা যেখানে রবীন্দ্রনাথের ছবিসহ ইংরেজিতে অনূদিত 'প্রার্থনা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি ছিল নেতাজীর 'দিল্লী চলো' উদীপ্ত সঙ্গীত।

যুদ্ধোত্তর টোকিয়ো সামরিক বিচারের (টোকিয়ো ফারইস্ট মিলিটারি ট্রাইবুনাল) যে একটি মাত্র নির্দোষ রায় আজ বিশ্বইতিহাস তার সেই ন্যায়দন্ডের বিধাতা বিচারক ড. রাধাবিনোদ পালও ছিলেন রবীন্দ্র-আদর্শের অনুসারী। যিনি জাপানকে পুনরায় বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো মানসিক শক্তি যুগিয়েছিলেন তাঁর ৭০০ পৃষ্ঠারও অধিক রায়ের মাধ্যমে অত্যন্ত সুদৃঢ়, সাহসী কণ্ঠে 'ন্যায়দন্ডের মূলভিত্তি' কী তার স্বরূপ তুলে ধরে। যদিও তাঁর রায়ের কোন কোন অভিমত নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে তথাপি আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্ব তাঁর বিচক্ষণ রায় মেনে নিয়েছিল। ১৯৫২ সালে হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত হয় 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন' এর এশিয়া মহাসম্মেলন। এই বিশ্বসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেক বীরযোদ্ধা রাজামহেন্দ্র প্রতাপ। বিশ্বশান্তিকামী এই রাজপুত্র তিনবার জাপান সফর করেন। জাপান প্রবাসী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর যোগাযোগ। ড. পাল এই ফেডারেশনের এশিয়া মহাসম্মেলনের চেয়ারম্যান ইয়াসাবুরো শিমোনাকার আমন্ত্রণে সভাপতি হিসেবে উক্ত সভায় যোগদানকালে জাপানি বিদ্যালয়ের ইতিহাস

বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক দেখে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, "শিশুরা ভুল ইতিহাস শিখছে!" আহ্বান করেছিলেন সত্য ইতিহাস তুলে ধরার জন্য, বলেছিলেন, "জাপানিরা জাপানে ফিরে এসো।" এটা তাঁর বিখ্যাত উক্তি যুদ্ধপরবর্তী জাপানিদের উদ্দেশে। কতখানি ভালবেসেছিলেন তিনি জাপানকে! বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, জাপানে তিনি মৃত্যুবরণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানের প্রকৃতি এবং জাপানিদের শিল্পচেতনাকে ভালবেসেছিলেন আর বিচারপতি ড.পাল ভালবেসেছিলেন জাপানিদের আত্মার সৌন্দর্য তথা 'বুশিদোউ'কে। এখন এইসব ইতিহাস জাপান থেকে তিরোহিত। বিনিময়ে জাপান সরকার ড. রাধাবিনোদ পালের নামে তেমন কিছু করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও জাপানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানীত ডক্টরেট আর সম্রাটের কাছ থেকে 'পার্পল রিবন' (সংস্কৃতিক্ষেত্রে অবদান রাখার স্বীকৃতিপদক) পেয়েছিলেন। আর কেউ কেউ বলেন রাজপ্রাসাদের কাছেই বর্তমান ভারতীয় দূতাবাসের জায়গাটি পালের অবদানের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে বিনামূল্যে। কতখানি সত্য বলা মুশকিল। ১৯৯৭ সালে বেসরকারিভাবে ড.পালের একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে কিয়োতো শহরের একটি শিনতো মন্দিরের নির্জন উদ্যানে 'শোওয়া নো মোরি' নামে। জাপানের ১১৪টি বিখ্যাত এবং মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্থ দান করেছে। আর ১৯৯৭ সালে টোকিয়োস্থ শিনতো মন্দির 'ইয়াসুকুনি জিন্‌জা'র অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাঁর অনুরূপ প্রস্তরফলক। কিন্তু এসব জানে ক'জনে? কেউ কেউ বলেন, সম্মানস্বরূপ তাঁর নামে একটি সড়ক টোকিয়োতে সরকার করতেই পারত। তবে যা কিছু তাঁর নামে স্থাপন করা হয়েছে তার মূল্য অপরিসীম। যুদ্ধপরবর্তীকালে ড.পাল প্রদত্ত ঐ বিচারের রায় সম্পর্কে জাপানি ভাষায় লিখিত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বেস্ট সেলার্স হিসেবে পরিচিত 'নিহোন মুজাইরোন' (জাপান নির্দোষ রায়) গ্রন্থের রচয়িতা লেখক. গবেষক তাঁর পুত্রতুল্য-স্নেহধন্য মাসাআকি তানাকার মাধ্যমে ড. পালের সঙ্গে পরিচয় ঘটে শিক্ষক.লেখক.প্রকাশক ইয়াসাবুরো শিমোনাকার। ক্রমে যা পরিণত হয় ভাতৃত্ব বন্ধনে। এবং মৃত্যু পর্যন্ত ছিল এই সম্পর্ক অক্ষুন্ন।

যুদ্ধের পরস শিমোনাকা ভারত এবং পাকিস্তান সফর করেন। দুজনেই শোওয়া-স্রমাট হিরোহিতোর কাছ থেকে জাপানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পার্পল রিবন' পদক অর্জন করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে উক্ত দুজনেরই একনিষ্ঠ শিষ্য মাসাআকি তানাকা কানাগাওয়া-জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি 'হাকোনে'র এক নিভৃত পাহাড়ে গড়ে দিয়েছেন শিমোনাকা প্রতিষ্ঠিত হেইবোনশা পাবলিশার সংস্থার সহযোগিতায় 'পাল-শিমোনাকা স্মৃতিজাদুঘর' যদিওবা অযত্নের ছাপ সেখানে অতি স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, অনেক কাহিনীই রয়েছে ড.পালের এই জাপানে রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং মনোস্তাত্ত্বিক চিন্তা বিনিময়ের ক্ষেত্রে যা আজকের খুব কম সংখ্যক জাপানিই জানেন। জানেন না দুই বাংলার বাঙালি।

বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান যখন মার্কিনী দখলত্ব থেকে মুক্ত হল ১৯৫১ সালে আবার জাপানি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা বিশ্বভারতীর কলাভবন, সঙ্গীতভবন, শিক্ষাভবন, রিদ্যাভবন, বিনয়ভবন, হিন্দীভবন এবং শ্রীনিকেতনে আসতে শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে জাপানি বিভাগের উদ্বোধন হয়। উপাচার্য ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচি জাপানের ভারততত্ত্ববিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ড. হাজিমে নাকামুরাকে অনুরোধ করেন প্রাচ্যদেশের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গবেষণা পরিকল্পনাতে যোগ দেয়ার জন্য। জাপানি ভাষা শেখানোর জন্য দুবছরের একটি সার্টিফিকেট কোর্স ও এক বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করার জন্য একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পন্ডিতকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। প্রফেসর নাকামুরা পাঠালেন প্রফেসর শিনইয়া কাসুগাইকে। প্রফেসর নাকামুরার সুপারিশে প্রফেসর তাৎসুও মোরিমোতো আড়াই বছর ও প্রফেসর কাজুও আজুমা সাড়ে তিন বছর এবং প্রফেসর কেইয়ো আরাই দেড় বছর বিশ্বভারতীর উক্ত বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। তারপর আসেন অধ্যাপক মাকিনো যিনি দীর্ঘ ১৫ বছর জাপানি ভাষা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পরে অধ্যাপক কোইচি ইয়ামাশিতা দশ বছর এবং অধ্যাপক কেইসুকে ইনানো এক বছর অধ্যাপনা করেন। উক্ত অধ্যাপকদের গবেষণার ক্ষেত্র ছিল: বৌদ্ধধর্ম--অধ্যাপক কাসুগাই; রবীন্দ্রতত্ত্ব, বাংলা সাহিত্য গবেষণা, তুলনামূলক সংস্কৃতি--অধ্যাপক আজুমা; বৌদ্ধধর্ম--অধ্যাপক আরাই; কৃষিবিদ্যা ও

গান্ধীতত্ত্ব--অধ্যাপক মাকিনো; বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুদর্শন-- অধ্যাপক ইয়ামাশিতা; তুলনামূলক সংস্কৃতি--অধ্যাপক ইনানো।

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানের তখনকার রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। চিন্তাভাবনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন জাপানে প্রয়োগ করার। সেই লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-আন্দোলন। বহু স্বনামধন্য পন্ডিত, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমালোচক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ মিলে রবীন্দ্র-গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ১৯৫৯ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পালন উপলক্ষে। ১৯৬২ সালে ঘটা করে টোকিয়োসহ অন্যান্য শহরেও সেই জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই সময় নিয়মিত সভা, 'সত্য' নামে পত্রিকা প্রকাশ, বাংলা ভাষা শেখানো, সঙ্গীত মহড়া অনুষ্ঠিত হত। একাধিক রবীন্দ্রগ্রন্থের অনুবাদ, গীতাঞ্জলি থেকে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা বিশেষজ্ঞ, জেন্ বৌদ্ধপন্ডিত ড. দাইসেৎসু সুজুকিকে (১৮৭০-১৯৬৬) রবীন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র থেকে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছিল। এমন কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় সংস্থা ছিল না যারা এই অনুষ্ঠানে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেনি। ব্যক্তিগত সাহায্য তো ছিলই। শুধুমাত্র রাজধানী টোকিয়োতেই এই ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানটি পালন করতে গিয়ে তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ৬০ জন শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা, সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী সমবেত হয়েছিলেন। খ্যাত-অখ্যাত প্রায় ১০৫টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ৩টি ফাউন্ডেশন, ২২টি ধর্মীয় সস্থা, ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং 'ওওকুরা স্পিরিচুয়াল কালচার ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠান থেকে যে আর্থিক সম্মানী ওঠে তার পরিমাণ ছিল তৎকালীন মুদ্রায় ৬,৫৫০,৫০০ ইয়েন! যখন একজন চাকুরীজীবীর মাসিক বেতন ছিল অনূর্ধ্ব ১৫,০০০ ইয়েন! এমনকি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তি-নিকেতনের আদলে আশ্রমিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলারও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তামাগাওয়া গাকুয়েন মহাবিদ্যালয়ে। শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ক্যাম্পাসের গাছগাছালির তলে শিশুদের নিয়ে। এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন 'ওওকুরা কাগজ মিল' এর মালিক এবং পরবর্তীকালে তোয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য লেখক.শিক্ষাবিদ ড. কুনিহিকো ওওকুরা,

হেইবোনশা পাবলিশারের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষাবিদ শিমোনাকা ইয়াসাবুরো, শিশুসাহিত্যিক-সমালোচক-অনুবাদক ইয়ামামুরা শিজুকা, পন্ডিত ড. দাইসেৎসু সুজুকি, ভারততত্ত্ববিদ প্রফেসর ড.হাজিমে নাকামুরা, প্রফেসর কিজো ইনাজু, ড.কুনিয়োশি ওওবারা, প্রফেসর শিনইয়া কাসুগাই, প্রফেসর কাতায়ামা তোশিহিকো, নৃত্যপ্রশিক্ষক কিইৎসু সাসাকিবারা, মহিলা চিত্রকর.শিক্ষাবিদ জোসাকু মায়েদা, মহিলা চিত্রশিল্পী ফুকু আকিনো প্রমুখ। বিলুপ্ত 'এ্যাপোলনশা' প্রকাশনা সংস্থা রবীন্দ্র-রচনাবলী একাধিক খন্ডে জাপানি ভাষায় প্রকাশ করেছিল। তৎকালীন বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত রবীন্দ্ররচনা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে দৈনিক আসাহিশিম্বুন পত্রিকা, হেইবোনশা পাবলিশার বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। রবীন্দ্র-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল য়োকোহামা বন্দর-নগরীর ওকুরায়ামা শহরস্থ ড.কুনিহিকো ওওকুরার তৎকালীন প্রাসাদোপম বাসভবনে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুদ্ধপূর্ব সময়ে কুনিহিকোর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে একবার তাঁর টোকিয়োস্থ মেগুরো শহরের বাসভবনে প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থান করেছিলেন। ড.কুনিহিকো রবীন্দ্রনাথকে দ্বাদশ খন্ডের জাপানি মহাইতিহাস, শিল্পকলা, 'চাদোউ', 'ইকেবানা' প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন তার বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ ১৭০/১৮০টি স্বরচিত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ প্রেরণ করেছিলেন তাঁকে। যেগুলো উক্ত গবেষণা কেন্দ্রে সজ্জিত ছিল। এখনো সে গ্রন্থগুলো আছে তবে অন্ধকার কক্ষে বিবর্ণ রূপ ধারণ করেছে।

১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত টোকিয়ো ওলিম্পিক গেমস্ ও শিন্‌কান্‌ছেনের (Bullet Train) উদ্বোধনের পর থেকেই দ্রুত নিস্তেজ রূপ ধারণ করতে থাকে এইসব রৌদ্রপ্রাণ উৎসব, আয়োজন এবং আন্দোলন। অকস্মাৎ জাপান চলতে শুরু করে তড়িৎগতিসম্পন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সড়কে। দ্রুত বদলে যেতে থাকে চিন্তাচেতনা, জীবনযাপন, পারিপার্শ্বিকতা। ব্যবসা আর অর্থ আয়ের প্রতিযোগিতায় জাপান ছাড়িয়ে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও য়োরোপকে। আশির দশকে আসে বাবল্ অর্থনীতির যুগ। উঠছে উঠছে জাপান উঠছে অতিদ্রুত। মাত্র ৪০ বছরের মধ্যে এক অলৌলিক কান্ড ঘটিয়ে দিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে! তারপর সরে যায় দেশটি এশিয়া মহাদেশ

থেকে, প্রবলভাবে নির্ভর হয়ে পড়ে মার্কিনী এবং য়োরোপীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির উপর। তথাপি এসবের মধ্যেও এশিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় যে একেবারে ঘটেনি তা নয় তবে খুবই ক্ষীণ। তার কারণ সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। প্রফেসর কাজুও আজুমা মনে করেন, জাপানের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে আমেরিকার প্রচন্ড প্রভাব জাপান-এশিয়ার বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ। জাপান-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি প্রফেসর ওকামোতো কোজির অকাট্য ধারণা, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের কারণেই জাপান এশিয়া থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। কেননা যুদ্ধের পর জাপান শান্তিবাদী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ক তিক্ত-সম্পর্ক থাকলেও ভারত ছিল জাপানের পরীক্ষিত শান্তিবাদী বন্ধু। চীন আক্রমণ করে ভারত পারস্পরিক সমঝোতা ছিন্ন করে ফলে অসন্তুষ্টের কারণ হয় জাপান। যে কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু নয়, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাপানি নেতৃবৃন্দ 'শীতল ভূমিকা' গ্রহণ করেন। এই মন্তব্য অবশ্য জাপান-এশিয়ার বিচ্ছিন্নতার সঠিক কারণ বলে মনে না করার যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান। শান্তিবাদের কথাই যদি বলা হবে তাহলে তিব্বত নামক স্বাধীন শান্তিপূর্ণ একটি দেশকে চীন যখন অন্যায়, অবৈধভাবে ১৯৫৯ সালে দখল করে নেয় এবং এই ঘটনা অবগত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাকুয়েই তানাকা চীনের সঙ্গে অতীতের কথা সব ভুলে গিয়ে 'মৈত্রী' ও 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এখানে কি জাপানের তথাকথিত 'শান্তিবাদী ভূমিকা'র যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছিল? ভিয়েতনাম যুদ্ধে জাপান সরকার ও জনগণ যথেষ্ট প্রতিবাদমুখর হয়েছিল কিন্তু গত ৫০ বছর ধরে চীনের তিব্বত আগ্রাসন ও অবৈধ দখল সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। এমনকি জাপানি গণমাধ্যমও জাপানের এই শীতল ভূমিকার কথা লেখে না; তিব্বতের কোন সংবাদই তুলে ধরে না। আর এখন তীব্র অর্থনৈতিক মন্দার কারণে উপায় না দেখে জাপান সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ছুটছে চীনের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে অর্থলগ্নী এবং কলকারখানাসমেত। এবিষয়ে সচেতন জাপানিরা

বলেন, সরকার 'নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারা' পন্থা ধরেছে। তবে এটা ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে, জাপান ও এশিয়ার আজকের যে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজ করেছে মার্কিনী সংস্কৃতির প্রতি জাপানি রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের অন্ধভক্তি এবং একদল প্রভাবশালী মার্কিন ও রাশিয়াপন্থী শিক্ষাবিদদের গভীর চক্রান্ত। তাঁদের যৌথ উদ্যোগেই সৃষ্ট এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিকরাই যুদ্ধপরবর্তী গত ৫০ বছরে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য নির্ভর সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, বাণিজ্যনীতি এবং কর্মপদ্ধতি আরোপ করেছে যার অনতিক্রম্য প্রতাপের তলে থেকে সাধারণ জাপানিরা এমনকি শিক্ষার্থী, তরুণ বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছেন নিজেদের জাতিসত্ত্বা, ইতিহাস ও জাতীয় গৌরবময় ঘটনাসমূহ।

সাম্প্রতিককালে জাপানকে এশিয়ায় ফিরে আসতে হবে এই লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক সচেতন নাগরিক ৯০ দশক থেকে একটু নড়াচড়া দিতে শুরু করেছেন। তার একটি প্রমাণ ১৯৮৮ সালে বছরব্যাপী ভারত-উৎসব অনুষ্ঠানের একটি ঘটনা যা আমাদের নজরে পড়ে। তবে বিশেষ কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এমনও নয়। তবে তাতে কিছুটা নাড়া পড়েছে। এই সময় বিশিষ্ট বাঙালি সংস্কৃতিপ্রেমী এবং রবীন্দ্র গবেষক ড. কাজুও আজুমা সুদীর্ঘ সময় তাঁর সহযোগীদের নিয়ে অসাধ্য পরিশ্রমের বিনিময়ে ১২ খন্ডে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করেন 'দাইসান বুমমেই' প্রকাশনা সংস্থা থেকে। এটা প্রসিদ্ধ.প্রভাবশালী 'সোকা গাক্কাই' নব্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান। ড. আজুমার এই অসামান্য কৃতিত্ব বা অবদানের খবর রাখেন না জাপানিরা বা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। একটি প্রকাশনা-অনুষ্ঠান হতেই পারত কিংবা একটি জাতীয় সংবাদ। কিছুই হয়নি। ভারত-উৎসবের পর থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হতে থাকে রাজধানীসহ এখানে সেখানে। এখন তো ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবই হচ্ছে জাপান ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় তবে সীমিত আকারে। ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলা ও ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা করে চলেছেন প্রাক্তন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা, রবীন্দ্র অনুরাগীরা। জাপানি ক'জনইবা জানেন এশিয়ার প্রখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় এবং আকিরা

কুরোসাওয়া মার্কিনী 'অস্কার' পুরস্কার লাভ করেছিলেন? তাঁদের মধ্যে ছিল যেমন চিন্তা-চেতনা ও কর্মপদ্ধতির মিল তেমনি ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী বিশ্বভারতীসহ অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. কাজুও আজুমা, অধ্যাপক কেইয়ো আরাই প্রমুখের মাধ্যমে যাচ্ছেন শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। জাপানি ODA, NGO, NPO প্রভৃতির কল্যাণে বেশ কিছু তরুণ-তরুণী পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে যাওয়া আসা করতে থাকলে মিলিয়ে আসা প্রায় সাংস্কৃতিক স্রোতে মৃদু তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৯৪ সালে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে অনুযায়ী শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের পাশাপাশি 'নিপ্পনভবন' প্রতিষ্ঠিত হয় সুদীর্ঘ ৩০ বছর কর্মচেষ্টার ফলে। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ৎসুশো বিয়োদো ও ড. আজুমার অশেষ পরিশ্রম ও একাগ্রতার বদৌলতে। কিন্তু জাপানের কোন সরকারি কর্মকর্তা সেখানে যাননি একমাত্র রাষ্ট্রদূত ব্যতীত। জাপানের কোন পত্রিকাই এই সংবাদ তুলে ধরেনি। শুধু এটাই নয়, জাপানের কোন গণমাধ্যমই ভারত তথা বাংলা অঞ্চলের ভালো কোন সংবাদের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এমন উদাহরণ খুবই কম। কেবলই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দারিদ্র, ক্ষুধা আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংবাদ প্রকাশ করে এইসব অঞ্চলের বিশ্রী একটি ইমেজ গত ৩০ বছর ধরে সৃষ্টি করেছে। আজকে জাপান ধনী হলেও বরাবরই সে ছিল অভাবী একটি দেশ—এমনকি মাত্র ৫০ বছর আগেও উন্নয়নকামী একটি রাষ্ট্র এবং এখনো দারিদ্র আছে এদেশে কিন্তু এসব তাঁরা দ্রুত ভুলে যেতে বসেছেন। আমরা এমনও দেখেছি জাপানে কোন কোন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফোরাম যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন ভারতকে বাইরে রাখা হয়। যেন এই দেশটির কোন ভালো সংবাদ নেই, আবিষ্কার নেই, উদ্ভাবন নেই, সভ্যতা নেই, চিন্তাভাবনা-দর্শন নেই, উদ্যোগ নেই। যেখানে ভারতের মতো বিশাল একটি রাষ্ট্র এদেশে আজ অনাহুত সেখানে বাঙালি—বাংলাদেশ কোন্ ছার? একটা শীতল অবহেলা যে কাজ করছে জাপানি জনগণ ও সরকারি পর্যায়ে এটা সহজেই অনুমেয়। আর এটা হওয়ার কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অঞ্চল বলে। তাই বলে কি সুদীর্ঘ ১০০ বছরের পরিক্রমায় সৃষ্ট ইতিহাস বিস্মৃত হবে এভাবে? হবে

অবহেলিত? ভুলে গেলে চলবে না যে, এই বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত একাধিক আবিষ্কার, উদ্ভাবন এবং চিন্তাদর্শনের ক্ষেত্রে বাঙালি মনীষীদের অবদান আদৌ কম নয়।। প্রাচীনকালের মিহি সুতোর কাপড় মসলিন, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক গবেষণা, রেডিও আবিষ্কার, উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্ব অনুসন্ধান, আদর্শ মানব শিক্ষা, বিশ্বজনীন মানবধর্ম কিংবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক, সুউচ্চভবন নির্মাণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানবদেহে নতুন জিন্ আবিষ্কার প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাযুক্ত কাজগুলো বাঙালিরা করেছেন। আর আজকের ধনী বিশ্ব যে শিল্পায়নের জোরে গোটা বিশ্বের শোষক বলে পরিচিতি লাভ করেছে সেই শিল্পবিপ্লব ঘটানোর পেছনে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি লগ্নী হয়েছে তার বৃহৎ একটি অংশ কি বাংলা অঞ্চলের নয়? একদা সুজলা-সুফলা এই বাংলা অঞ্চলে ভাগ্যের বদল ঘটাতে বিশ্বের কোন্ জাতির লোক কাজ করতে আসেনি? ইংরেজ, স্পেনীস, পর্তুগীজ, ফরাসী, ড্যানিশ, ওলন্দাজ, তুর্কী, আরব, ইরানী, আফগানী এমনকি জাপানিরাও এসেছেন!

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় আদিকাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব পর্যন্ত জাপানের চিন্তা-দর্শন, রাজনীতি, জ্ঞানাহরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ধর্মানুশীলনের আরাধ্য ও আদর্শ তীর্থস্থান ছিল এশিয়ার দুটি সুপ্রাচীন সভ্যতার সূতিকাগার চীন ও ভারতবর্ষ। আলোচ্য এই শতবর্ষের উৎস ও ধারা ঐ দুটি সভ্যতারই সৃষ্টি। পন্ডিত তেনশিনের ধ্যানজ্ঞানকর্ম জন্ম নিয়েছে এই জ্ঞানসাগর থেকেই।

জাপান ও বাংলা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের শতবর্ষপূর্তি উদযাপন করা হলে জাপানিদের কিছু হারানোর ভয় বা লজ্জিত হওয়ার মতন কোনকিছু ছিল না তা বলাই বাহুল্য। বরং পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। অন্ততঃপক্ষে, তাঁদের দেশের নমস্য ব্যক্তিদের চিন্তাস্নাত, মানবতাবাদী কর্মকান্ডেরই মূল্যায়ন করা হত আর তাতে করে সম্মান বাড়ত বৈ কমত না। বর্তমান স্বপ্নহীন, লক্ষ্যহীন জাপানি নয়া প্রজন্ম জানতে পারত এশিয়ায় গত ৫০ বা ১০০ বছর আগেও কত বড় বড় কান্ডইনা ঘটেছে শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে! এটাই ছিল সত্যিকার আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়। আন্তর্জাতিক, আন্তঃমহাদেশীয় ভাববিনিময়ের

প্রথম শর্তই হচ্ছে, প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়া। আগে দেশপ্রেমিক না হতে পারলে 'আন্তর্জাতিক মানুষ' হওয়া যাবে কিভাবে?

এই শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কোন গ্রন্থ, সচিত্র প্রকাশনা বা দৈনিক-সাময়িকীতে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ কিংবা সরকারি-বেসরকারিভাবে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন হলে পরে শুধুমাত্র বিস্মৃত জাপানি জনগণ ও তরুণ প্রজন্মই যে লাভবান হত তা নয়, বাংলা অঞ্চলের মানুষজনও জানতে পারত অজানা অনেক অনেক ঘটনা, তথ্য এবং ইতিহাস। ফিরে তাকাতে সাহায্য করত নিজেদের হারিয়ে যাওয়া পথচিহ্নের দিকে। এশিয়ার বৈচিত্রধর্মী, গৌরবময় সংস্কৃতির অতীত দৃশ্যগোচর হত তরুণ প্রজন্মের চোখে। সময় হয়ত চলে যায়নি অথবা চলে গেছে। ইতিহাস একদিন এই চরম অবহেলার জন্য, পারস্পরিক জানাজানির এই সুবর্ণ সুযোগকে বিস্মরণের দিকে ঠেলে দেবার জন্য কিভাবে বিচার করবে কে জানে?

....

তথ্য সূত্রঃ

১. প্রসঙ্গঃ রবীন্দ্রনাথ ও জাপান; উজ্জ্বল সূর্য; রবীন্দ্রনাথের টুকবো গল্প/কাজুও আজুমা
২. সেকাই রেনপো উনদো নিজু নেন শি; পারু হাকুশি নো কোতোবা/তানাকা মাসাআকি
৩. ছেনসো নো গ্রাফিজম/তাগাওয়া সেইচি
৪. শিমোনাকা দেনকি
৫. ওকুরায়ামা সেইশিন বুনকা কেনকিউজো
৬. য়োকোয়ামা কিনেনক্যন

....

* Asia is One বাক্যটি The Ideals of the East গ্রন্থে বর্ণিত

....

* ২০০৪ সালে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত
* আলোকচিত্রঃ কেইকো আজুমা; ওকুরায়ামা কিনেনকান এর সৌজন্যে

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং ভারতের স্বাধীনতা

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শিনজুকু শহরের এই 'নাকামুরায়া'—পরাধীন ভারতের অমূল্য মুক্তির পথে নিজেকে একাত্ম করে দিয়ে

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যতখানি আলোচনা হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ-জাপানে, তার তুলনায় তেমন কিছুই আলোচিত হয়নি জাপান প্রবাসী দুই মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং হেরম্বলাল গুপ্ত সম্পর্কে। তবুও রাসবিহারী বসু মাঝে মাঝে ঝিলিক দিলেও বিস্মরণের অতলে তলিয়ে গেছেন হেরম্বলাল গুপ্ত। ভারতবর্ষ তথা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এই দুজন বিপ্লবী বিদেশে কী পরিশ্রম এবং মেধা ব্যয় করেছেন তার মূল্যায়ন হয়েছে কতখানি এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতেই পারে। কিভাবে কী অবস্থায় কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁদের জীবন অতিক্রান্ত হয়েছে জাপানসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশে সেই ইতিহাস বাঙালি কিংবা ভারতীয়রা কতখানি পড়েছেন জানি না। যদি পড়ে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তার ব্যাপক আলোচনা হত; তাঁরাও আজকে নেতাজির পুনর্মূল্যায়নের সঙ্গে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেই লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় রাসবিহারী বসুর একটি বৃহৎ মূর্তি রাজ্যসরকার স্থাপন করেছেন বটে কিন্তু তাঁর জীবনীতিহাস বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন বলে জানা নেই। আজ তাঁদেরসহ সকল মহান বাঙালি বিপ্লবীদের ইতিহাস সকল প্রজন্মের মানুষের জানা প্রয়োজন। জাতীয় ব্যক্তিত্ব আর বীর-বীরাঙ্গনাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মূল্যায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের প্রতিটি মানুষের জাতীয় পরিচিতি ও সম্মান।

আধুনিককালে জাপানে আগত প্রথম ভারতীয় হিসেবে এসেছিলেন ভূপালের নাগরিক আজন্ম বিপ্লবী মৌলানা মোহাম্মদ বরকৎউল্লাহ্ বলে বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যায়। তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। আরও এসেছিলেন বিহারের আরেকজন বিখ্যাত বিপ্লবী, 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন মুভমেন্টে'র জনক রাজামহেন্দ্র প্রতাপ; পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন বিপ্লবী গদর পার্টির অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা ভগবান সিং, কেরালা থেকে আগত এ.এম. নায়ার, এ.এম. সাহাই, রামামূর্তি, আয়ার, দেশপান্ডে প্রমুখ। আরও কতিপয় জাপান প্রবাসী বাঙালির কথা জানা যায় তাঁরা হলেন রমানাথ রায়, তারকনাথ

দাস, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন সেন প্রমুখ। তারকনাথ দাস যিনি গদর পার্টির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন জাপানে একাধিকবার এসেছেন। পরবর্তীকালে মেধাবী এই বিপ্লবী আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ সকলেই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। জীবন বাজি রেখে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ও আন্দোলন করেছেন। কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে রাসবিহারী বসু হয়ে উঠেছিলেন প্রবাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে অনুষ্ঠিত 'ইউনেস্‌কো'র এক সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বিপ্লবী অধ্যাপক ড. তারকনাথ দাস উপস্থিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, "জাপানের আত্মত্যাগের ভিত্তিতেই ভারত, বার্মা ও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল।" ......তিনি আরও বলেছিলেন, "বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনী কোথায়? যদি না থাকে, তাহলে আপনারা লিখুন আমি সেটা ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে সাধারণ ভারতীয়দেরকে পড়তে দিতে চাই।" তাঁর সেই আহবানে সাড়া দিয়ে রাসবিহারী বসুর শাশুড়ি কোক্কো সোমা এবং তাঁর দেবর ইয়াসুও সোমা মহাবিপ্লবীর জীবনী লিখেন এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। জাপানি ভাষায় লিখিত সেই জীবনী ড.তারকনাথ দাস ভারতীয় ভাষায় তর্জমা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইনদো দোকুরিৎসু নো শিশি তো নিহোজনজিন' গ্রন্থের লেখক.গবেষক য়োশিআকি হারা মহাশয় প্রশ্ন তুলেছেন। যে প্রশ্ন আমাদেরও। হারা মহাশয় আরও বলছেন,"এই গ্রন্থটি শুধু বিহারী বসুর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীই নয়, জাপানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংঘটিত ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনেরও ইতিহাস। আরও বলা যায়, মহাএশিয়া যুদ্ধেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইতিহাসের সামগ্রীক দিক থেকেও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীতা নির্দেশ করছে এবং বর্তমান প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একুশ শতকের মধ্যে নিহিত ভারত-জাপান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের প্রকৃত ইতিবৃত্ত উভয় দেশের নাগরিক-বৃন্দ যাতে জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।"

অনমনীয়, উগ্র বিপ্লবী বলে কথিত রাসবিহারী বসু ভারত ত্যাগ

করে পালিয়ে জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন ১৯১৫ সালে। জাপানে তখন তাইশো যুগ (১৯১২-১৯২৬) এবং তাইশো চার সাল। এই যুগে জাপানে ঐতিহাসিক 'তাইশো গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার যেমন সূচনা হয়েছে তেমনি জাতীয়তাবাদের উত্থানও ঘটেছে প্রবলভাবে। ভারতবর্ষব্যাপী ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ-শাসনের বিরুদ্ধে গুপ্ত বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলন ও আক্রমণ জোরদার হচ্ছিল ক্রমশ। মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত নেহেরু, প্যাটেল, তিলক, গোকুলে, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ ব্রিটিশ শাসন, শোষণ, বৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ লিখে চলেছেন একটার একটা উদীপ্ত প্রবন্ধ, কবিতা এবং দেশপ্রেমে আপ্লুত স্বদেশী গান। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবি নজরুল ইসলামও রক্ত-উথলানো, মনন-সঞ্চালক গান একটার পর একটা রচনা করেছেন। সেসব ছড়িয়ে পড়ে শহর গ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত, অনুপ্রাণিত করে সাধারণ মানুষকে। কলকাতা, ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ বাংলা অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র চলেছে জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র বিপ্লবীদের শ্বেতাঙ্গ নিধন এবং অস্ত্রলুট। সেই সশস্ত্র বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান ছিলেন রাসবিহারী বসু। এই বিপ্লবীদের ছিল শক্তিশালী ঘাঁটি, যোগাযোগ এবং বিশ্বস্ত নেতৃত্ব। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষেরও সমর্থন তাঁদের কর্মকান্ডকে গতিসম্পন্ন করেছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলা অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রচন্ড। তার সূচনাও হয় এখানেই।

এই যে গুপ্ত সশস্ত্র আন্দোলনের সময়টা যাকে বলা হয়ে থাকে 'বাংলার অগ্নিযুগ' তার জন্ম ঘটে বাংলার নবজাগরণ সূচনাকারী ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরহিত্যে ১৯০২ সালে 'অনুশীলন সমিতি' গঠনের মধ্য দিয়ে। বাংলা তথা ভারতের প্রথম এই গুপ্ত সমিতিটির জন্মপর্বে রয়েছে জনৈক প্রভাবশালী জাপানি জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তির প্ররোচনা এবং সক্রিয় উদ্যোগ। তিনি জাপানের শ্রদ্ধেয় মনীষী--কলাশিল্পের পন্ডিত, প্রাচ্যবাদী চিন্তানায়ক

তেনশিন ওকাকুরা (কাকুজো ওকাকুরা, ১৮৬৩-১৯১৩)। তেনশিন ভারতে প্রথম এসেছিলেন ভগ্নি নিবেদিতার আমন্ত্রণে। ভগ্নি নিবেদিতার সঙ্গে ছিল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। নিবেদিতাই তাঁকে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গভীর বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী পিতামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সংসারে ১৮৭২ সালে জন্ম সুরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন একরোখা স্বভাবের। যৌবনে পিতামাতা ছাড়াও খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল তাঁর ওপর প্রচন্ড। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই বৈপ্লবিক আর্দশের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। তাঁর স্বাদেশিকতাকে সম্পূর্ণভাবে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তেনশিন। তাঁদের দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় খুব দ্রুত। তেনশিন যখনই কলকাতা আসতেন সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে অবস্থান করতেন। তাঁদের বন্ধুত্ব ও চিন্তাভাবনা এমনই বিশ্বস্ততার পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তেনশিন তাঁর ঐতিহ্যবাহী পরিবারের একটি 'তলোয়ার' সুরেন্দ্রনাথকে বন্ধুত্বের প্রতীক স্বরূপ উপহার দিয়েছিলেন। যা জাপানিরা কখনোই করেন না। তেনশিনের উদ্যোগেই মূলত বিপ্লবী দলটি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তখন পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি জড়িত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতের অগ্নিযুগের অন্যতম পুরোধা ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র), চিত্তরঞ্জন দাস, অরবিন্দ ঘোষ, ভগ্নি নিবেদিতা প্রমুখ। সুরেন্দ্রনাথ উক্ত সমিতির কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং অর্থ যোগান দিতেন। প্রয়োজনে অস্ত্রেরও ব্যবস্থা করতেন বলে জানা যায়। ঠাকুর বাড়িতেও বিপ্লবীরা আসাযাওয়া করতেন বলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিদ্র, সুলেখক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় প্রমাণ রয়েছে। তিনি আরও বলছেন, সুরেন্দ্রনাথ বিপ্লবীদেরকে গগনেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে আসতেন। বিপ্লবী বারীন ঘোষ এসেছেন, উল্লাস কর এসেছেন খুব সম্ভবত রাসবিহারী বসু ও অরবিন্দ ঘোষও এসেছেন। আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রায় সকলেরই যোগাযোগ ছিল সুরেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে। ধারণা করা যায় তেনশিনের সঙ্গে

অধিকাংশ বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে থাকবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। রাসবিহারী, হেরম্বলাল গুপ্তও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তেনশিন ওকাকুরার প্রভাব ছাড়াও তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব এবং বিপ্লবীদেরকে প্রভূত পরিমাণে আন্দোলিত করেছিল ১৯০৫ সালে সংঘটিত রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানিদের বিজয়। বলা হয়ে থাকে যে, এই যুদ্ধ সংঘটনের পেছনে তৎকালীন জাপানের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের প্ররোচনা ও প্রভাব কাজ করেছে। তিনি মিৎসুরু তোয়ামা--ঘোর জাতীয়তাবাদী, গণমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা এবং 'কোয়োশা', 'গেনয়োশা', 'কোকুরিউকাই' প্রভৃতি গুপ্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক এবং এশিয়াবাদী (প্যান-এশিয়ানিস্ট)। যিনি জাপানে রাসবিহারী বসু, হেরেম্বলাল গুপ্ত, চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা সোনবুন (Sun Wen, ১৮৬৬-১৯২৫) প্রমুখের রাজনৈতিক আশ্রয়দাতার প্রধান ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশ্বে এই প্রথম যুদ্ধবাজ দখলদার শ্বেতাঙ্গদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল এশিয়ারই এক সংকর জাতির দেশ জাপান যা রাজনীতি সচেতন বাঙালি তথা শিক্ষিত ভারতীয়দেরকে জাপানের দিকে আকৃষ্ট করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রবলভাবে। নিঃসন্দেহে রাসবিহারী বসুও সেভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে টোকিয়ো হয়ে উঠেছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান পরিচালনা কেন্দ্র। ভারতের অন্যান্য যে কোন স্থানের চেয়ে বাংলা-অঞ্চলে বিপ্লবীদের সশস্ত্র তৎপরতার কারণে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা ১৯০৫ সালে এই অঞ্চলকে দুভাগে বিভক্ত করার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু সেটা সার্থক হতে পারেনি বাঙালির জাতীয়তাবাদী ঐক্যবদ্ধতার কারণে।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে এসেছিলেন কিভাবে সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সুস্পষ্টভাবে কোথাও তা বর্ণিত হয়নি। এমনকি স্বলিখিত বিপ্লবী-কর্মকান্ড ভিত্তিক 'সেইনেন আজিয়া নো শৌরি' বা 'তরুণ এশিয়ার জয়' গ্রন্থেও তিনি এই বিষয়ে কোন ইঙ্গিত প্রদান করেননি। শুধু জানা যায় লাহোরে গার্ডস সাহেবকে বোমা দ্বারা হত্যা করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর দ্রুত তিনি ভারতত্যাগের সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত রাসবিহারী বসুর একান্ত অনুগত শিষ্য বসন্তকুমার বিশ্বাসের ফাঁসি হয় পাঞ্জারের জেলে ১৯১৫ সালের ১১ই মে তারিখের শেষ রাতে। দিল্লী ও লাহোরে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী দুটি বিশেষ ঘটনার মূল পরিকল্পক যে রাসবিহারী বসু ছিলেন তা ফাঁস হয়ে যায় গ্রেপ্তারকৃত বিপ্লবী দীননাথ তালোয়ারের স্বীকারোক্তিতে। পুলিশ রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালায় কিন্তু ব্যর্থ হয়ে এক মামলা দায়ের করে যা 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পবিচিত। বৃটিশ প্রশাসন রাসবিহারীকে ধরিয়ে দেবার জন্য লোভনীয় অংকের পুরস্কার ঘোষণা করে যার পরিমাণ তৎকালীন সময়ে ১২,০০০ রূপী বা ৫ হাজার বৃটিশ পাউন্ড। নিঃসন্দেহে তৎকালীন সময়ে লোভনীয় বিরাট অংকের অর্থ! "বসন্ত কুমারের ফাঁসীর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রাসবিহারী জাপানের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন।" জাপানে পলাতক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আরেক জন বিপ্লবীর নাম জানা যায় যাঁর অবদানও আদৌ কম নয় তিনি হেরেম্বলাল গুপ্ত। যাঁর নাম প্রথমেই বলেছি। তাঁর সঙ্গে বিহারী বসুর কোথায় কিভাবে পরিচয় হয়েছিল সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তবে রাসবিহারী বসুর জাপানে আগমনের ৩/৪ মাস পর সাংহাই থেকে জাহাজে করে এসে নেমেছিলেন কোবেবন্দরে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জাপানে আসার আগে বিহারী বসু এক গোপন সভায় উল্লেখ করেছেন, "এক এক করে অনেকেই বর্হিবিশ্বে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তাঁদের মধ্যে একজন জাপানে যাওয়ার টিকিট বহনকারীও ছিল", এই ব্যক্তি হেরেম্বলাল কিনা সঠিক করে বলা না গেলেও সন্দেহ দূরীভূত হয় না।

জাপানের কোবেবন্দরে পৌঁছে বিহারী বসু রেলে চড়ে কিয়োতো হয়ে রাজধানী টোকিয়োর শিনবাশি স্টেশনে পৌঁছেন জুন মাসের ৮ তারিখে। অজানা, অপরিচিত টোকিয়ো শহরে এসে প্রথমে কার বা কাদের আশ্রয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন সে সম্পর্কেও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ইংরেজিজানা জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে সহযোগিতা করেন এবং থাকার জন্য বাসা পর্যন্ত খুঁজে দেন। টোকিয়োতে তখন বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি ও অবাঙালি গদর পার্টির সদস্য অবস্থান করছিলেন। এসেই তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং গোপন কার্যক্রম চালাতে থাকেন

স্বদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য। গদর পার্টির জাপান প্রবাসীদের মধ্যে ভগবান সিং অন্যতম প্রধান।

১৯১৫ সালেরই নভেম্বর মাসের .৭ তারিখে টোকিয়োর ওয়েনো শহরে জাপান-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিনিময় সংক্রান্ত একটি সভার আয়োজন করা হলে বৃটিশ সরকার 'সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনাকারী' বসু এবং আরেক জন স্বাধীনতা আন্দোলনকারীকে (হেরেম্বলাল গুপ্ত) এই দেশত্যাগের বিষয়ে জাপান সরকারকে অনুরোধ করে। বৃটেনের মিত্রদেশ জাপানের সরকার এই অনুরোধ গ্রহণ করে এবং ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখের মধ্যে দুজনকে জাপান ত্যাগের নির্দেশ দেয়। উপায়ন্তর না দেখে রাসবিহারী সোনবুন এর শরণাপন্ন হন। অবশ্য এর আগে জাপানে এসেই তিনি তাঁর সঙ্গে. সাক্ষাৎ করতে যান। জাপান প্রবাসী প্রচন্ড প্রভাবশালী এই চীনা জাতীয়তাবাদী নেতা এবং বিপ্লবীর সঙ্গে বিহারী বসু কিভাবে পরিচিত হলেন সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি রয়েছে। বর্ষীয়ান শিক্ষক.গবেষক শোজো কুসাবিরাকি তাঁর রচিত 'ইনদো দোকুরিৎসু হিৎসুওয়া' (ভারত স্বাধীনতার গোপন কথা) গ্রন্থে জানাচ্ছেন হেরেম্বলাল গুপ্তের মাধ্যমে বিহারী বসু সোনবুন এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে সদ্য প্রকাশিত তরুণ গবেষক তাকেশি নাকাজিমা লিখিত 'নাকামুরায়া নো বোউসু' (নাকামুরায়ার বসু) গ্রন্থে বলছেন, বিহারী বসু সোনবুন এর জাপান অবস্থানের কথা পত্রিকা মারফত জানতে পেরেছিলেন। এবং জাপান প্রবাসী বিপ্লবী গদর পার্টির সক্রিয় কর্মকর্তা ভগবান সিং এর মাধ্যমে সোনবুন এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। যাই হোক, সোনবুন বিহারী বসুর কথা শুনে বলেন, "পুলিশ জেনে গেছে তোমাদের পরিচিতি। আর রক্ষা নেই।" তিনি তৎক্ষণাৎ এমন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কাছে তাঁদেরকে পাঠান যাঁর হস্তক্ষেপ ছাড়া তাঁদেরকে রক্ষা করার আর কোন উপায় ছিল না। তিনি হলেন মিৎসুরু তোয়ামা। অপরিচিত ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাঁদেরকে "বুঝেছি, যতটুকু সক্ষম করব" বলে উত্তর দিলেন। তোয়ামা বসুদের আবেদনে সম্মতি জানালেন কিন্তু সাহায্য-সহযোগিতা বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা দিলেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে রইলেন

রাসবিহারী বসু ও হেরেম্বলাল গুপ্ত বিভিন্ন স্থানে।

ডিসেম্বর মাস। এই মাসের প্রথম দিনই সকালে টোকিয়োস্থ শিনজুকু শহরে অবস্থিত জাপানের সুবিখ্যাত 'নাকামুরায়া' ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত খদ্দেরদের একজন এলেন যিনি মিৎসুরু তোয়ামার পরিচিত। কথাচ্ছলে জানালেন, তোয়ামা খুবই বিপদে পড়েছেন। সরকার ঘোষিত রাসবিহারী বসুর জাপানত্যাগের আদেশের কথাও বললেন। এই কথা শুনে তোয়ামা মহাশয়ের ভক্তকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক আইজো সোমা বললেন,"বরং আমার স্থানটি যদি পছন্দ হয় এখানে লুকিয়ে থাকলে....।" এই কথাটিই তোয়ামার কানে গিয়ে তুললেন উক্ত খদ্দের যার নাম নাকামুরা তাসুকু। তোয়ামা রাসবিহারীর আবেদন শোনার পর দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন কিভাবে তাঁদেরকে রক্ষা করা যায়? 'নাকামুরায়া'র মালিক যখন স্বয়ং এই আশ্বাস দিয়েছেন সেটা লুফে নিয়ে সেইদিনই রাসবিহারী বসু ও হেরেম্বলাল গুপ্তকে বিপদ থেকে উদ্ধারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। টোকিয়োস্থ শিবুইয়া শহরের রেইনানসাকাতে অবস্থিত তোয়ামার বাড়িতে গুপ্ত সংস্থা 'গেনয়োশা'র হানসুকে তেকিনো, উচিদা রিয়োহেই প্রমুখ ২০ জন বিশিষ্ট কর্মকর্তা মিলিত হলেন। সন্ধ্যাবেলা তোয়ামার শিষ্য তোতেন মিয়াজাকি রাসবিহারীকে নিয়ে সেখানে এলেন। বাড়ির বাইরে তখন প্রহরারত পুলিশ গাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। রাত নয়টার দিকে তোয়ামার আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে, টুপি চোখের নিচ পর্যন্ত নামিয়ে জনৈক জুদো খেলোয়াড়ের বেশ ধরে রান্নাঘরের দরজা পেরিয়ে পেছন দিক দিয়ে তোয়ামার আরেক প্রতিবেশী শিষ্য টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তোউরু তেরাও এর বাড়ি গলিয়ে বড় রাস্তায় জনৈক শিগেমারু সুগিয়ামার অপেক্ষারত গাড়িতে বসুরা চারজন চড়ে বসলেন। তারপর চারজন খুব দ্রুত শিনজুকু শহরের 'নাকামুরায়া' ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন এবং অবশিষ্টাংশ কয়েকজন খদ্দেরের পাশ ঘেঁষে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে মিলিয়ে গেলেন।

'নাকামুরায়া' দোকান-বাড়িটির পেছনে পাশ্চাত্য নকশায় নির্মিত একটি নির্জন ভুতুড়ে ভবন ছিল এই বাড়িটি কেনার প্রথম থেকেই। সেটাকে 'আটরিয়ে' হিসেবে এক সময় ব্যবহার করতেন এই প্রতিষ্ঠানে

আশ্রিত জনৈক চিত্রশিল্পী। সেটার দ্বিতলে বিপ্লবী দুজনের গোপন আশ্রয় নিশ্চিত হল। সেই সময় তাঁদের জন্য এই আশ্রয়টি ছিল নিরাপদ। কেননা প্রথমত, এই দিকটায় লোকজনের খুব একটা আসাযাওয়া ছিল না। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন টোকিয়োর শিনজুকু শহরে অবস্থিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'নাকামুরায়া'র একটি আন্তর্জাতিক পরিচিত ছিল। বিদেশীরা শুধু খদ্দেরই ছিলেন না, 'নাকামুরায়া সেলোন' নামক সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠানটির ভেতরে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আইজো সোমা ও স্ত্রী কোক্কো সোমা দুজনেই সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন সেই সময়। সেলোনের সঙ্গে তৎকালীন খ্যাতিমান শিল্পী, সাহিত্যিকরা জড়িত ছিলেন। বিদেশীরাও ছিলেন যেমন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসা জাপানে আশ্রয় গ্রহণকারী অন্ধ কবি ও সঙ্গীতকার ভাসিলি আরেশনকো। কাজেই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বিদেশীদের যাওয়াআসা ও সম্পর্ক থাকার কারণে কর্মরত কর্মচারীরাও প্রথম দিকে ধারণা করতে পারেননি যে ভবনের পেছনে দুজন পলাতক ভারতীয় বসবাস করছেন। পরে অবশ্য তা জানাজানি হওয়ার আভাস পাওয়া মাত্র সতর্ক কোক্কো সোমা দোকানের সকলকে ঘটনা খুলে বলেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন। কর্মচারীরা তাঁর কথায় এতই মুগ্ধ হন যে অনেকেই প্রতীজ্ঞা করেন উক্ত দুজন ভারতীয় দেশপ্রেমিককে জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করবেন।

তারপরও সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও স্বাভাবিকভাবে কালাতিপাত করতে পারেননি রাসবিহারী বসু ও হেরম্বলাল গুপ্ত। কক্ষে না ছিল রান্না করার ব্যবস্থা, না ছিল স্নানঘর। শীতের মধ্যে প্রচন্ড ঠান্ডায় তাঁদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। তবুও এখানে থেকেই তাঁরা তাঁদের গুপ্ত কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন কোক্কো সোমা। তিনি তাঁদের সব রকমের দেখভাল করতেন। মোটামুটি ইংরেজি তিনি বুঝতে ও বলতে পারতেন। কাজেই ভাষাগত যোগাযোগে তেমন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। তারপরও তথ্যাদি আদান প্রদানের ক্ষেত্রে দূত ও অনুবাদক হিসেবে সোমা পরিবারের জ্যেষ্ঠ কন্যা তোশিকো সোমা সহযোগিতা করছিল। সে তখন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

এখানে মাস তিনেক কাটানোর পর অস্থির হেরম্বলাল গুপ্ত রাসবিহারী বসুর সঙ্গে রাগারাগি করে 'নাকামুরায়া' ছেড়ে আমেরিকার পথে পাড়ি জমালেন। বিহারী বসু একা হয়ে গেলেও এখান থেকে নড়লেন না। এক সময় কোক্কো সোমাকে তিনি মা বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। ক্রমশ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এই পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে। এছাড়া তাঁর পক্ষে আর কোন পথ খোলা ছিল না যা তিনি সেই সংকটময় অবস্থায় গ্রহণ করতে পারতেন। মাথার উপর তখনো ঝুলছে তাঁর গর্দানের মূল্য হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত বিরাট অঙ্কের পুরস্কার! আর জাপানে তাঁর মূল রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা মিৎসুরু তোয়ামা ছিলেন সোমা পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠতম গুরুজন। তাঁর কাছাকাছি থাকা বিহারী বসুর জন্যও ছিল অত্যন্ত জরুরী, কেননা যে কোন বিপদ-আপদে তাঁর বাড়িতে চলে যাওয়া সহজ ছিল। অবশ্য তোয়ামা নিয়মিত তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে আসাযাওয়া করতেন। ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে এখানেই তাঁদের মধ্যে গুপ্ত আলোচনা, পরিকল্পনা হত। রাসবিহারী বসুরও আগে জাপানে আগত অন্যান্য ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিপ্লবী কর্মীরাও এখানে মিলিত হতেন। ফলে 'নাকামুরায়া' হয়ে উঠল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চালিকাশক্তির মূলকেন্দ্র।

এভাবে কিছুদিন চলে যাওয়ার পর জাপান সরকার জানতে পারলেন যে পলাতক দুজন ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবীর একজন শিনজুকু শহরের 'নাকামুরায়া'র অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর গতিবিধির উপর গুপ্তচর লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু সহসা তাঁকে গ্রেপ্তার করার সাহস পুলিশ প্রশাসন দেখাতে পারেনি একমাত্র রাজনৈতিক গুপ্তসমিতি 'গেনয়োশা'র প্রধান প্রভাবশালী নেতা মিৎসুরু তোয়ামা ছিলেন তাঁর মূল রক্ষাকারী বলে। তবে পরিস্থিতি যখন ক্রমে প্রতিকূল হয়ে উঠল বিহারী বসুকে রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তোয়ামা। তাঁকে লুকিয়ে রাখার মতো একটি বাড়িও খুঁজে পাওয়া যায়নি তখন। তবু উপায়ন্তর না দেখে টোকিয়োর বিভিন্ন জনের বাড়িতে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য তাঁকে লুকিয়ে

থাকতে হয়। 'নাকামুরায়া' থেকে তাঁর পলায়নের সংবাদ টোকিয়োস্থ ব্রিটিশ দূতাবাস জানতে পেরে সরকারের উপর আবার চাপ প্রয়োগ করে বিহারী বসুর অবস্থান খুঁজে দেখার জন্য। ফলে আরও জোর তদন্ত শুরু হয় তাঁর গুপ্ত অবস্থান অনুসন্ধানে। যেখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকুন না কেন পুলিশ দ্রুত তা জানতে পেরে হামলা চালাতে থাকে। কিন্তু তার আগেই অভিজ্ঞ বিহারী বসু সেখান থেকে সরে পড়েন। এইভাবে টোকিয়োতে যখন লুকিয়ে থাকা অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে উঠল তখন একদিন আইজো সোমা তাঁকে জাপানি পোশাকে সাজিয়ে টোকিয়োর থেকে অনেক দূরে ইবারাকি-জেলার এক জেলেদের গ্রামে নিয়ে যান। কিন্তু পুলিশ রেলস্টেশনের কর্মকর্তার কাছে ভাসা ভাসা তথ্য সংগ্রহ করে ধারণা করল বিহারী বসু ইবারাকি-জেলায় চলে যেতে পারেন। পুলিশ ছুটল সেদিকে। এই সংবাদ পেয়ে আইজো সেখান থেকে আবার পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। এবার ট্রেন না চড়ে ট্যাক্সি ভাড়া করে বিহারী বসুকে নিয়ে বিভিন্ন পথ ঘুরে পুনরায় টোকিয়ো এসে পরিচিত এক বাড়িতে তাঁকে লুকিয়ে রাখেন।

কিন্তু এইভাবে তাঁকে আর কতদিন লুকিয়ে রাখা যাবে ভেবে সকলেই হতাশ হয়ে পড়লেন। আর কোন উপায় না পেয়ে তোয়ামা একটি প্রস্তাব রাখলেন সোমা পরিবারের কাছে। আর তা হল: তাঁদের বড় মেয়ের সঙ্গে বিহারী বসুর বিবাহ দেয়া! এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। অকস্মাৎ এই প্রস্তাবে সোমা পরিবার মহাসংকটে পড়ে গেলেন। কেননা এ তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করেননি! অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা দুজনে রাজি হলেন। কিন্তু কন্যা তোশিকোকে কীভাবে বলা যাবে এই সময়ে, সে মাত্র উচ্চবিদ্যালয় উত্তীর্ণ হয়েছে। তার জন্য সামনে নতুন এক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। কোক্কো সোমা সাহস করে মেয়েকে বিষয়টি খুলে বলেন এবং তার মতামত জানতে চান।

তোশিকো কয়েকদিন সময় নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তে গুরুজন তোয়ামার প্রস্তাবে রাজি হল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সে তার মনোভাব ব্যক্ত করে বলল, "ভারতীয় বিপ্লবী দেশপ্রেমিক বসুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও।" অবশ্য পরিবারের কেউ কেউ সরাসরি এই

বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তোশিকোকে রাজি হতে নিষেধ করেছিলেন। জানা যায় তোশিকো একজনকে পছন্দ করতো এবং ভালবেসেছিল কৈশোরেই। তার ভালোলাগার মানুষটি 'নাকামুরায়া'র অভ্যন্তরেই অবস্থান করছিল নাকামুরা ৎসুনে নাম্নী প্রতিভাবান এক তরুণ চিত্রশিল্পী। দুজনের ঘনিষ্ঠতা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে ৎসুনে তোশিকোর কয়েকটি ছবিও এঁকেছিল। যা সোমা দম্পত্তির দৃষ্টিতে পড়ে। তাঁরা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মেয়েকে সাবধান করে দেন ৎসুনেকে যেন আর প্রশ্রয় দেয়া না হয়। তার প্রধান কারণ ৎসুনের ছিল রাজরোগ ---যক্ষা! আইজো সোমা একদিন ৎসুনেকে তার অসুখের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে এবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই ঘটনার অনেকদিন পর হঠাৎ করে একদিন উপস্থিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তোশিকোকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয়নি। ঘটনার এখানেই সমাপ্তি ঘটে।

নাকামুরা ৎসুনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তোশিকোকে যেমন দুঃখ দিয়েছিল তেমনি বিহারী বসুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর স্বাভাবিক সুখ লাভ করাও তার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কালক্রমে তার জীবন বিহারী বসু তথা ভারতের স্বাধীনতার জন্যই উৎসর্গ করতে হয়েছিল।

১৯১৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি একদিনে তোয়ামার বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিহারী বসুর বয়স তখন ৩২ বছর। কিন্তু বিশেষ অসুবিধার কারণে তারিখ পিছিয়ে জুলাই মাসের ৯ তারিখ বিবাহনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর বিহারী বসু শ্বশুরালয়ে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বসবাস করতে পারেননি। বিয়ের পর বরং তাঁকে পরিবারসহ নানা জায়গায় কয়েক মাস অন্তর অন্তর বাসা বদল করে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। বিবাহপূর্ব জীবনের চেয়ে বিবাহোত্তর জীবন তাঁর জন্য আরও বেশি কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। কেননা তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। জাপানে বিহারী বসু শুধু ভারতীয় বিপ্লবী হিসেবেই পরিচিতি ছিলেন না, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে শত্রুপক্ষ জার্মানীর গুপ্তচর হিসেবেও প্রচার করেছিল এবং মিত্রশক্তি হিসেবে জাপানের সরকারকে চাপ প্রয়োগ করছিল যে কোন উপায়ে তাঁকে ধরিয়ে দেয়ার

জন্য। কিন্তু সরকারের পক্ষে তাঁকে গ্রেপ্তার করা সহজ ছিল না। তবে হন্যে হয়ে গুপ্ত পুলিশ তাঁকে খুঁজে ফিরেছে জাপানব্যাপী। যে কারণে বারবার বিহারী বসুকে চারটি মাস নানা জায়গায় আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। অন্ততঃপক্ষে সতের বার নাম বদল করে সতের বার বাসা বদল করার কথা তাঁর শাশুড়ি কোক্কো সোমার আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়।

অবশ্য বিয়ের চার মাস পর বিহারী বসুর জীবনে হঠাৎ সূর্যের ঝলক এসে পড়ে! নভেম্বর মাসে দীর্ঘ চার বছর তিন মাস পর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ভার্সাই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। এই প্রথমবার কোক্কো ভারমুক্ত মন নিয়ে বিহারী বসু ও তোশিকোর গৃহে প্রবেশ করেন। সেই গৃহ এমন এক অপরিচিত স্থানে গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত ছিল যে বাইরের আলো সেখানে প্রবেশ করা ছিল যেন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ! স্যাঁতস্যাঁতে অপরিসর সেই গৃহে প্রবেশ করে আদরের দুলালী বণিক-কন্যা তোশিকোর দুরবস্থা দেখে অশ্রুবর্ষণ করেন কোক্কো সোমা। বিহারী বসুর সংকটময় সময়ের পর্দা উত্তোলন হওয়ায় আশ্বস্ত হলেও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তিনি। কেননা ততদিনে আরেক সংকটের ভ্রূণ অঙ্কুর মেলেছে তোশিকোর বুকের মধ্যে।

অবিরাম পলায়নপর জীবনের পালাবদল, অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, নিরাপত্তাহীনতার ভিতর দিয়ে একাধিক মাস কাটাতে হয়েছে তাকে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিহারী বসু জীবিকা অর্জন, স্বদেশের স্বাধীনতার পক্ষে গুপ্ত তৎপরতা, অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ, স্বদেশে আন্দোলনরত সতীর্থ বিপ্লবীদেরকে সাহস, প্রেরণা যোগানো প্রভৃতি কাজে কী ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে বাইরে যখন স্বামী ব্যস্ত তখন তোশিকো এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে নীরবে হিমশিম খেয়েছেন সংসারের কাজে। মুখ ফুটে কোনদিন স্বামীকে কটূ কথা বলা বা তাঁর কাজের সমালোচনা করেননি। বরং নীরবে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে বিহারী বসুর কর্মকান্ডে সমর্থন এবং সহযোগিতা করে গেছেন। এত বড় ধনী ঘরের দুলালী হয়েও অস্থির অনিশ্চিত জীবনকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। বিয়ের পর চারটি মাস গোপন বসবাসের ফলে তার পক্ষে সূর্যের মুখ

দেখা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। ফলে দীর্ঘদিন ঠান্ডা ও জ্বরজারিতে ভুগেছেন। এই উপসর্গ থেকে আক্রান্ত হয়েছিল তার কোমল বুক দূরারোগ্য যক্ষারোগে। রোগাক্রান্ত তোশিকো বসু ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে মাত্র ২৬ বছর বয়সে দুটি সন্তান রেখে স্বর্গলোকে যাত্রা করেন।

এদিকে বিয়ের ছয় মাস পরে লোকমুখে রটনার মাধ্যমে নাকামুরা ৎসুনে জানতে পারেন যে তোশিকোর বিয়ে হয়েছে 'নাকামুরায়া'য় গোপনে আশ্রিত সেই বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে। অন্যদিকে ৎসুনে তোশিকোর এক বছর আগে ১৯২৪ সালে একই রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

তোশিকোর এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সোমা দম্পত্তির জীবনে অকথ্য শোক বয়ে আনে। জননী হিসেবে কোক্কো সোমার একবার মনে হয়েছে, মেয়েকে যেন স্বেচ্ছায় নিজের হাতে জলে ভাসিয়ে দিলেন চিরতরে। কিন্তু পরে তা পরিবর্তিত হয় রাসবিহারীর মুখে তোশিকো সম্পর্কে তাঁর মনের অনুভূতি জানতে পেরে। বিহারী বসু কী প্রচন্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন তা হয়তো তিনি ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারেনি। কেননা তোশিকো শুধু তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী ছিলেন না, ছিলেন একাধারে তাঁর স্বপ্নের ভাগীধার, একান্ত সচিব। বুকের মধ্যে নিরন্ধ্র নিঃসঙ্গতা নিয়েও দেশের জন্য তিনি অবিরাম কাজ করে গেছেন। তাঁর মাতৃহারা দুটি সন্তান ছেলে মাসাহিদে তখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ও মেয়ে তেৎসুকো দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। তারা সোমা দম্পতির কাছে মানুষ হতে থাকে। প্রতি রবিবার তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বিহারী বসুর বাড়িতে যেতেন কোক্কো সোমা। শত ব্যস্ততার মধ্যেও বিহারী বসু সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অপেক্ষা করতেন। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। একদিন কোক্কো বিহারী বসুকে অনুরোধ করলেন আবার নতুন করে সংসার করার জন্য। বিহারী বসুর সঙ্গে বিয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন কয়েকজন মহিলা। তাঁদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের সুশিক্ষিত নারীও ছিলেন। কিন্তু শাশুড়ির কথা শুনে হাসলেন বিহারী বসু। বললেন, "এই বয়সে নতুন কোন নারীকে গ্রহণ করা আমার জন্য বেদনাদায়ক। কেননা তোশিকোর প্রতি আমার যে অনুভূতি তা অন্য নারীর প্রতি অনুরূপ হবে

এমনটি ভাবি না। তাছাড়া আপনাদের মতো মাবাবাকে ত্যাগ করে অন্যজনকে আশা করি না। আমার নিজের শরীর মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গিত, প্রাণটা নিজের বলে মনে করি না সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাঁচার অবলম্বন হিসেবে পুনরায় বিয়ে করার ইচ্ছে নেই।" এই উত্তর শুনে কোক্কো সোমা অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে স্বর্গতা তোশিকোর উদ্দেশে মনে মনে বললেন, "কী সৌভাগ্য তোশিকোর এমন স্বামী পেয়েছিল সে!" আর কোনদিন তিনি এ প্রসঙ্গে বিহারী বসুকে কিছু বলেননি। বিহারী বসুও প্রয়াত তোশিকোর স্মৃতি বিস্মৃত হননি মৃত্যুপর্যন্ত। সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল সোমা পরিবারের সঙ্গে আমৃত্যু। স্ত্রীর মৃত্যুর পরের বছর 'নাকামুরায়া'র দ্বিতলে একটি কক্ষে রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে ভারতীয় খাবার তথা 'ইন্ডিয়ান কারি'র প্রচলন করেন। যা আজও চালু রয়েছে এবং তাঁর নাম স্মরিত হচ্ছে ব্যাপকারে জাপানব্যাপী।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু দীর্ঘদিন অসুখে ভোগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৫ সালে জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে মহানির্বাণের পথে পাড়ি জামান, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। মৃত্যুর পূর্বে যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের বাঁশী শুনে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ছেলে মাসাহিদে ওকিনাওয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানি রাজকীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে আমেরিকার সৈন্যের হাতে প্রাণ হারান।

বিহারী বসু জাপান ও ভারতে নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধাভাজন খ্যাতিমান এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। জাপানে অতিবাহিত তাঁর ঘটনাবহুল বর্ণময় জীবন আজ কিংবদন্তী। কাঠখোট্টা রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ছিলেন যেমন দুঃসাহসী তেমনি দরাজ হৃদয়ের পিতৃবৎসল বন্ধুত্বমনস্ক মজলিসী মানুষ। জাপানের তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনীতিক, সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁদের মধ্যে জাপানের আধুনিক প্রকাশনা জগতের জনক শিক্ষাবিদ.লেখক.মৃৎশিল্পী এবং আন্তর্জাতিক শান্তিবাদী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ইয়াসাবুরো শিমোনাকা, লেখক.গবেষক.শিক্ষক মাসাআকি তানাকা, শিক্ষাবিদ. দার্শনিক ড.কুনিহিকো ওওকুরা, ভারতীয়

দর্শন বিষয়ে পন্ডিত মেধাবী অধ্যাপক শুমেই ওওকাওয়া, তোতেন মিয়াজাকি, ড. তোউরু তেরাও, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিগেরু য়োশিদা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। জাপানি নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বিহারী বসু ডায়েট তথা জাতীয় সংসদে আসন নেয়ার জন্য নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এসব কর্মকান্ড ছিল শুধুই স্বদেশের মুক্তির লক্ষ্যে। ভারতীয় স্বাধীনতাকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে তাঁর যে একনিষ্ঠ আত্মত্যাগ আর সাহসী ভূমিকার কথা জানা যায় তার জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর একাধিক কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে, আজাদ হিন্দ ফৌজ (INA) গঠন, The Great Asia Co-Prosperity Sphere (মহাএশিয়া যৌথ উন্নয়ন বলয়) এ ভারতের অন্তর্ভুক্তিকরণ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানে আহ্বান--তাঁর হাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ প্রভৃতি। লিখেছেন এশিয়া, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস সম্পর্কে বহু রচনা এবং গ্রন্থ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দুবার সাক্ষাৎ ঘটে জাপানে। তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদাও তুলে দিয়েছেন জাপানি, প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে। বিহারী বসুর জীবন রক্ষাকারী মিৎসুরু তোয়ামার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের ব্যবস্থাও করেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত বিপ্লবীদের জাপানে আশ্রয় এবং সহযোগিতা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তোয়ামার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রাসবিহারী বসু শুধুমাত্র জাপান ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ককেই শক্তিশালী করেননি, সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনেরও রূপকার ছিলেন। তাঁর এই প্রদীপ্ত ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ শোওয়া সম্রাট হিরোহিতোর কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মানীত 'পদক' অর্জন করেছিলেন। সেইসব ইতিহাস এখন বিস্মরণের অতলে তলিয়ে গেছে।

শুধু রাসবিহারী বসুর কথাই নয়, তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত স্ত্রী তোশিকো বসু বা সুপ্রসিদ্ধ 'নাকামুরায়া'র সোমা পরিবারের কথা বাঙালি বা ভারতীয়রা খুব একটা জানেন বলে মনে হয় না। একজন ভিনদেশী বিপ্লবী দেশপ্রেমিকের জন্য ধনীর দুলালী তোশিকো তাঁর তরুণ জীবন উৎসর্গ করার ইতিহাস কতখানি মূল্যায়িত হয়েছে সেটা একটি প্রশ্ন হয়ে

আছে আজও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পঞ্চাশ বছর পরেও। স্বাধীন ভারত কি প্রদান করেছে কোন সম্মান 'নাকামুরায়া'র সোমা পরিবারকে বিহারী বসুর প্রতি তাঁদের সহমর্মিতার জন্য? ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শিনজুকু শহরের এই 'নাকামুরায়া'--পরাধীন ভারতের অমূল্য মুক্তির স্বপ্নে নিজেকে একাত্ম করে দিয়ে। সেই ইতিহাস কি স্মরণ করেন আজকের ভারত রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতারা? মনে হয় না। স্মরণ করলে খবর পাওয়া যেত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫৭ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জাপান সফর করেন কন্যা ইন্দিরা গান্ধী, বোন বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতসহ। গমন করেন রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চিতাভস্ম দেখার জন্য কিন্তু পা রাখেননি জাপানে সমাধীস্থ মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সমাধীতে কিংবা তাঁর শ্বশুরালয় 'নাকামুরায়া'তে। বরং নেহেরুর জাপানে আগমনের সংবাদ পেয়ে অশীতিপর বৃদ্ধা কোক্কো সোমা পৌত্রী--(রাসবিহারী ও তোশিকো বসুর কন্যা) তেৎসুকো হিগুচিকে নিয়ে নেহেরুর কাছে যান। দঘন্টাব্যাপী বিহারী বসুর জাপানে আশ্রয়প্রাপ্তির ঘটনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কঠিন লড়াই-মুখর, বেদনাহত জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। স্মৃতিস্বরূপ রাসবিহারী বসুর ব্যবহৃত পোশাক নেহেরুর হাতে তুলে দেন। জানি না সেগুলোর কি হয়েছে? এই ঘটনার পরের বছর ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখে মহীয়সী কোক্কো সোমা ইহলোক ত্যাগ করেন।

তথ্যসূত্র:

১. ইন্‌দো দোকুরিৎসু নো শিশি তো নিহোনজিন / হারা য়োশিআকি
২. হিতো আরিতে / ইকাওয়া সাতোশি.কোবায়াশি হিরোশি
৩. ইন্‌দো দোকুরিৎসু নো হিৎসুওয়া / কুসাবিরাকি সানজো
৪. নাকামুরায়া নো বৌসু / নাকাজিমা তাকেশি
৫. আজিয়া নো মে জামে-ইন্‌দো শিশি বিহারি বৌসু তো নিহোন / সোমা কোক্কো.সোমা ইয়াসুও
৬. অমর শহীদ বসন্ত / ড. মোহনকালী বিশ্বাস
৭. ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব / ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়
৮. মাসিক রেকিশি গুনজো / আগস্ট, ২০০২]
৯. সাপ্তাহিক অমৃত [১৯ শ্রাবণ, ১৩৭৯]

---

* ২০০৪ সালে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত * আলোকচিত্র: হেইবোনশা পাবলিশার; নাকামুরায়ার সৌজন্যে

নেতাজি
সুভাষচন্দ্র বসু
এবং
জাপান
নেতাজির নেতৃত্বে যথাসময়ে জাপানের সহযোগিতা
নিয়ে সশস্ত্র ইম্ফল অভিযান পরিচালিত না হলে
ভারতের অভীষ্ট স্বাধীনতা যে গান্ধী-নেহেরুর
কংগ্রেসীয় অহিংস আন্দোলনের দ্বারা অর্জিত হত না,
সে আজ মেঘমুক্ত আকাশের মতোই পরিষ্কার।
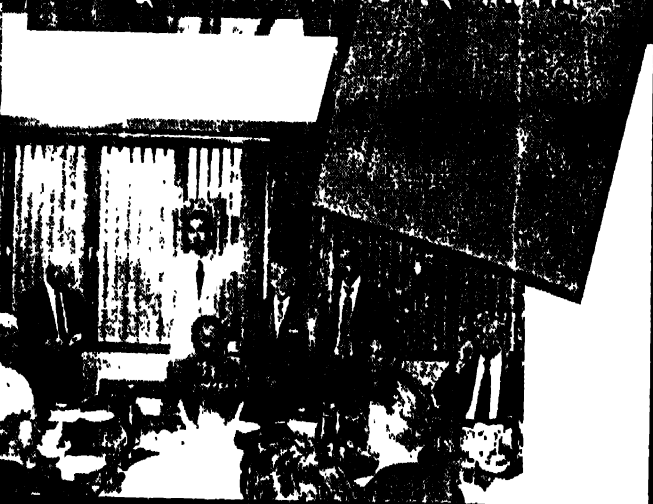
টোকিয়োর সুগিনামি-ওয়ার্ডের ওয়াদা শহরে অবস্থিত রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চিতাভস্ম সংরক্ষিত আছে গত ৬০ বছর ধরে! সংরক্ষণ করছেন তাঁর জাপানি সহযোগী এবং ভক্তরা। এই সংবাদ বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠির কাছে আজও অজানা। যদিও এই ভস্ম নিয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক রয়েছে বহু জাপানি এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে নেতাজি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। এখনো বহু ভারতীয় এই জাতীয় বীরশ্রেষ্ঠের মৃত্যু নিয়ে সন্দিহান। তাঁরা বিশ্বাস করে চলেছেন নেতাজি এখনো এশিয়ার কোন পাহাড়-জঙ্গলে কিংবা দেবালয় হিমালয়ের গুহায় গুপ্ত জীবনযাপন করছেন নতুবা সাধু-সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ভারত পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী অদ্ভুত ছেলেমানুষি কল্পনা ও বিশ্বাস! অবশ্য ভারত সরকার গত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে নেতাজির মৃত্যুরহস্য নিয়ে। আবার জাপানি কর্তৃপক্ষকে কথাও দিয়েছে চিতাভস্ম ফিরিয়ে নেয়ার। সেই আশায় থেকে একাধিকবার আশাভঙ্গের কারণে আজ নিরাশ হয়ে পড়েছেন 'সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমি-জাপানে'র কর্মকর্তা তথা নেতাজিভক্তরা।

গত ২০০২ সালে জাপান ঘুরে গেলেন ভারত সরকারের সর্বশেষ অনুসন্ধানকারী দলের নেতা প্রাক্তন বিচারপতি মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সদস্যদের নিয়ে। তখন আকাদেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান প্রধান কর্মকর্তা মাসাও হায়াশি এবং নেতাজিভক্ত সাংবাদিক তাকেজুমি বানের সঙ্গে আকাদেমির ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। তাছাড়া নেতাজি ও জাপান সম্পর্কিত কিছু জানা অজানা তথ্যাদি নিয়ে এই প্রবন্ধ।

মাসাও হায়াশির সঙ্গে কিছুক্ষণ

২০০২ সালের আগস্ট মাসের ১৭ তারিখ দুপুরে আমি যখন মাসাও হায়াশির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি তখন তিনি মাত্র বাড়িতে ফিরেছেন। যুদ্ধপূর্ব জাপানি জাতীয়তাবাদী কর্মী, এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাঁর। জাপানে আশ্রিত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, হেরেম্বলাল গুপ্ত; জাপান প্রবাসী

ভারতীয় নাগরিক দেশপাণ্ডে, এ.এম.নায়ার প্রমুখের কর্মতৎপরতায় প্রভাবিত হয়ে ১৯৪১ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যুদ্ধের পর নেতাজির চিতাভস্মের অন্যতম প্রধান সংরক্ষক ও সংগঠক।

বর্তমানে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ এবং স্মরণশক্তির দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হায়াশি মহাশয় বাস করছেন টোকিয়োর অদূরে কাওয়াসাকি শহরে। জাপানে প্রতিষ্ঠিত 'সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমি'র কর্মসচিব (সেক্রেটারি)। টেলিফোনে কথা বলার সময় একরাশ ক্ষোভ ও উষ্মা ঝরে পড়ল তাঁর কম্পিত কণ্ঠ থেকে। খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন তা বুঝতে বাকী রইল না। যখন জানতে চাইলাম কিছু হয়েছে কিনা? বললেন, "আবার গত কালকে নেতাজির চিতাভস্ম পরীক্ষা করার জন্য একটি দল এসেছেন। দলনেতার সঙ্গে সকাল ১০টা পর্যন্ত কথাবার্তা হল রেনকোজি মন্দিরে। তারপর তাঁরা চলে গেলেন ভারতীয় দূতাবাসের দিকে। আমি বাসায় ফিরে এলাম।"

দলনেতার নাম কি জানতে চাইলাম। বললেন, "নামটা তো মনে করতে পারছি না। তবে কে যেন বলল ভদ্রলোক অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি। সঙ্গে আরও তিন কি চারজন আছেন।"

বাঙালি কিনা জানতে চাইলে বললেন, "বাঙালি বলে মনে হল না। এখন ইংরেজি বুঝি না বলতেও পারি না। সব ভুলে যাচ্ছি আজকাল। শরীর তো ভালো নেই।"

আর কথা না বাড়িয়ে দুএকটি কথা জানতে চেয়ে অনুমতি নিলাম।

বর্তমানে আকাদেমিতে কতজন সদস্য আছেন?

--প্রায় ৬০ জন। তবে অধিকাংশই বয়স্ক এবং শারীরিক কারণে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারছেন না।

এখন সভাপতি হিসেবে কে আছেন?

--না, সভাপতি কয়েক বছর আগে স্বর্গবাসী হয়েছেন। প্রাক্তন লে.কর্ণেল মি. কাতাকুরা। তিনি ছিলেন তৃতীয় সভাপতি। এখন একমাত্র আমি কর্মসচিব হিসেবে সংগঠনটি চালিয়ে যাচ্ছি। আর বছর বছর নেতাজি স্মরণে সভানুষ্ঠানের আয়োজন করছি--যতখানি পারছি। এখানে জাপান বা ভারত সরকার কেউ সহযোগিতা করছে না।

তো, আপনার তো বয়স হয়েছে অনেক। আর কতদিন এভাবে সম্ভব হবে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া?

--না, আর তো সম্ভব হচ্ছে না। কেউ দায়িত্ব নেবে এমন দায়িত্বশীল কাউকে পাচ্ছি না। জাপানিদের এখন এসব বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই। পঞ্চাশোর্ধ্ব যাঁদের বয়স তাঁরা তো জানেনই না যুদ্ধপূর্ব কোন ইতিহাস! পড়ানো হয়নি তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে!

এবারও যদি নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে না নেওয়া হয় তা হলে কি করবেন?

--মাত্র তো তাঁরা পরীক্ষা করতে এলেন। পরীক্ষা করবেন তারপর ভারতে ফিরে যাবেন। সেখানে রিপোর্ট দেবেন। সে অনেক দেরি ফলাফল পেতে। অন্যান্য বারের মতো এবারও প্রাণান্তকর আবেদন জানিয়েছি নেতাজির চিতাভস্ম নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাহিত করতে তাঁর জন্মভূমিতে। যদি এবারও আমার আবেদন গৃহীত না হয় চিরতরে আশা বাদ দিতে হবে। আমি জানি না আমার পরে কে বা কারা অকাদেমি চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং নেতাজির চিতাভস্মকে কারা দেখাশুনো করবেন?

নেতাজি তো এখন স্বর্গবাসী এবং নির্দিষ্ট কোন পরিবারের সন্তান তিনি আর নন। তিনি এখন জাতীয় নেতা এবং স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে সরকার ফিরিয়ে নেয়ার জন্য চেষ্টা করছে সেই ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তাঁর আত্মীয়স্বজন, গবেষক, জাতীয় পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী জাপানে এসে নেতাজির খোঁজখবর নিয়েছেন, রেনকোজি মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একাধিকবার প্রতীজ্ঞা করেছেন তাঁর চিতাভস্ম ভারতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কেউই কথা রাখছেন না। এর প্রকৃত কারণ কি?

--দেখুন, সরকার এ বিষয়ে আন্তরিক বলে আমার বিশ্বাস এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। মূলত গলদ বাঁধিয়েছেন নেতাজি পরিবারের লোকজন। তাঁর বড়দা, বড়দার ছেলে এবং নাতিরা। তাঁরা এখনো বিশ্বাস করছেন নেতাজি জীবিত আছেন। তিনি তাইহোকুর মাৎসুইয়ামা বিমান-বন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। অনেক ভারতীয়দেরও তাই বিশ্বাস।

তাঁরা মনে করেন নেতাজি এখনো কোথাও কোন পাহাড়ে বা অন্য কোন দেশে বেঁচে আছেন। পত্রপত্রিকাগুলোও তো এই বিশ্বাসকে বছরের পর বছর জীইয়ে রাখছে। কত গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল কিন্তু নেতাজির সন্ধান কেউ পেলেন না। আর নেতাজি বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স এখন কত? নেতাজির ভারতবর্ষ কি স্বাধীন হয়নি? তা হলে আর পলাতক থাকার কী কারণ থাকতে পারে? তা হলে আমরা যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলাম এবং যাঁরা তাঁর সহযোগী; যাঁরা ঐ দুর্ঘটনার সময় একই বিমানে ছিলেন, আহত হয়েছিলেন, একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তাঁরা কি মিথ্যুক? তাঁদের উপস্থিতি এবং সাক্ষ্য কি মনগড়া? যাঁরা যুক্তি মানেন তাঁরা বিশ্বাস করেন যে নেতাজি সত্যিই বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্ম টোকিয়োতে নিয়ে এসে রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেই ১৯৪৫ সালে। বিদেশীরাও তো বিশ্বাস করছেন নেতাজির মৃত্যুকে। এমনকি তাঁর মেয়ে অনিতা পর্যন্ত। অনিতা নিজেও একবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দর গুজরাল এবং বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে সমাহিত করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাতে গা করেননি মোটেই। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেছেন, যদি ভারত সরকার কার্যত নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে নিতে অস্বীকার করে তা হলে তিনি তা নিয়ে গিয়ে জার্মানে সমাহিত করে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবেন।

এ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর তাঁকে আর বিরক্ত করতে চাইনি। বস্তুত এইসব কথা নতুন কিছু নয়। অনেক গ্রন্থ, নিবন্ধ-প্রবন্ধে এসব কথা লেখা হয়েছে। জাপানিরা বারবার নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন, এখনো চাচ্ছেন। কিন্তু বাঙালি ও সরকারের গড়িমশির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু কেন এই অনাগ্রহ নেতাজির চিতাভস্ম তাঁব স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে? এই প্রশ্নের একটি সমাধান খুঁজতে স্বনামধন্য বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রগবেষক এবং নেতাজিভক্ত অধ্যাপক ড. কাজুও আজুমার মুখোমুখি হই ২৯ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখ সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে। তিনি বললেন, “যুদ্ধোত্তর জাপানি প্রধানমন্ত্রী কিশি নোবুসুকে

(১৯৫৭-১৯৫৮, ১৯৫৮-১৯৬০) আমাকে অনুরোধ করেছিলেন নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করার জন্য। আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কেননা নেতাজির চিতাভস্ম সম্পর্কে আমি নিজেই সন্দিহান। যদিও নেতাজির ভাইঝিসহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিদেরকে আমি রেনকোজি মন্দিরে নিয়ে গিয়েছি। তাঁদের কেউ কেউ নেতাজি তাইওয়ানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করেছেন, অন্যরা করেননি। যাঁরা বিশ্বাস করছেন তাঁরাও উদ্যোগী নন তাঁর চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে নিতে। নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে না নেয়ার পেছনে মূল যে কারণটি বিদ্যমান, আমার ধারণায় তা হচ্ছে দুই জাতির ধর্মীয় চিন্তার ব্যবধান। জাপানিরা বিশ্বাস করেন মৃতব্যক্তির চিতাভস্মের মাঝে তাঁর আত্মা বিরাজ করে। যা ভারতীয়দের মধ্যে নেই। মৃতের চিতাভস্ম নিয়ে সমাধিস্থ করার রীতি ভারতীয়দের ধর্মে নেই কিন্তু জাপানি বৌদ্ধধর্মে রয়েছে। সুতরাং ভারতীয়রা এই চিতাভস্ম কোন্ রীতিতে ভারতে নিয়ে সমাধিস্থ করবেন? অন্যদিকে জাপানিদের কাছে নেতাজির চিতাভস্ম তথা নেতাজিকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে যুক্তি হচ্ছে: তাঁর স্বদেশ এখন স্বাধীন। আর কতদিন তিনি এভাবে প্রবাস জীবন-যাপন করবেন? এই বিষয়ে যতদিন পর্যন্ত উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হবে নেতাজি জাপান প্রবাসী হয়েই থাকবেন।"

রেনকোজি মন্দিরে নেতাজি

১৯৯৫ সালে সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'Netaji's Ideal and Movement with Japanese' স্মারক গ্রন্থে গ্রন্থিত নেতাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, যুদ্ধের পরে নেতাজির চিতাভস্ম জাপানে সংরক্ষণের বিষয়ে বেশ লড়াই করতে হয়েছে তাঁর জাপানি সহযোদ্ধা, সহকর্মী এবং ভক্তদেরকে। বিশেষ করে বিজয়ী মিত্রশক্তি আমেরিকার সৈন্যরা দ্রুত টোকিয়োসহ সারা জাপানে ছড়িয়ে পড়ছিল। ধরপাকড় করছিল রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সামরিক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের। আণবিক বোমার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হিরোশিমা, নাগাসাকির আর্তনাদ-

হাহাকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। বোমায় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত রাজধানী টোকিয়ো। অভাব, অনটন, ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্বের কারণে চরমভাবে বিপর্যস্ত জাপান। সেই পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন সেনাদের ভয়ে কোন মন্দিরের কর্তৃপক্ষ রাজি হননি নেতাজির চিতাভস্ম গ্রহণ করতে। একমাত্র অকুতোভয় এবং নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাশীল টোকিয়োস্থ রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ইয়াসুশি মোচিজুকি এগিয়ে এসে বলেছিলেন, "ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী মহাপুরুষের চিতাভস্ম সুরক্ষা করব সর্বজনীন মানবতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। যদি কোন সময় পরিস্থিতি পরিবর্তিত ও অনুকূল হয় তবে আমি এই পবিত্র ভস্ম ভারতে পৌঁছে দিতে ইচ্ছুক।"

পুরোহিত মোচিজুচিকে আর্মি ট্রাইবুনাল তদন্ত কমিশন কয়েকবার নেতাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হননি। গ্রেপ্তারের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে তিনি মন্দিরে নেতাজির চিতাভস্ম সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মন্দিরের পুরোহিত হন তাঁরই পুত্র কেয়োয়েই মোচিজুকি। তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নেতাজির চিতাভস্মের তত্ত্বাবধান করছেন। নিয়মিত পূজা-অর্চনা করে আসছেন। প্রতি বছর আগস্ট মাসের ১৮ তারিখ নেতাজির মৃত্যু দিবসের দিন সাধারণের জন্য মন্দিরের মূল উপাসনালয় উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। সেখানে ডানপাশে অতি যত্নের সঙ্গে জাপানি ঐতিহ্যানুসারে একটি পাত্রের মধ্যে চিতাভস্ম রক্ষিত আছে। নেতাজির প্রবীণ ভক্তবৃন্দসহ জাপান প্রবাসী ভারতীয় নাগরিক এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা সমবেত হন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। অধিকাংশই বয়সে প্রবীণ--বয়স যাঁদের ৬৫ থেকে ৯০ অতিক্রান্ত। অপেক্ষাকৃত তরুণ জাপানিদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে।

বছর দশেক আগেও ভারতীয়রা বেশ আসতেন। বিশেষ করে পাঞ্জাবী শিখরা। বাঙালি খুবই কম এসেছেন, এখনো যাঁরা আসেন হাতে গোনা। উল্লেখ্য যে, গত ৩০ বছর ধরে টোকিয়োতে বাংলাদেশের দূতাবাস রয়েছে। জানা থাকা সত্বেও কোন বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত বা কর্মকর্তা নেতাজির স্মরণসভায় কৌতুহলবশত কোনদিন উপস্থিত হয়েছেন

বলে জানা যায় না। অথচ তাঁদের কেউ কেউ টোকিয়োতে থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানে নেতাজির নামে কম বকবক করেননি। এমনকি বাংলাদেশের কোন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক নেতা যাঁরা জাপানে এসেছেন নেতাজির চিতাভস্মকে শ্রদ্ধা জানাতে রেনকোজিতে গিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই। অনেকেই সন্দিহান নেতাজির চিতাভস্ম নিয়ে কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গনে রয়েছে নেতাজির আবক্ষ মূর্তি সেটাও দেখার জন্য প্রবাসী বাঙালি কিংবা ভারতীয়রা আগ্রহী নন। বাংলাদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা জাপান ভ্রমণে এসেছেন তাঁদের মধ্যে দুজন কবি নির্মলেন্দু গুণ, সমুদ্র গুপ্ত এবং লেখক.সাংবাদিক চিত্তফ্রান্সিস রিবেরু রেনকোজিতে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন ২০০৪-৬ সালে।

প্রতি বছরই উপস্থিতিদের সংখ্যা কমে আসছে বলে জানা গেল। এই বছরই (২০০২) নাকি প্রত্যাশারও অধিক লোক এসেছেন বলে নেতাজিভক্ত পঞ্চাশোর্ধ জাপান কিয়োদো নিউজ সংস্থার অন্যতম সম্পাদক তাকেজুমি বান জানালেন। মি. তাকেজুমি কয়েক বছর আগে নেতাজির ৫০ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমির সহযোগিতায় তথ্য সংগ্রহ করে জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় ইন্টারনেটে একটি ওয়েভসাইট চালু করেছেন (http://www.yorozubp. com/ netaji/)। আগস্ট মাসের ১৮ তারিখ রবিবার টোকিয়োস্থ সুগিনামি-ওয়ার্ডের হিগাশি কোয়েনজি স্টেশন সংলগ্ন রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে নেতাজির ৫৭তম মৃত্যু দিবস উপলক্ষে এক পূজা ও স্মরণসভার আয়োজন করেছিল আকাদেমি। তাতে মি. তাকেজুমির সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয় নেতাজি সম্পর্কে। দুপুর একটা থেকে অনুষ্ঠিত পূজানুষ্ঠানে প্রায় ষাট থেকে সত্তর জন জাপানি এবং বিদেশী নেতাজিভক্তের সমাবেশ ঘটে। অনূর্ধ্ব চার কি পাঁচ জন ছাড়া সকলেই ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ ও প্রবীণ। অনেকেই মন্দিরের সিঁড়ি সংলগ্ন স্থানে স্থাপিত নেতাজির আবক্ষমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন। এই মূর্তিটি নেতাজির ৪৫তম মৃত্যু বার্ষিকীর সময় আকাদেমি স্থাপন করেছে।

মন্দিরের দ্বিতলে মূল উপাসনালয়ের ফটক খুলে দিলে পরে আগত

অতিথিরা আসন গ্রহণ করেন। সামনে উপবিষ্ট হন প্রধান পুরোহিত। আধঘন্টা ধরে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করার পর আহবান করলেন সকলকে সারিবদ্ধভাবে শ্রদ্ধা জানাতে। উপস্থিত সকলে বাম দিক থেকে একের পরে একজন প্রথমে অধিষ্ঠিত দেবতা বুদ্ধের চরণে ধূপের গুঁড়ো কপালে ছুঁইয়ে জ্বলন্ত পাত্রে রেখে ডান পাশে রক্ষিত নেতাজির চিতাভস্মকে প্রণাম জানিয়ে পুনরায় আসন গ্রহণ করেন। আগত অতিথিদের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পরিবর্তে কাউন্সেলার শ্রীরমেশ চন্দর উপস্থিত ছিলেন। পূজা শেষে একতলার সভাকক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে আগত নেতাজি-ভক্তদের এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিন কি চার জন তাঁর স্মৃতিচারণ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইম্পেরিয়াল সেনাবাহিনীর তৎকালীন ক্যাপ্টেন বয়োবৃদ্ধ মি.ফুজি। তিনি আবেগ থরথর কণ্ঠে আজাদ হিন্দ ফৌজের (INA =Indian National Army) 'কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশি কা গীত গাইয়ে যা' দলীয় সঙ্গীতটি গেয়ে শোনান। ৫০ বছরেরও বেশি আগে শেখা গানটি এখনো তিনি নির্ভুলভাবে গাইতে পারেন!

১৯৪১ সালের দিকে যিনি ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, নেতাজির সংস্পর্শে এসেছিলেন সেই মাসাও হায়াশি অশ্রু বর্ষণ করে অনেক স্মৃতিময় কথা বললেন। নেতাজিকে এত কাছে থেকে দেখেছেন এখনো তাঁর কাছে মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা। নেতাজির ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, দেশপ্রেম এবং মেধার সঙ্গে তুলনা করার মতন কোন জাপানি সামরিক অফিসার তখন ছিলেন না বলে তিনি জানালেন। "এ রকম প্রতীজ্ঞাবদ্ধ দেশমাতৃকাসেবী মুক্তিযোদ্ধা আর এশিয়ায় জন্ম নেবে কিনা জানি না। আমার সৌভাগ্য যে এমন একজন অকুতোভয় বীর পুরুষের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। আমি এখনো চাই নেতাজির চিতাভস্ম তাঁর স্বাধীন স্বদেশ ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হোক। আর কতকাল তিনি এভাবে প্রবাসে থেকে কষ্ট পাবেন? তাঁর আত্মা এই জাপানেই আছে। তাঁকে এবার সসম্মানে স্বদেশে ফিরিয়ে নিন"--বলে উপস্থিত সুধীবৃন্দের কাছে আবেদন রাখেন।

ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধি রমেশ চন্দর মি. হায়াশির বক্তব্যের

পর উঠে দাঁড়িয়ে নেতাজির ভক্ত ও আকাদেমির কর্মকর্তাদেরকে এই স্মরণসভা আয়োজন করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আবেগের তাড়নায় তিনিও অশ্রুসিক্ত হয়েছেন। তারপর স্মরণসভা চলাকালীন অবস্থায় বিদায় নিলেন। এই সভায় প্রতিবারের মতন এবারও এসেছিলেন তৎকালীন সময়কার সুপরিচিত জনসেবিকা শ্রীমতি কিকুকো এমোরির বয়স্কা কন্যা। আলাপকালে জানালেন, "মায়ের দরদ ছিল মায়ের চেয়ে মাসির দরদ যেমন তেমন। নিজের ছেলেমেয়েদের মুখের খাবারটুকু পর্যন্ত বিদেশী ছাত্রদের মুখে তুলে দিতেন।" উল্লেখ্য যে, মিসেস এমোরি তৎকালীন এশিয়ার দেশগুলো থেকে জাপানের মিলিটারি ক্যাডেট কলেজগুলোতে অধ্যয়নরত প্রায় ৩০০ ছাত্রের সেবাশুশ্রূষার দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু ভারতীয় ছাত্রও ছিলেন যাঁরা নেতাজির স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে এমোরি ছিলেন প্রিয় মাসি। তিনি জাপানে নেতাজির অবস্থানকালে তাঁরও সেবা করেছেন। ভারত স্বাধীন হলে পরে প্রাক্তন এক ছাত্রের আমন্ত্রণে তিনি সে দেশ ভ্রমণ করেছিলেন।

তাকেজুমি বানের সঙ্গে কথপোকথন

সভার এক পর্যায়ে পাশে উপবিষ্ট নেতাজিভক্ত এবং সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমির শুভাকাঙ্খী তাকেজুমি বানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেশ তো লোকজন এসেছে। মি. হায়াশি এবার তরুণ কাউকে আকাদেমির দায়িত্ব দিলেই পারেন।

উত্তরে মি. তাকেজুমি বললেন, "আমি গত ১০ বছর ধরে তাঁর সান্নিধ্যে আছি। অনেকভাবে অনুরোধ করেছি আকাদেমির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার জন্য। আমারও ইচ্ছে আছে কাজ করার। ভারত খুব সহজে নেতাজির চিতাভস্ম নিয়ে যাবে এটা আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেকেই তো এলেন টোকিয়োতে গত ৫০ বছর ধরে। প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তারপর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী; নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির বসু, অমিয়নাথ বসু আরও কত বিখ্যাত ব্যক্তি। জাতীয় নেতারা বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের কথা রাখেননি। নেতাজি সত্যিই মারা গিয়েছেন কিনা, এটা তাঁরই

চিতাভস্ম কিনা বা কেন তাঁর এই রহস্যজনক অন্তর্ধান ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য প্রথম সরকারি তদন্তকারী দলটি আসে ১৯৫৬ সালে। সেটি ছিল নেতাজির সহযোগী INA-র সাবেক জেনারেল শাহনেওয়াজ কমিশন। মি. শাহনেওয়াজ অনুসন্ধান করে ভারতে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন যে, নেতাজি তাইহোকুর অদূরে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এই দলের তিন সদস্যের মধ্যে নেতাজির বড়ভাই সুরেশচন্দ্র বসুও ছিলেন। তিনিই বেঁকে বসলেন এবং স্বীকার করতে চাইলেন না যে, এটা নেতাজির চিতাভস্ম! সেই থেকেই বর্তমান সমস্যার সূত্রপাত। যা আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় ৪০ বছর ধরে চলছে!"

আমি বললাম, হ্যাঁ সেই কথাই মাসাও হায়াশির এক লেখায় আমি পড়েছি। মি. হায়াশি লিখেছেন, রেনকোজি মন্দিরে নেতাজির চিতাভস্মের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন সুরেশ বসু। শোকে এত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। টোকিয়ো থেকে ফেরার সময় হানেদা বিমানবন্দরে যখন মি. হায়াশি তাঁদেরকে বিদায় জানাতে এক সঙ্গে গেলেন, তখন হঠাৎ করে সুরেশ বসু বলে বসলেন যে, নেতাজি মরেননি! এই কথা শুনে শাহনেওয়াজ ও তাঁর সঙ্গী-সদস্য মি. মালিক তাঁকে আশ্বস্ত করার উদ্যোগ নিলেন কিন্তু কোন কাজ হল না দেখে ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি একাধিকবার বললেন যে, নেতাজি মরেননি! এতে বিস্মিত হয়েছিলেন মি. হায়াশি এবং অন্যান্যরা। এর আগে ১৯৫৫ সালে নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ বসু জাপানে এসেছিলেন। তিনি অনুরোধ করলেন যে কলকাতায় নেতাজির একটি স্মৃতিশালা গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছে। জাপানেও নেতাজি সম্পর্কিত একটি আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করা হোক। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি একাধিকবার চিঠিও লিখেন জাপানে। তাঁর অনুরোধেই ১৯৫৮ সালে 'সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমি' প্রতিষ্ঠিত হয় রেনকোজি মন্দিরের প্রধান পুরোহিতসহ নেতাজির সহযোগী জাপানি প্রাক্তন সেনা অফিসার এবং ভক্তদের যৌথ প্রচেষ্টায়। শাহনেওয়াজ খানের রিপোর্ট যখন ভারত সরকার গ্রহণ করলেন না তখন আকাদেমি থেকে আবেদন জানানো হল। তারপর সরকার খোশলা কমিশন পাঠালেন। খোশলার সঙ্গে নেতাজি

প্রতিষ্ঠিত ফরোওয়ার্ড ব্লকের অনলপ্রসাদ চক্রবর্তী ও সুনীল গুপ্ত ছিলেন। মি. খোশলাও পূর্ববর্তী শাহনেওয়াজ খানের রিপোর্টই বজায়ই রাখলেন। ফলে সেটাও গ্রহণযোগ্য হল না কোন এক রহস্যময় কারণে। মি. হায়াশি একাধিকবার ভারত গেলেন সরাসরি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রেসিডেন্ট আশ্বাস দিলেন, প্রতীজ্ঞা করলেন এবার নেতাজিকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু প্রতীজ্ঞা রক্ষা করলেন না। ক্ষমতার বদল ঘটে। নতুন নেতৃত্ব আসে কাজের কাজ কিছুই হয় না। শেষবার ১৯৮৪ সালে গিয়েছিলেন মি. হায়াশি। সে সফরও বিফল হয়েছে।

এরপরও অনুসন্ধানী দল এসেছেন। নেতাজির আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির বসুও সস্ত্রীক এসেছিলেন। রেনকোজিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পরিবারের সকলেরই বিশ্বাস নেতাজি মরেননি। তিনি কোথাও বেঁচে আছেন। তা হলে আর মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানো কেন?

মি.তাকেজুমিকে আবার বললাম, আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে রেনকোজির সঙ্গে জড়িত। আপনার কি ধারণা নেতাজি সত্যিই তাইওয়ানে মারা গেছেন?

--নেতাজির মৃত্যু সংবাদ কিন্তু ১৯৪২ সালে একবার জাপান ঘোষণা করেছিল। সেটি ছিল ভিত্তিহীন। কিন্তু এবার আমার বিশ্বাস তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট মি. হায়াশি, নেগেশি তাদামোতো; প্রত্যক্ষ সাক্ষী কর্ণেল হাবিবুর রহমান, ডাক্তার য়োশিমি প্রমুখদের কথা কি মিথ্যে হবে?

নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য

এই বিষয়ে এর বেশি কিছু মি. তাকেজুমির সঙ্গে আমার কথা হয়নি। তাঁর যুক্তিও ফেলে দেবার মতন নয়। যদি নেতাজি সত্যিই মারা না যাবেন তা হলে রেনকোজির ঐ চিতাভস্ম কার? কেনই বা তাঁরা প্রায় ৬০ বছর ধরে এর তত্ত্বাবধান করছেন? নিশ্চয়ই এখানে কোন গুপ্ত রহস্য আছে। নেতাজি মারা যাননি বা মারা যাবার ভান করেছেন বলে ধরে নিই তা হলে যাঁরা বলছেন যে রাশিয়াতে তাঁকে ১৯৪৬ সালে দেখা গেছে, যেমন ফরোওয়ার্ড ব্লক পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত চিত্ত বসু,

গবেষিকা ডক্টর পূরবী রায় প্রমুখ, তাঁদের কথাই সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের ভাষ্য নেতাজি সাইবেরিয়া হয়ে মস্কো পৌঁছে ছিলেন রাশিয়ার সাহায্যে শেষবারের মতন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। সেখানে ১৯৪৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত KGB কর্মকর্তা, কতিপয় ভারত বিশেষজ্ঞ লোকজন তাঁকে দেখেছেন বলে জানাচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে যাবার পর সেখানকার পত্রপত্রিকায় নেতাজি সম্পর্কিত অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়। যেগুলো ছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময় নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৪৬ সালের পর কি রাশিয়ানরা তাঁকে মেরে ফেলল? যদি রাশিয়ানরা তাঁকে মেরেই ফেলে একটা খবরও হবে না? এতবড় একজন ব্যক্তিত্ব, সারা এশিয়া এবং য়োরোপ যিনি দাপটের সঙ্গে কাটিয়েছেন তাঁকে রাশিয়া মেরে হজম করে ফেলবে এত সহজে? ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় ১৯৪৬ সালে ঠিক যুদ্ধের পরপরই যখন ভারতের ক্ষমতায় অন্তবর্তীকালীন সরকার এবং পন্ডিত নেহেরু ভাবী প্রধানমন্ত্রী তখন জনৈক প্রভাবশালী KGB অফিসার (যার নাম শ্রীঘোষ ভুলে গেছেন) যিনি বোম্বে অবস্থান করছিলেন--নেহেরু কর্তৃক আহুত হয়েছিলেন দিল্লীতে। নেহেরু একটি চিঠি ঐ KGB এজেন্টের মাধ্যমে রাশিয়ায় স্টালীনের কাছে পাঠান। ড.পূরবী রায় নেতাজির উপর গবেষণা করতে গিয়ে ঐ এজেন্ট যে তেহেরান হয়ে মস্কো পৌঁছেছিলেন তার প্রমাণ পেয়েছেন ইরানের এক সরকারি মহাফেজখানাতে। তখন ভারতে চলছে চরম রাজনৈতিক সংকট। ব্রিটিশরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণে ভারতকে ভাগ করতে চাইছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিখ-উত্থান সমস্যা। বামপন্থী, সাম্যবাদী এবং সমাজতন্ত্রীরা বিদ্রোহ করছে হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ তখন একটি বিস্ফোরন্মুখ আগ্নেয়গিরি। এই রাজনৈতিক সংকটের সময় নেহেরু নিশ্চয়ই স্টালীনকে শুভেচ্ছা বাণী পাঠাবেন না KGB-র এজেন্ট মারফত?

এই সময় আরেক খরব পাওয়া গেল যে যুদ্ধের পর নেতাজি দক্ষিণ–

পূর্ব এশিয়ার গুপ্তবাস থেকে বেরিয়ে মানচুরিয়া হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছেছিলেন। কাজেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নেতাজির মস্কোযাত্রা আর স্টালীনের কাছে প্রেরিত নেহেরুর গোপন চিঠি পাঠানোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা? গভীর রহস্য ঘনীভূত হয়ে আছে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কেমেন্ট এটলিকে লিখিত নেহেরুর একটি চিঠিতেও। বেশ কয়েক বছর আগে টোকিয়োতে এক সভা শেষে কয়েক দশক জাপানে বসবাস করছেন এমন একজন কলকাতার বিদূষী মহিলা সুভাষচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "নেতাজি যদি ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পারতেন তা হলে নেহেরুকে মেরেই ফেলতেন!" এই রোষানল বাঙালিই শুধু নন, বহু ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে আজও টগবগ করে ফুটছে। এটা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু ও নেতাজির মধ্যে রাজনৈতিক মতানৈক্য ছিল। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত রেষারেষি থাকতেই পারে, কিন্তু তাই বলে এত বড় একজন জাতীয় নেতাকে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করবেন নেহেরু এটা ভাবাও কি ঠিক হবে? বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তো তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী.বন্ধু খন্দকার মোসতাক আহমেদই ষড়যন্ত্র করে সামরিক কর্মকর্তাদেরকে দিয়ে খুন করিয়েছে! রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লড়াই সে অন্য জিনিস। উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতের মুগল যুগ! কাজেই এই ক্ষেত্রে নিঃসংশয় হওয়াও কঠিন।

অন্যদিকে নেতাজি-কন্যা অনিতার ভাষ্যও কি উড়িয়ে দেয়ার মতো? তাঁর ধারণা এই রকম, সুভাষচন্দ্র বসু ধুরন্ধর গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখের নোংরা রাজনীতির শিকার। কেননা তাঁরা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুভাষ বসুকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁর হাতে চলে যাবে। অনিতার মন্তব্য ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে, বাঙালির মেধা ও শক্তির কাছে হেরে না যাওয়ার গোপন সংকল্প করেছিলেন ভিন্নভাষী ঐ নেতারা! নেতাজির দর্শনকে প্রাধান্য দিলে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব বন্ধ করা যেত এবং বাংলা ও ভারত ভাগাভাগি হত না। অনিতার প্রশ্ন, ইম্ফল অভিযানের ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসের উদাসীনতা কি কম দায়ী? নেহেরু কোনদিন একটি শব্দ লিখেছেন কি তাঁর কোন লেখায় নেতাজি সম্পর্কে? অনিতার

জিজ্ঞাসা। অনিতার ভাষ্যকে যদি আমরা প্রাধান্য দিই তাহলে বলতে হয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠিকই চিনেচিলেন সুভাষ কি রত্ন--তাই সমস্ত কিছু বিচার-বিবেচনা করে তাঁকে 'দেশনায়ক' বলে অভিহিত করেছিলেন। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কি সুভাষ বসুর ভিতরে ভবিষ্যতের স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সুপরিচালককে দেখতে পেয়েছিলেন? 'দেশনায়কে'র সম্বোধনে এই ইঙ্গিতই কি করতে চেয়েছিলেন যে, ভারতের চালিকাশক্তি থাকলে একমাত্র সুভাষ বসুই আছেন?

কিন্তু এ কথাও বলা যেতে পারে যে, মানসবন্দী ভবিষ্যৎ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর ব্রিটিশদের ক্রমাগত সুভাষবিরোধী প্রপাগান্ডায় কংগ্রেস ছিল বিভ্রান্ত। আর এই বিভ্রান্তিকে হয়তোবা ক্রমশ জটিল করেছেন গান্ধী এবং নেহেরু নতুবা তাঁরা নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়েছেন। গবেষণা করলে তার প্রমাণ আবিষ্কার করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। হয়তো বা ভবিষ্যতে সেই অদৃশ্য তথ্যের দর্শন মিলবে। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একটি বিশাল এবং জটিল কর্মকান্ড, এখানে গান্ধী, নেহেরু এবং নেতাজির ভূমিকা ও অবদান কোন অংশেই কম নয়। এই সংগ্রাম ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল নেতাজির উগ্র জাতীয়তাবাদী উত্থান ও সশস্ত্র তৎপরতার মধ্য দিয়ে। "আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব"--এই উদাত্ত আহবানই এর বড় প্রমাণ। তাঁর এই অকুতোভয় ভূমিকাই ভারতের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে যথাসময়ে জাপানের সহযোগিতা নিয়ে সশস্ত্র ইম্ফল অভিযান না পরিচালিত হলে ভারতের অভীষ্ট স্বাধীনতা যে গান্ধী-নেহেরুর কংগ্রেসীয় অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত হত না সে আজ মেঘমুক্ত আকাশের মতোই পরিষ্কার। এই সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক.গবেষকই একমত। এ কথা অনস্বীকার্য যে, নেতাজির অমিতবল ভাবমূর্তি ভারতশাসক ব্রিটিশের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকেই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিল।

নেতাজির অনমনীয় ভাবমূর্তি

জাপানিদের সঙ্গে সংলিপ্ত হওয়ার পর নেতাজি পরাধীন ভারতের

মুক্তিদাতা হিসেবে যে অসীম সাহসী ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন, নিজেকে দুর্মর-দুর্জয় এক শক্তিশালী ভাবমূর্তিতে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এর পেছনে কাজ করেছে জাপান প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রেরণা। মহাবিপ্লবী বিহারী বসু জাপানি জেনারেল স্টাফ্ অফিসের সকল বাধাবিপত্তি, প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সুভাষ বসুকেই শেষ দায়িত্বটুকু অর্পণ করতে চেয়ে তাঁকে জার্মান থেকে জাপানে আহবান করেছিলেন। কেননা বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই সুভাষ বসুর হাতে ইন্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স্ লীগের প্রেসিডেন্টশীপ তুলে দেন তিনি। এরপর নিস্তেজ প্রায় আজাদ হিন্দ ফৌজ (INA)কে সিঙ্গাপুরে পুনর্গঠিত করেন সুভাষ বসু। ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সুভাষ বসু যে ভাষণ দেন ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশে সেখানেই প্রথম তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন 'দিল্লী চলো', 'দিল্লী চলো' মন্ত্রবাণীতে। যে মন্ত্র জাপানি সৈন্যদের পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। কথিত আছে, এই সময় রাসবিহারী বসুই সুভাষ বসুকে 'নেতাজি' অভিধায় অভিষিক্ত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, প্রচন্ড জাতীয়তাবাদী বিহারী বসুই সিঙ্গাপুর, বার্মা ও মালয়েশিয়ায় জাপানি সৈন্যদের হাতে ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে বিপ্লবী-বাহিনী গঠন করেছিলেন এবং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন জাপানিদের ধৃত ব্রিটিশ সেনা অফিসার শিখ ধর্মাবলম্বী মোহন সিং এর ওপর।

১৯১৫ সালে লাহোরে বৃটিশ গার্ড সাহেবকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পরে মাথায় মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে রাসবিহারী বসু পালিয়ে জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। জাপানে এসে তৎকালীন একচ্ছত্র প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী নেতা. এশিয়াবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব মিৎসুরু তোয়ামার সহযোগিতায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকে অনেকেই সাম্রাজ্যবাদী জাপানের দালাল বলে সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু তিনি কখনোই বিক্রি হয়ে যাননি। তাঁর মেধা ও বুদ্ধিবলে অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন জাপানিকে প্রভাবিত করেছেন। তিনি বরং জাপানি সামরিক কর্তৃপক্ষকে সবসময় সন্দেহের চোখেই

দেখতেন। সংশয় প্রকাশ করে সহযোগী হেরেম্বকে বলতেন, "ভারত স্বাধীন হলে জাপানিরা ভারতীয়দের বুকে চেপে বসতে পারে। সাবধানে কাজ করতে হবে।" প্রকৃতপক্ষে, এখনো রাসবিহারীর ওপর যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। প্রবাসে থেকে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদী জাপানিদেরকে ভারতীয়দের কাছে বন্ধুত্বপূর্ণ করে তোলার পেছনে সুদীর্ঘ সময় তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনেক দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ, তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়েছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর। সে খবর আমরা ক'জনই বা জানি? জাপানসহ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়দের সংগঠিত করেছেন তিনি বহু কাঠখড় পুড়িয়ে, ঘাম ঝরিয়ে। দীর্ঘদিন টোকিয়োসহ বিভিন্ন স্থানে পলাতক জীবনযাপন করার ফলে সূর্যের আলো দেখতে পারেননি তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা। প্রবাসে তাঁর ভাসমান বিপ্লবী জীবনের সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জড়িয়েছিলেন, তরুণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন স্ত্রী তোশিকো বসু। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনিশ্চয়তা, পলাতক জীবনের মানসিক যন্ত্রণায় তোশিকো যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। এবং মাত্র ২৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন! তারপরও ভেঙ্গে পড়েননি বিহারী বসু! সর্বশক্তি নিয়োগ করেন সুভাষ বসুকে জাপানে আমন্ত্রিত করে আনার জন্য। এবং সফলও হন। সমগ্র এশিয়াকে শ্বেতাঙ্গদের করতল থেকে মুক্ত করতে একজন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, সেনাপতিসুলভ নেতৃত্ব হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুকে নির্বাচন ও তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজের পৌত্রী বিশিষ্ট পরিবেশবাদী নেত্রী এবং লেখিকা ইউকো তোজোর সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি আমাকে জানান, "বিহারী বসু জাপানিদের সম্পর্কে অগাধ অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও সুভাষ বসুর তা ছিল না। কিন্তু জাপানি নেতৃবৃন্দকে নেতাজি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। জাপানিরা তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বিভিন্নভাবে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে নেতাজির নির্দেশকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজো পরিস্কারভাবে প্রতীজ্ঞা করেছিলেন নেতাজির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে যে, জাপানের স্বার্থ একটাই

এশিয়া থেকে য়োরোপীয়দের উৎখাত করা। এশিয়া যদি উদ্ধার করা যায় তা হলে এশিয়ার দেশগুলোকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। গ্রেট কো-প্রসপেরেটি স্পীয়ার, গ্রেট ইষ্ট এশিয়া কংগ্রেস প্রভৃতি সম্মেলনে যোগদানকারী এশিয়ার তৎকালীন নেতাদেরকেও নেতাজি সেইভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন। জাপানিদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে পেরেছিলেন। তিনি কখনোই জাপানিদের পুতুলে পরিণত হননি। যদিও ব্রিটিশরা কম প্রপাগান্ডা করেনি নেতাজি ও জাপানকে নিয়ে।"

জাপান পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও নেতাজিকে টোকিয়োতে আহবান করেছিল। ইম্ফল অভিযান ব্যর্থ হওয়া এবং জাপানিদের আত্মসমর্পনের পরও নেতাজি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন মুছে ফেলেননি, তিনি জাপানকে অনুরোধ করেছিলেন রাশিয়াকে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে নাড়িয়ে দেখতে। প্রথমে জাপান এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি পরে রাজি হয় এবং জেনারেল তেরাউচি ৭২-২ SALLY নামক একটি বোমারু বিমান পাঠান নেতাজিকে টোকিয়ো নিয়ে আসতে। এই বিমানটিতে করেই নেতাজি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট খুব সকালে কর্ণেল হাবিবুর রহমানসহ ভিয়েতনামের সাইগন থেকে তাইওয়ানে এসে পৌঁছান বলে বিভিন্ন তথ্যে প্রকাশ। অবশ্য ঐ বিমানে আসতে পারেননি বলেও নানা কথা শোনা যায়। জাপানের আত্মসমর্পণের পর সকল সৈন্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দ্রুত স্বদেশ ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তেরাউচির পাঠানো বিমানে অন্যান্য সামরিক অফিসাররা চড়ে টোকিয়ো চলে আসেন। ফলে অন্য একটি মালামালবোঝাই ক্ষুদ্র বোমারু বিমানে করে নেতাজি অন্যান্য সঙ্গীদের রেখে একমাত্র কর্ণেল হাবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে টোকিয়োর দিকে যাত্রা করেন। একই দিনে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে তাইওয়ানের মাৎসুইয়ামা বিমানবন্দর থেকে বিমানটি মানচুরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বিমানটি রানওয়ে থেকে আকাশের দিকে উঠতেই প্রকান্ড শব্দে তার ডানদিকের ইঞ্জিনটি ছিটকে বেরিয়ে যায় এবং প্রথমে ডান দিকে কাৎ হয়ে পড়ে তারপর সামনের দিকে খাঁড়াভাবে আছড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিমানে আগুন ধরে যায়। পেট্রোল ট্যাংক ফেটে গিয়ে পেট্রোল পড়ে নেতাজির শরীরে। তবু নেতাজি পেছনের দরজার দিকে দৌড়ে যান বের হয়ে যেতে

কিন্তু দরজার কাছে অনেক মালামাল থাকায় সেদিকেও আগুন লেগেছে দেখে সামনের দরজার দিকে যেতে চাইলে তাঁর গায়ে আগুন লেগে যায়। তথাপি আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে পড়েন তিনি এবং অজ্ঞান হয়ে যান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেতাজিসহ অন্যান্যদেরকে তাইওয়ানের স্থলবাহিনী হাসপাতালের দক্ষিণ পথ দিয়ে জরুরী বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। নেতাজির সমস্ত শরীর জ্বলে ঝলসে গিয়ে ফোস্কা পড়ে যায় এবং ফুলে ওঠে। অগ্নিদগ্ধের পরিমাণ ছিল ৩ ডিগ্রী। মাথায় আঘাত লাগা ক্ষত থেকে রক্ত বের হতে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম দগ্ধ হওয়া তাঁর সঙ্গী হাবিবুর রহমানের জ্ঞান থাকায় তিনি নেতাজির শরীরের আগুন নেভাতে এবং পোশাক খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

কর্ণেল হাবিব শরীরের অনেকাংশ দগ্ধাবস্থায় একই হাসপাতালে নেতাজির পাশের শয্যায় ছিলেন। সন্ধ্যের পর একবার নেতাজির জ্ঞান ফিরে। তখন তিনি মৃদু গলায় 'হাসান' 'হাসান' বলে আর্তস্বর করেন। হাবিব তাঁকে বলেন, "আমি হাবিব। হাসান এখানে নেই।" এই হাসান হলেন নেতাজির সহযোগী আবিদ হাসান। নেতাজি হাবিবকে নির্দেশ করেন, "ইন্ডিয়া যাও। সেখানে গিয়ে জনসাধারণকে বোঝাও এবং দেশের মুক্তির জন্য লড়াই অব্যাহত রাখো। আমার শেষ অভিপ্রায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। আমি সে আশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি--ভারত মুক্ত হবে। জয় হিন্দ্!" আবার জ্ঞান হারান নেতাজি। তারপর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসার কোন ত্রুটি করা হয়নি। রাত ১১টার পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

নেতাজির মৃত্যুর সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জাপানি সেনা-বাহিনীর ক্যাপ্টেন ডাক্তার তানেয়োশি য়োশিমি, ডাক্তার সুরুতা ইশি, কর্ণেল হাবিবুর রহমান, অনুবাদক মি. নাকামুরা, দুজন নার্স, দুজন সামরিক অফিসার। চিকিৎসায় যে সকল ওষুধ ব্যবহৃত হয় সেসব ছিল স্যালাইন, রিনগেল ৫০০ সিসি ইঞ্জেকশন এবং ব্যথানাশক ওষুধ। তাঁর শরীর থেকে ২০০ সিসি রক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ৪০০ সিসি রক্ত দেয়া হয়। তারপরেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ১৯৮৮ সালে ডাক্তার য়োশিমি মৃত্যু বিষয়ক ছাড়পত্র প্রকাশ করেন।

এখনো বয়সে প্রবীণ এই চিকিৎসক বেঁচে আছেন বলে জানা যায় তাঁর জন্মস্থান মিয়াজাকি-জেলায়। জাপানের আত্মসমর্পণের পরপরই হংকঙে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স দপ্তর তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, সেখানে তিনি নেতাজির মৃত্যুর কথাই বলেন। তৎকালীন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, INA-র সেনাপতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মুখাবয়বের সঙ্গে ডাক্তার য়োশিমির পরিচয় না থাকার কথা নয়।

নেতাজির মরদেহ প্রথমে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়। কিন্তু সেখানে ব্রিটিশ মিত্রবাহিনী এসে পড়বে ভেবে টোকিয়ো নিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সহযোগীরা। কিন্তু প্রচন্ড গরমের মধ্যে নেতাজির অর্ধদগ্ধ মরদেহ টোকিয়ো পর্যন্ত বহন করা কষ্টসাধ্য মনে করে তাইওয়ানেই ২০শে আগস্ট কর্ণেল হাবিবুর রহমান, মি. নাগাতোমো এবং অনুবাদক মি. নাকামুরার উপস্থিতিতে দাহ করা হয়। জাপানে বহন করে আনা হয় নেতাজি সুভাষ বসুর চিতাভস্ম ও তাঁর ধনসম্পদ।

নেতাজির মূল্যবান ধনরত্ন

বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজি সাইগন থেকে বহন করে আনা বিপুল পরিমাণ দামী পাথর, স্বর্ণালঙ্কার এবং হীরা জমিনের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। বিমানবন্দরের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে এক মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিশেষ পোশাক পরিয়ে চারদিন লাগিয়ে এই রত্নরাজি সংগ্রহ করা হয়। ছাত্রীরা প্রথম দুদিনে প্রচন্ড গরমের মধ্যে বিরামহীন কষ্ট সহ্য করে ৬/৭ হাজার ক্যারাট পাথর সংগ্রহ করে, তৃতীয় দিনে ২ হাজার এবং শেষ দিনে আরও ২ হাজার ক্যারেট। মোট ১০ হাজারেরও বেশি ক্যারেট ওজনের পাথর সোনাদানা দুটি কেরোসিন তেলের টিনে ভর্তি করে নেতাজির চিতাভস্মের সঙ্গে টোকিয়োতে নিয়ে আনা হয়। এগুলো নিয়ে আসেন মি. সাকাই, মি. নাকামুরা, মি. হায়াশিদা। তিন জনই তাইওয়ানস্থ জাপানি সামরিক বাহিনীর পদস্থ অফিসার। এগুলো টোকিয়ো পর্যন্ত নিয়ে আসা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বায়ু, স্থল ও জলপথের মাধ্যমে টোকিয়ো পৌঁছে তাঁরা নেতাজির দেহভস্ম ও রত্নরাজি প্রথমে জাপানি সামরিক বাহিনীর প্রধান দপ্তরে জমা দেবার জন্য নিয়ে আসেন। সেখানকার প্রধান অফিসার লে. কর্ণেল

তাকাকুরা সেগুলো দপ্তরে জমা রাখার চেয়ে টোকিয়োর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি শাখার প্রধান মি. রামমূর্তি ও মি. আয়ার এর কাছে হস্তান্তর করার জন্য উপদেশ দেন। মি. মূর্তি তৎক্ষণাৎ নেতাজির চিতাভস্ম টোকিয়ো সুগিনামি ওয়ার্ডের রেনকোজি মন্দিরে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেন। আয়োজন করেন সুপরিসরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে নেতাজির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। আর রত্নগুলো সামরিক দপ্তরের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সেগুলো তাঁর নিজের হেফাজতে রাখেন। পরে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর হাতে অর্পণ করেন। আবার অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৭ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু জাপান সফরে এলে মি.রামমূর্তি ও মি.আয়ার তাঁর কাছে ঐ রত্নসম্পদগুলো হস্তান্তর করেন। সেদিন ছিল সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখ। এখানে এখন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, নেতাজি যদি নাই মারা যাবেন তাহলে তাঁর ধনরত্নগুলো টোকিয়ো পর্যন্ত চলে আসে কিভাবে? আর কিভাবেই বা সেগুলো ভারত সরকার গ্রহণ করেন? এটা এক বিরাট রহস্য কিংবা আদৌ সত্য নয়।

ধনসম্পদ নিয়ে বিতর্ক

প্রকৃতপক্ষে, তাইওয়ান থেকে যে পরিমাণ রত্নরাজি জাপানে বহন করে আনা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম নাকি ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল বলে দীর্ঘদিন দুই দেশের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলেছিল। এটা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, ভারতীয় নেতাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁরা নেতাজির মৃত্যুকে স্বীকার করেন না, কেবল অনুসন্ধান করে বেড়ান, অযথা বিতর্ক তোলেন, তাঁকে জাপানের দালাল বলেন, দেননি তাঁকে ৫০ বছরকাল জাতীয় বীরের স্বীকৃতি--তাঁরা কিভাবে ঐ ধনসম্পদগুলো গ্রহণ করেন? বিতর্ক তোলেন কোন্ যুক্তিতে?

আর যাঁরা নেতাজিকে সাধু-সন্ন্যাসী বানিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে বলা যায় যে, নেতাজি যদি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যুদ্ধের পর আজও বেঁচে থাকেন এবং ভারতের মাটিতেই--তা হলে তাঁর সম্পদগুলো জাপানে আসে কিভাবে তাইওয়ান থেকে? নেতাজির মতন নির্লোভ, দায়িত্ব সচেতন

ব্যক্তিত্ব সন্ন্যাসী হওয়া সত্বেও এত বিপুল ধনসম্পদের খোঁজখবর নেবেন না বা ভারত সরকার গ্রহণ করার পর সংবাদ জানবেন না, জেনেও কিছু বলবেন না এটা ভাবা যায় কি? এগুলো তো তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল না, এসব ছিল স্বাধীনতাকামী নেতাজির সমর্থক সাধারণ প্রবাসী ভারতীয়দের দান। তাঁদের মূল্যবান সম্পদ। সেগুলো তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেয়া কি নেতাজির কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না? তিনি কি এমনই দায়িত্ব-কর্তব্যহীন অবিবেচক অকৃতজ্ঞ বলে আমরা ধরে নেব?

বিতর্কিত এই ধনসম্পদ বিষয়ে জাপানি কর্তৃপক্ষের ভাষ্য ছিল, আমানতকৃত সম্পদ যা ছিল সবই মি.মূর্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধি দলের ভাষ্য ছিল এর বিপরীতে, তাইওয়ান থেকে আনিত রত্নসম্পদগুলো ছিল ওজনে আরও ভারী এবং দুটি কেরোসিন তেলের টিনে ভর্তি। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন নেতাজির তৎকালীন সঙ্গী কর্ণেল হাবিবুর রহমান। কিন্তু মি.মূর্তির ভাষ্য, তিনি যখন জাপানি সামরিক দপ্তর থেকে এগুলো গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁকে দুটি তেলের টিন নয় একটি থলে দেয়া হয়েছিল। এই সম্পদ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যেমন হয়েছে তর্কাতর্কি, তেমনি রয়েছে সন্দেহ, অনুদ্ঘাটিত রহস্য। ভারতীয় সরকার সেগুলো নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের জাদুঘরে সংরক্ষণ করেছেন বলে জানা যায়। যার মূল্য তৎকালীন সময়ে কমপক্ষে ৫,০০০,০০০ ইয়েন! একি কম টাকা? নেতাজির ডাকে প্রবাসী ভারতীয়রা যেমন রক্ত দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন দুই হাত উজাড় করে অর্থ, স্বর্ণ, হীরা, জহরত কত কি! প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা তাৎসুও হায়াশিদা রচিত 'হিগেকি নো এইইউ, চন্দ্রা বোউস নো শৌগাই' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তৎকালে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে বসবাসকারী একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী হাবিব সাহিব জমিজমা বিক্রি করে তাঁর সমস্ত টাকা এবং রত্নমাণিক্য বিক্রি করে সর্বমোট ১৩,০০০,০০০ রুপী নেতাজিকে প্রদান করেছিলেন। তৎকালে বর্হিবিশ্বে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তুলেছিলেন চাঁদা হিসেবে ৩০০,০০০ ইয়েন সমমূল্যের রুপী। আরও একটি তথ্য থেকে জানা যায়, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে পরিমাণ টাকা ও সোনা, হীরা, দামী পাথর চাঁদা হিসেবে তোলা হয়েছিল

তার অংক রীতিমতো বিস্ময়কর! প্রায় ১ কোটি রুপী!

অন্য একটি উৎস জানাচ্ছে, নেতাজি যখন সাইগন থেকে তাই-ওয়ানের দিকে যাত্রা করেন তখন বিমানটি ছোট বিধায় তিনি আরও কিছু মালপত্র সঙ্গে বহন করতে পারেননি। মাত্র দুটি স্যুটকেস সঙ্গে নেন। এ দুটোর মধ্যেই রত্নগুলো ছিল বলে ধারণা করা হয়। আরও দুটি স্যুটকেস প্রবাসী সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে সাইগনে রয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে আরও বিপুল পরিমাণ রত্নসম্পদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও আজও লুকানো আছে। যার সন্ধানে ভারতীয় সরকারের অনুসন্ধানকারীরা বহুদিন ঘুরেছেন কিন্তু সন্ধান পাননি। প্রকৃতপক্ষে, এইসব তথ্য কতখানি সত্য বোঝা মুশকিল।

জাপানে নেতাজি স্মরণে

২০০২ সালে যুদ্ধ পরবর্তী ৫০ বছর এবং জাপান-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে নেতাজিকে স্মরণ করছেন জাপানে কেউ কেউ। তাও বিশেষ কিছু নয়। ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখে জাপানের একটি ডানপন্থী সংস্থা 'নিপ্পনকাইগি' (Nippon Kaigi) জাপান-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে একটি আলোচনা ও নৈশভোজের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানের নির্বাহী পরিষদে ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (LDP)-র নেতা য়োশিরো মোরি, তারো আসো, প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারো নাকায়ামা, প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মহাপরিচালক হোসেই নোরোতা, ফুজিৎসু কোম্পানির চেয়ারম্যান এমিরেটাস তাকুমা ইয়ামামোতো, টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর কেইচিরো কোবোরি, ভারতে প্রাক্তন জাপানি রাষ্ট্রদূত শুনজি কোবায়াশি, INA-র প্রাক্তন লিঁয়াজন অফিসার কাজুনোরি কুনিৎজুকা, জাপান-ভারত মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কোজি ওকামোতো, ৎসুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর তাদাও তাকেমোতো প্রমুখ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক.রবীন্দ্র-গবেষক কাজুও আজুমা, টোকিয়ো বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক.বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ ড. ৎসুয়োশি নারাসহ প্রায় ৫০ জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা

সংস্থা, বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিনিময় সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকলে না হলেও কেউ কেউ নেতাজির কথা বলেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আফতাব শেঠ ড. রাধাবিনোদ পাল ও তাঁর ঐতিহাসিক (টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনাল) রায় সম্পর্কে বলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। তাঁদের কণ্ঠধ্বনিতে না হলেও অন্তঃস্থলে নেতাজির একটি বিশিষ্ট আসন রয়েছে তা অনুভব করা গেছে। জাপানি ও বিদেশী মিলিয়ে প্রায় ৩০০ বয়স্ক নাগরিকের উপস্থিতি ছিল নির্লিপ্ত। অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্প্রতি নির্মিত 'জিউ আজিয়া নো এইকোউ' (মুক্তএশিয়ার জয়শ্রী) নামক একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। যার বিষয়বস্তু ছিল ভারত ও বার্মার স্বাধীনতা যুদ্ধে জাপানের ভূমিকা। সেখানে নেতাজিই ছিলেন মূখ্য চরিত্র।

বেশ কয়েকজন প্রবীণ অতিথি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, এত বছর পর কেন নেতাজিকে 'ভারতরত্ন' প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হল? ভারতীয় স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা যিনি পরাধীন ভারতীয়দের মুক্তিদাতাও বটেন--তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের অবহেলা সহ্য করা যায় না! ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্ষোভের কারণ নাকি, ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর বহু বৎসর পশ্চিমবঙ্গ যেখানে নেতাজির জন্ম--তাঁকে 'তোজোর কুকুর' বলে চরমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গী এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। নেতাজিকে জাতীয় বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠাপন এবং ঘটা করে তাঁর জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা শুরু করেছেন। নেতাজির প্রতি এতদিনকার বিরূপ মনোভাব বদলে গেছে। নিঃসন্দেহে এটা বাঙালি জাতির জন্য শিক্ষণীয় দিক।

অন্যদিকে যুদ্ধের ৫০ বছর পর নেতাজি সম্পর্কে নতুন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বা আলোকচিত্র প্রদর্শনী বা আলোচনার সংবাদ চোখে পড়েনি। মি. হায়াশিও জানালেন, নেতাজির ৫০তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করার সময় প্রভাবশালী আসাহিটিভি চ্যানেলসহ দু/একটি চ্যানেল প্রতিবেদন তুলে ধরেছে। এই পর্যন্ত তিনি জানেন। আর বিশেষ কিছু সংবাদ তাঁর কাছে নেই। ৪০ বছর পূর্বে কিছু গ্রন্থ নেতাজি বিষয়ে

প্রকাশিত হয়েছে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা নেতাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গবেষক-লেখক। তাও ১০ কি ১১টি গ্রন্থের বেশি নয়। এবং এগুলোর পুনর্প্রকাশও হচ্ছে না বহু বছর ধরে। ১৯৪৩ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে তৎকালীন বিখ্যাত কবি য়োনেজিরো নোগুচি নেতাজিকে উৎসর্গ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন সেটি সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমির স্মারকগ্রন্থে খুঁজে পেয়েছি। তবে সাম্প্রতিককালে যুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা, স্মৃতিচারণ এবং প্রতিবেদন প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে জাপানি পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে সেখানে বারংবার নেতাজির নাম এসেছে, আসছে প্রাসঙ্গিক কারণে। সাম্প্রতিককালে তরুণ লেখক. গবেষক যাঁরা জাপান-ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন গবেষক.সাংবাদিক তাকেইউকি তানাকা। বিখ্যাত মাসিক ইতিহাস বিষয়ক কাগজ 'রেকিশি গুনজৌ'র আগস্ট (২০০২) সংখ্যায় নেতাজিকে মূল্যায়ন করে একটি তথ্যবহুল দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া নেতাজি বিষয়ে অন্যান্য ফিচারও লিখে আসছেন। এখন লিখছেন রাসবিহারী বসুর জাপানে জীবনযাপনের ওপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সেখানেও নেতাজির কথা ঘুরে ফিরে আসবে। ৩/৪ বছর আগে তোয়োয়েই চলচ্চিত্র সংস্থা থেকে নির্মিত হয়েছে 'প্রাইড', বিতর্কিত এই চলচ্চিত্রে নেতাজিকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। এর পরিচালক শিনইয়া ইতো ঘোষণা করেছেন নেতাজির ওপর একটি ব্যয়বহুল পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যাঁরা সত্তরোর্ধ তাঁদের সঙ্গে বাংলা-ভারতের প্রসঙ্গ উঠলেই 'নাকামুরায়া'র বিহারি বৌসু (রাসবিরাহী বসু), ইন্‌দো নো এইইউ চন্দ্রা বৌসু (বীর সুভাষচন্দ্র বসু) এবং পাআরু হাকুশি (বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল) এই তিনজনের নাম তাঁরা সম্মানের সঙ্গে উচ্চারণ করেন। বিশেষ করে এই প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে নেতাজি এবং ড. পালের আসন খুবই উঁচু। এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস কিংবা এশিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাস নেতাজিকে বাদ দিয়ে রচনা করা সম্ভব নয়।

এখানে আকাদেমির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজের কথা না বললে নয় সেটি হচ্ছে, নেতাজির প্রবাসজীবনের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে ১৯৯৫

সালে প্রকাশিত ২৫০ পৃষ্ঠার একটি স্মারকগ্রন্থ। 'নেতাজি তো নিহোনজিন' (Netaji's Ideal and Movement with Japanese) নামক সম্পূর্ণ জাপানি ভাষার এই গ্রন্থে জাপানি, বর্মী, দক্ষিণ ভারতীয় এবং বাঙালি ব্যক্তিত্ব তাঁদের স্মৃতিচারণ করেছেন নেতাজি সম্পর্কে। রয়েছে অনেক জানা-অজানা তথ্য এবং রঙিন, সাদাকালো দুর্লভ আলোকচিত্র। গ্রন্থটি বিনামূল্যে শত শত কপি বিতরণ করা হয়েছে। যুদ্ধের পর অদ্যাবধি এই পর্যন্তই নেতাজির মূল্যায়ন হয়েছে বা হচ্ছে জাপানে। তবে সম্প্রতি ভারতে নেতাজির জাতীয় স্বীকৃতির প্রভাবে জাপানেও নতুন করে তাঁর সম্পর্কে জাপানিদের আগ্রহের সৃষ্টি হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি শুভলক্ষণ।

সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমির ভবিষ্যৎ

আকাদেমির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে টেলিফোনে মি. তাকেজুমিকে প্রশ্ন করেছিলাম। যদি এবারের অনুসন্ধানকারী দলের ফলাফল গৃহীত এবং নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে নেয়া হয় তা হলে প্রতিষ্ঠানটি কি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে? প্রশ্নের উত্তরে মি. তাকেজুমি বললেন, "যেহেতু নেতাজির চিতাভস্মকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আকাদেমিটি গঠিত হয়েছে সেই চিতাভস্মই যদি ভারতে ফিরে যায় তা হলে তার আর তেমন কি কাজ থাকতে পারে? বছরে নেতাজির জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করা ছাড়া আর কোন তৎপরতা নেই। আর মি. হায়াশি চাচ্ছেনও এবারই চিতাভস্ম ভারত ফিরিয়ে নিক। তিনি চাচ্ছেন এত বছর যখন নেতাজির চিতাভস্মকে রেনকোজি মন্দির সংরক্ষণ করে এসেছে তাই এর প্রধান পুরোহিত এবং তাঁর দায়িত্বেই যেন কাজটি সম্পন্ন হয়। তিনি মনে করছেন, তাঁর পরিবর্তে আর কেউ নেই যে নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে দিতে দেনদরবার চালিয়ে যাবেন। যে কারণে আকাদেমির মূল কর্মসচিবের দায়িত্ব কাউকে দিতে আগ্রহী নন। তবে শুনেছি, কয়েক বছর পূর্বে নেতাজির কন্যা অনিতা জাপানে এসেছিলেন। তিনি পিতার চিতাভস্ম দেখে বিশ্বাস করেছিলেন। মি.হায়াশির সঙ্গে পত্র যোগাযোগ রয়েছে অনিতার। এমনও হতে পারে শেষ পর্যন্ত নিজদায়িত্বে অনিতাকে পিতার চিতাভস্ম প্রদান করে এই নাটকের সমাপ্তি টানবেন।"

অনিতার প্রসঙ্গ এলোই যখন একটি কথা বলতে হয়। নেতাজি যদি সন্ন্যাসী হয়ে বেঁচে থাকবেন তা হলে একবারও কি তাঁর ইচ্ছে হয়নি কখনো অন্ততঃপক্ষে আত্মজাকে দেখার? অথবা তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী এমিলি সেঙ্কেল কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন জানার? এই দিকগুলো কি মানবিক নয়? সন্ন্যাসীও তো মানুষ।

উপসংহার

সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজকুমার মুখোপাধ্যায়ের তদন্ত কমিশন নেতাজির অন্তর্ধান অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি জাপান, তাইওয়ান, লন্ডন প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে নেতাজির মৃত্যুজনিত কোন ঘটনার সন্ধান পাননি। তাইওয়ানে গিয়েও ঐ সময়কার কোন বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ, তথ্য এবং স্মৃতিচিহ্নেরই সন্ধান মেলেনি।

অন্যদিকে তাঁর দলেরই অন্যতম সদস্য কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী কেশব ভট্টাচার্য ২০০৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে তদন্তকাজে কেন্দ্রিয় সরকারের অসহযোগিতা, অবহেলা, প্রতারণা এবং সৃষ্ট বিভ্রান্তি সম্পর্কে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ নিবন্ধে যা নেতাজি অনুসন্ধানের ইতিহাসকেই পাল্টে দিয়েছে। নিবন্ধটি পড়ে জানা গেল এই প্রথম যে, ১৯৫৬ সালেই তাইওয়ান সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে নেতাজির বিমান দুর্ঘটনার অনুসন্ধান চালায় কিন্তু দুর্ঘটনার কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি। এই তথ্য সরকারিভাবে ইংরেজি ও চীনা ভাষায় প্রকাশ করা হয়। পাঠানো হয় বৃটেনেও। বৃটেনের মাধ্যমে যে ভারত সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অবগত হয়েছিলেন সে সম্পর্কিত মুদ্রিত তথ্য শ্রীমুখোপাধ্যায় লন্ডন থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এই তথ্য নেতাজির জাপানি ভক্তদেরও না জানার কথা নয়। তৎসত্ত্বেও জাপানিরা সুদীর্ঘকাল ধরে নেতাজি তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনার কথা বলে আসছেন, সংরক্ষণ করছেন তথাকথিত তাঁর চিতাভস্ম। আর নেহেরু বিষয়টি জনসাধারণকে না জানাননি। বরং তাঁরই অনুসারী শাহনেওয়াজ ও খোশলা নেতাজি তদন্ত কমিশন প্রধান হয়ে জাপান ঘুরে গিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নেতাজি তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত

হওয়ার কথা স্বীকার করেন। সরকার লোক দেখানোর তাগিদে নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রতীজ্ঞায় আবদ্ধ হয়। নেহেরু ১৯৫৭ সালে জাপান সফরকালে রেনকোজি মন্দিরে যান এবং একটি স্মারকপত্রে যে একটি লাইন লিপিবদ্ধ করেন সেটা নেতাজির সঙ্গে আদৌ সম্পর্কযুক্ত নয়। তাঁর পরে অনেকেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন চিতাভস্ম ফিরিয়ে নেবেন কথা দিয়েছেন কিন্তু কথা রাখেননি। সরকারিভাবে নেতাজির অন্তর্ধানের রহস্য উদঘাটনে আন্তরিক ইচ্ছেরও প্রতিফলন ঘটেনি।

এখানে এখন দুটি রহস্যের কথা উল্লেখ করা যায়: এক, নেতাজি যদি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত না হবেন তাহলে গেলেন কোথায়? পূর্বোক্ত ফরোয়ার্ড ব্লকের সন্দেহ অনুযায়ী নেহেরু সেটা জানেন ধরে নিতে হবে। আর দুই, জাপানি ভক্তরা বিমান দুর্ঘটনার কথা এতদিন ধরে বলে আসছেন ঠিকই কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নেতাজির অন্তর্ধানের রহস্য নেহেরু আর সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমি-জাপানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একদিন তা উন্মোচিত হবেই --সমাপ্তি ঘটবে সব রহস্য, প্রতারণা আর বিভ্রান্তির। সত্য প্রকাশিত হবেই--শুধু সময়ের ব্যাপার।

এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত (২৫.৬.০৬) মাসাও হায়াশির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি তাঁকে পাইনি। শুধু জানার জন্য যে, আকাদেমি কিংবা নেতাজিভক্তরা শ্রীমুখার্জীর প্রতিবেদন মেনে নেবেন কিনা? যদি মেনে নেন তাহলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতাজিকন্যা অমিতা উক্ত চিতাভস্ম তাঁর দেশ জার্মানীতে নিয়ে যাবেন কিনা? সেইসঙ্গে মুছে যাবে কিনা ৪৮ বৎসর বয়স্ক 'সুভাষচন্দ্র বসু আকাদেমি-জাপান?'

....

তথ্য নির্দেশ:

নেতাজি তো নিহোনজিন (গ্রন্থ); জাপান, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ চন্দ্র এবং অন্যান্য/ ড. কাজুও আজুমা; মাসিক মানচিত্র; রেকিশি দোকুহোন (বিশেষ সংখ্যা); মাসিক রোকাশি গুনজৌ; দি ট্রিবিউন (ইন্টারনেট-ম্যাগাজিন); দি উইক (ইন্টারনেট-ম্যাগাজিন), নেহেরু থেকে সোনিয়া: প্রতারণা, ছলনা, অসহযোগিতা চলছেই/কেশব ভট্টাচার্য এবং বিভিন্ন সেমিনার

* কেশব ভট্টাচার্যের নিবন্ধটি অনুজপ্রতীম অর্চন পাল ও পার্থ আচারিয়াব সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাদেরকে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা

....

* ২০০৪ সালে ইন্টারনেট ম্যাগাজিন 'বিশ্বায়নে' প্রকাশিত। * আলোকচিত্র: ইউকো তোজোর সৌজন্যে

জাপানে
শান্তির দূত
বিচারপ
ড. রাধা নোদ পাল
নেই শিমোনাকার মতন আজন্ম 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' মতাদর্শী। নেই শান্তিবাদী বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল। নেই বিশ্বশান্তিবাদী আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা রাজামহেন্দ্র প্রতাপ। তাঁরা আজ ইতিহাস, কিন্তু জাপান-ভারতের ইতিহাসে তাঁদের স্থান নেই

জাপানে শান্তির দূত বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল
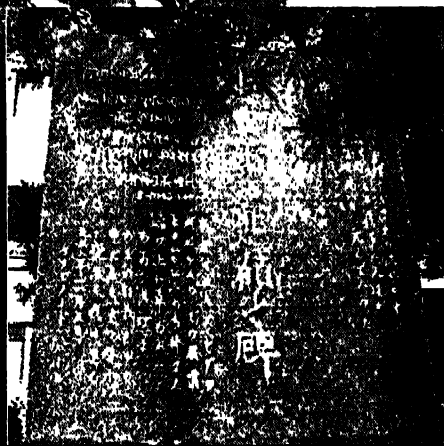
২০০২ সালের আগস্ট সংখ্যা মানচিত্রে 'এশিয়ায় আরও হিরোশিমা আরও নাগাসাকি' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম, "এশিয়ায় যেভাবে যুদ্ধের দামামা বাজছে, বাজছে পাক-ভারত সীমান্তে এটাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে হিরোশিমার হৃদয়বিদারক হত্যাযজ্ঞের দৃশ্যাদি প্রদর্শন করত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী জনমত গঠন করা উচিত। তবেই না হিরোশিমা দিবসের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে......... ।"

জাপানে প্রতি বছর ৬ এবং ৯ আগস্ট যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকি দিবস পালিত হয়ে থাকে। তবে তা হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বললে অত্যুক্তি হয় না। সরকারিভাবে প্রধানমন্ত্রী গিয়ে বক্তৃতা করেন। আর এই দুই শহরের মেয়রদ্বয় শান্তির পক্ষে প্রথাগত যুদ্ধবিরোধী ঘোষণা পাঠ করেই দায়িত্ব শেষ করেন।

যেহেতু হিরোশিমা শহরে প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তাই এর নামই বেশি প্রচার পায় নাগাসাকির চেয়ে। এখানে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ-আলোচনা অনুষ্ঠানাদি হয় জাপানি এবং বিদেশীদের উদ্যোগে। রং-বেরঙের পোস্টার, ব্যানার, প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত শান্তি মিছিল দেখা যায়। বোমার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানসংলগ্ন জাদুঘরে রয়েছে বিস্তর আলোকচিত্র, বিবিধ প্রামাণ্যদলিলপত্র এবং নিদর্শনসমূহ। এগুলো দেখার জন্য জাপানি এবং বিদেশীদের ভীড় পরিলক্ষিত হয়। বছরের প্রতিদিনই সারা জাপান এবং বিদেশ থেকে পর্যটকরা হিরোশিমা, নাগাসাকিতে পা রাখেন।

অবশ্য সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়নি এই দুটি দিবসকে কেন্দ্র করে। অথচ এত বড় দুটি নৃশংস ঘটনা ঘটেছে মানব জাতির ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৫ সালে আজ জাপানে তা শুধুই বিবর্ণ কাগুজে-ইতিহাস ছাড়া বোধকরি আর কিছু নয়। জাপানিদের অধিকাংশই যেন আজ বিস্মৃতপ্রায় হিরোশিমা-নাগাসাকির অমানবিক ঘটনার কথা! বোমায় নিহতদের আত্মা, আঘাতপ্রাপ্ত অসুস্থ নরনারী বা 'হিবাকুশা'দের চাপা আর্তস্বর এখন রাজধানী টোকিয়োসহ দেশের অন্যান্য স্থানে অনুরণন তোলে না। পত্রপত্রিকা, টিভি এই দুই দিবস নিয়ে তেমন রা শব্দও করে না। বলা যায় নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়ে যায় হিরোশিমা ও নাগাসাকি

দিবস। তরুণ প্রজন্ম জানেই না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী ঘটেছিল হিরোশিমা-নাগাসাকিতে এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে। কেননা জাপানি পাঠ্য পুস্তকে প্রকৃত ইতিহাস পড়ানো হয় না। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ঘটনার পরিণাম নিজেদের কৃতকর্মের ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন এদেশের অধিকাংশ পন্ডিত, ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিক। জনগণেরও এক সিংহভাগ জাপানকেই দায়ী করে থাকেন। স্পষ্টাস্পষ্টি মতামত তাঁদের—জাপান যুদ্ধে না জড়ালে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু কার্যকারণ বলতে একটি কথা তো আছেই। জাপান কেন যুদ্ধে জড়িয়েছে এর অবশ্যই পটভূমি একটি আছে। না থাকলে যুদ্ধ করতে যায় কেউ? যদি জাপান দোষী হয়ে থাকে তাহলেও আত্মপক্ষ সমর্থনের যে একটি দাবি স্বাভাবিকভাবেই থেকে যায় তাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কেতাদুরস্ত, কর্মকান্ত জাপানিরা এখন আর ভাবতে চান না যে, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী। নিরাপরাধ মানুষ আর নিষ্পাপ শিশুদের নির্বিচারে হত্যার জন্য আমেরিকাও সমানভাবে নাৎসীদের মতো যুদ্ধাপরাধী। এদের যদি বিচার হতে পারে আমেরিকানদের কেন হবে না? এই প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন আজ থেকে ষাট বছর আগে টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনাল (৩রা মে, ১৯৪৬-১২ নভেম্বর, ১৯৪৮) এর এগার জন বিচারপতির একজন তৎকালীন ভারতীয় প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক আইনবিদ বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল।

ষাট বছর আগে তাঁর প্রদত্ত সুচিন্তিত রায়, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য এবং অবিস্মরণীয় মন্তব্য এখন বিশ্বের যে কোন স্থানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে গেলেই প্রসঙ্গ হিসেবে আসে। তিনি টোকিয়ো ট্রাইবুনালকে 'ভিক্টর'স জাস্টিস' তথা 'বিজয়ীর বিচার' বলে মন্তব্য করেছিলেন। আরও বলেছিলেন, "এটা বিচারের নামে প্রহসন, পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বৈ কিছুই নয়। এখানে আন্তর্জাতিক আইনকে পদদলিত করা হয়েছে, আইনের সত্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটা কোন বিচারই নয়। এটা বিজিতের উপর বিজয়ীর মধ্যযুগীয় বর্বর উল্লাস মাত্র।" যে কারণে ১৯৯৩

সালে সাবেক যুগোস্লাভিয়াতে এবং ১৯৯৪ সালে রাওয়ান্ডাতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সাবধানতার কথা তুলেছিলেন বিজ্ঞমহল এই বলে যে, এটা যেন 'ভিক্টর'স জাস্টিস' না হয়ে দাঁড়ায়!

অকুতোভয়, স্পষ্টভাষী, ন্যায়দন্ডের মূর্তপ্রতীক ড. পালের এই ঐতিহাসিক রায় আজ বিশ্বআইনের উল্লেখযোগ্য মাইলফলক, অমূল্য সম্পদ। সম্প্রতি প্রকাশিত 'সেকাই গা সাবাকু তোকিয়ো সাইবান' (যুদ্ধ পরবর্তী পঞ্চাশ বছর স্মারক) গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ড. পালের রায়কে সমর্থন করে বিশ্বের বিশিষ্ট পঁচাশি জন রাজনীতিবিদ, সামরিক কর্মকর্তা, আইনজ্ঞ, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিক, কবি টোকিয়ো ট্রাইবুনালের যুক্তিযুক্ত আলোচনা করেছেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে তৎকালীন জাপানস্থ জেনারেল হেড কোয়ার্টারের (GHQ) প্রধান জেনারেল ডগলাস ম্যাক্আর্থার এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত! ম্যাক্আর্থার অবসর গ্রহণের পর অত্যন্ত প্রভাবশালী দৈনিক নিউইয়র্ক টাইম্স এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এবং কংগ্রেসের উচ্চতর আইনসভায় জানিয়েছেন, টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনাল ছিল প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট (১৯৩৩-১৯৪৫) এর একটি পূর্বপরিকল্পিত সাজানো নাটক। তিনি নিজমুখে বিচারপতি ড. পালের রায়কে সঠিক বলে সমর্থন করেছেন। উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অন্যতম শত্রু ছিলেন জেনারেল ডগলাস ম্যাক্আর্থার, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে অপসারণের এক গুপ্ত পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। আক্রোশগত কারণেও তিনি রুজভেল্টের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়াও সত্য একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে যুদ্ধের পর এক এক করে। শুধু জেনারেল ম্যাক্আর্থারই নন, এমনকি উক্ত ট্রাইবুনালের অন্যতম বিচারপতি জোসেফ. বি. কিনান মূলত যিনি ছিলেন আমেরিকার প্রধান অভিশংসক বা চীফ্-প্রসিকিউটর, অষ্ট্রেলিয়ার বিচারপতি বলে কথিত স্যার উইলিয়াম ওয়েব প্রমুখরাও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে, টোকিয়ো ট্রাইবুনাল ছিল আইনী ভিত্তির বাইরে একটি ভুল বিচার! উল্লেখ্য যে, একমাত্র ড. পাল ছাড়া বাকি দশ জন আইনজীবীই ছিলেন না—আন্তর্জাতিক আইন

জানবেন তো দূরের কথা--ট্রাইবুনালে বিচারপতি হলেন কিভাবে, এই ঘটনা পরে ফাঁস হয়ে যায়। অনেকে আবার ইংরেজিই জানতেন না! বিশ্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে এমন নগ্ন জালিয়াতির উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমাদের জানা নেই। বিশ্বে সামরিক আইনে বিচারের সূচনা হয় আমেরিকাতেই ১৭৮০ সালে। যুদ্ধোদ্ভূত এরকম একপক্ষীয় বিচার বেশ কয়েকবার আয়োজন করা হয়েছে। আর সেই ঐতিহ্য থেকেই অনুষ্ঠিত হয়েছে নুরেনবার্গ ও টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনাল। প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিক আইনের কোথাও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধি-বিধানই ছিল না তখন পর্যন্ত।

এই সাজানো প্রহসনের কারণেই বিচারপতি ড. পাল প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী এবং জেনারেল হিদেকি তোজোসহ আঠাস জন আসামিকে নির্দোষ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর রায় যে কতখানি সঠিক ছিল বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিত নোয়াম চামস্কির মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। তাঁর যথার্থ মন্তব্য, "যুদ্ধাপরাধীদের যদি বিচার করতে হয় তা হলে আমেরিকার প্রতিটি প্রেসিডেন্টের বিচার করতে হবে। বিল কিন্টন, জিমি কার্টার পর্যন্ত এর বাইরে নয়।"

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত ভূতপূর্ব নদীয়ার এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম (১৮৮৬), শৈশবে পিতৃহারা, তারুণ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক (১৯০৭) ড.পাল পরবর্তী জীবনে শুধু বিচারপতিই ছিলেন না--একাধিক সম্মানীত কর্মপদে নিজ প্রতিভাবলে আসীন হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা করেন। এরপর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে চাকরী করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে এমএ ডিগ্রী লাভ করার পর এই বিভাগেরই শিক্ষক থাকাকালীন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বেদোদ্ভূত হিন্দু আইন ও দর্শন বিষয়ে পিএইচডি অর্জন করেন (১৯২৪)। উক্ত বিদ্যায়তনে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসম্পন্ন টেগোর ল প্রফেসর নির্বাচিত হয়েছেন তিনবার ১৯২৫, ১৯৩০ এবং ১৯৩৮ সালে। যা এক বিরল ঘটনা। তিনিই প্রথম ভারতীয় এবং বাঙালি যিনি পর্তুগালের লিসবন

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ এবং আন্তর্জাতিক আইনে পিএইচডি অর্জন করতে সক্ষম হন। ১৯২৭-৪১ পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের আইন উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার সাধারণ সভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৪১-৪৩ পর্যন্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। ১৯৪৪-৪৬ অবধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৪৬-৪৮ পর্যন্ত টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনালের অন্যতম বিচারপতি। জেনেভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক আইন সভায় দুবার মনোনীত চেয়ারম্যান (১৯৫৮ ও ১৯৬২)। ১৯৫৭ সালে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক। ১৯৬০ সালে ভূষিত হন ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী' পদকে। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু সভা-সমিতি-সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আজীবন রবীন্দ্রভক্ত বিচারপতি ড.পাল জড়িত ছিলেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গেও। ১৯৬৭ সালে কলকাতায় এই বীর ব্যক্তিত্ব মহাপরিনির্বাণের পথে যাত্রা করেন। তাঁর এই আলোকিত বিশাল ব্যাপৃত কর্মজীবনের সঙ্গে তুলনীয় দ্বিতীয় আর কাউকে ভারতে আজও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক। তরুণ বয়সেই তিনি রুশো-জাপ, শিনো-জাপ যুদ্ধে বিজয়ী জাপানের অমিত শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হন এবং জন্মভূমিতে ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বুকের ভিতরে জাতীয়তাবাদের উত্থান অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত জাপান ও জাপানিদের আত্মিক সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন টোকিয়ো ট্রাইবুনালের রায় লিখতে গিয়ে। এই সুযোগ করে দিয়েছিলেন ভারতের হবু প্রধানমন্ত্রী বন্ধুবর জওহরলাল নেহেরু তাঁকে এই ট্রাইবুনালে প্রেরণ করে। আবার নেহেরুই ড. পাল প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি কি তবে মিত্রশক্তি নিযুক্ত তথাকথিত বিচারপতিদের সঙ্গে সুর মেলানো বিচারের রায় প্রত্যাশা করেছিলেন ন্যায়দন্ডের প্রতীক ড. পালের কাছে? আসলে নেহেরু তাঁকে চিনতে ভুল করেছিলেন। বিচারপতি পাল টোকিয়ো ইম্পেরিয়াল হোটেলের একটি কক্ষে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে প্রায় আড়াই বছর (১৯৪৬-৪৮) জাপানি ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, আইন, নীতি, সাহিত্য, বুশিদোউ (সামুরাই-

যোদ্ধাদের জীবনপন্থা) প্রভৃতি গবেষণা এবং মার্কিনী, য়োরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে যে সত্যদৃষ্টি ও দর্শন অর্জন করেছিলেন তাই বিধৃত হয়েছে ইংরেজিতে লিখিত ৭০০ পৃষ্ঠারও বেশি রায়ে। প্রায় ৩,০০০ হাজার গ্রন্থ এবং বহু তথ্যাদি-দলিলপত্র তিনি আনিয়েছিলেন ভারত, আমেরিকা, বৃটেনসহ অনেক দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে। তিনি আন্দোলিত হয়েছিলেন পুনরায় জাপানের আত্মিক-আধ্যাত্মিক শক্তিতে। কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিচারের রায় লেখেননি। আগাগোড়া তিনি নিরপেক্ষই ছিলেন। মূল আইনী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁর রায়ের অবকাঠামো যা আজও কেউ ম্লান বা ধ্বংস করতে পারেনি।

এই বিচারের সূত্র ধরেই তিনি এমন এক বিরল জাপানি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন যাঁর প্রভাব তাঁকে শেষ জীবনের মঞ্চে শান্তিবাদী কর্মীতে পরিণত করেছিল। আর তা হয়েছিল ইয়াসাবুরো শিমোনাকার মাধ্যমে। দুজনে ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত। সে এক বিরল ঘটনা জাপান-ভারতের ইতিহাসে।

শিমোনাকা স্বশিক্ষিত মৃৎশিল্পী, লেখক, শিক্ষাবিদ, শ্রমিক সংগঠক এবং জাপানের আধুনিক প্রকাশনা জগতের অগ্রপথিক; জাপানি ভাষায় ২৫ খন্ডে প্রথম বিশ্বকোষ প্রকাশক হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। মর্যাদাসম্পন্ন হেইবোনশা পাবলিশার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। মেইজি ১১ (১৮৭৮) সালে কোবের এক দরিদ্র কুমার পরিবারে জন্ম এবং শৈশবকালেই পিতৃহীন হয়ে প্রচন্ড দারিদ্রের ভিতর দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিমোনাকা ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন শান্তি ও সুশিক্ষার পক্ষপাতী। তরুণকালে দীক্ষা নিয়েছিলেন সাম্যবাদে। শ্রমিক আন্দোলনের আজীবন সমর্থক। টোকিয়োতে প্রথম মে ডে শ্রমিক সমাবেশ আয়োজনের অন্যতম পথিকৃৎ। তথ্যবহুল প্রকাশনার মাধ্যমে জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার চিন্তা এবং বাস্তবায়ন তাঁর মতো অন্য আর কোন জাপানি করতে পারেননি। জাপান থেকে আন্তর্জাতিক শান্তিবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে গতিশীল নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ১৯৫৪ সালে যখন আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের 'বিকিনি' দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়--এর

পরের বছর শিমোনাকা স্বউদ্যোগে সাত সদস্যের একটি দল গঠন করে বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে বিভিন্ন দেশে আবেদনপত্র পাঠান। এই সাত জন ছিলেন তৎকালীন নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ হিদেকি ইউকাওয়া, টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সেইজি কাইয়া, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক তানো জৌদাই, জাপান নারী সংস্থা ফেডারেশন সভানেত্রী রাইতেউ হিরাৎসুকা, জাপান YWCA চেয়ারম্যান তামাকি উয়েমুরা, জাপান ইউনেস্কো পরিষদ প্রধান তামোন মায়েদা এবং শিমোনাকা। ১৯৬০ সালে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জন এফ. কেনেডি বিজয়ী হন। তাঁর প্রচারপত্রে মুদ্রিত একটি বাণী শিমোনাকাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করলে তিনি একটি চিঠি প্রেসিডেন্টকে পাঠান। কেনেডি শিমোনাকার শান্তি বিষয়ক চিন্তা ও কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে সেই চিঠির উত্তর প্রেরণ করেন। এর পরপরই আরেকটি চিঠি পান লন্ডন থেকে FAO আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা স্যার জন বোয়িড ওয়ার এর কাছ থেকে। বোয়িড নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ তিনি শিমোনাকার নেতৃত্বাধীন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন-জাপানের কর্মকান্ডের জন্য দান করবেন বলে জানান।

প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব শিমোনাকার সঙ্গে ড.পালের সাক্ষাৎ ঘটে শিমোনাকারই শিষ্য লেখক.সাংবাদিক.গবেষক এবং 'গ্রেট এশিয়া এসোসিয়েশনে'র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মাসাআকি তানাকার মাধ্যমে টোকিয়ো ট্রাইবুনালে ফাঁসীর দন্ডাদেশপ্রাপ্ত জেনারেল মাৎসুই ইওয়ানের শোকানুষ্ঠানে। তিনি আগে থেকেই ড.পালের রায় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। প্রচন্ড জাতীয়তাবাদী চরিত্রের অধিকারী শিমোনাকাকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। নিষিদ্ধ হয়েছিল তাঁর প্রকাশনা সংস্থাও। কয়েক বছর কাটাতে হয়েছিল তাঁকে এক গ্রামে গৃহবন্দী হিসেবে। ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে ১৯৫২ সালে শিমোনাকার আমন্ত্রণে হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট মুভমেন্টের এশিয়া কংগ্রেসে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেছিলেন ড.পাল। এটাও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কেননা যুদ্ধ পরবর্তী য়োরোপীয়.শ্বেতাঙ্গদের শাসনাধীন এশিয়ায় শত শত বছর পর স্বাধীনতা এবং শান্তির যে স্রোত সৃষ্টি হয়

তার উৎস ছিল এই হিরোশিমা। অর্থাৎ হিরোশিমা হয়ে ওঠে শান্তির প্রতীক। শিমোনাকা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন-জাপান এর চেয়ারম্যান হয়েই অনুভব করেন এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করা জরুরী। ড. পাল তখন জাপানসহ বিশ্বব্যাপী তাঁর ঐতিহাসিক রায়ের কারণে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যগগনে অবস্থিত।

এই হিরোশিমা থেকেই বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সূচনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তৎকালীন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন মুভমেন্ট এর আলোকে ড. পালের মাধ্যমে। অবশ্য জাপানে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আরও আগে ১৯৩০ সালে। সূচনাকারী উত্তর ভারতে জন্ম ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসৈনিক রাজামহেন্দ্র প্রতাপ (১৮৮৬-১৯৭৯)। তিনি তিনবার জাপান সফর এবং দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। মূলত সমসাময়িককালের 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন' এই দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন তিনি। ১৯১৬ সালে লাহোরে থাকাকালীন তাঁর মাথায় এই চিন্তার পরিস্ফুটন ঘটে। তিনিই প্রথম বার্লিন থেকে ১৯২৮ সালে 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন' নামে এই আন্দোলনের ইংরেজি মাসিক মুখপত্র প্রকাশ করেন। তৎকালীন জাপানের খ্যাতিমান এবং প্রথম সারির রাজনীতিক, সাহিত্যিক, শান্তিবাদী বুদ্ধিজীবী প্রায় দেড় শতাধিক এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন উইকিও ওজাকি (রাজনীতিক, ডায়েট সদস্য এবং প্রাক্তন টোকিয়ো মেয়র), রিউতারো তাকাহাশি, তোমোহিকো কাগাওয়া (মহেন্দ্র প্রতাপের অনুসারী), শিগেরু য়োশিদা (যুদ্ধ পরবর্তী জাপানের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী; বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু), হিদেকি ইউকাওয়া (পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী), ইয়াসাবুরো শিমোনাকা, মাসাআকি তানাকা, এ.এম. নায়ার (কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক; প্রবাসী বিপ্লবী; প্রবাসী ভারত সরকারের অন্যতম কর্মকর্তা; টোকিয়োর বিখ্যাত 'নায়ার' রেস্টুরেন্টের প্রতিষ্ঠাতা) প্রমুখ।

১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসের ৩ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত হিরোশিমার বোমা-বিস্ফোরিত স্থানসংলগ্ন মোতোগাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শুধু ভারত থেকেই নয়, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোসিনা, ইন্দোনেশিয়া,

ফিলিপিন্স, চীন, হংকং, তাইওয়ান এবং নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া য়োরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, নিকট-প্রাচ্য, আরব ও উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অন্যতম অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডনস্থ WMWFG (World Movement for World Federal Government) এর চেয়ারম্যান নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী স্যার জন বোয়িড ওয়ার (Sir Boyd Oar, ১৮৮০-১৯৭১)।

মূলত এই সম্মেলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন বিচারপতি ড.রাধা-বিনোদ পাল। তাঁর টোকিয়ো ট্রাইবুনালের রায়ে যে বিষয়টি যৌক্তিকতার প্রতিধ্বনি তুলেছিল, তা ছিলঃ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যদি জাপানিদের বিচার হয়ে থাকে তা হলে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় নরনারী শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য আমেরিকানদের হবে না কেন? তারাও তো একই দোষে দোষী। তাঁর আরও যুক্তি ছিল, বর্বর নাৎসীদের নরধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করার মতো জাপানিদের অপরাধ কোথায়? জার্মানীতে বোমা নিক্ষেপ না করে জাপানে কেন হল? এখানে কি জাতিগত বৈষম্য একেবারেই নেই? তারপরও বোমা নিক্ষেপকারীদের মুখ থেকে আজ পর্যন্ত কোন একটি অনুশোচনামূলক বাক্য প্রকাশ পায়নি! অনুষ্ঠানে উপস্থিত একাধিক শ্বেতাঙ্গকে নিজের চোখের সামনে রেখেও তিনি স্পষ্টত এই মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তৃতার সময় ছিল ৪৫ মিনিট। পরের দিন তাঁর মন্তব্যসমূহ সকল পত্রিকায় বড় বড় শিরোনামসহ প্রকাশিত হয়।

এশিয়া কংগ্রেস চলাকালীন নভেম্বর মাসের ৫ তারিখে তাঁর হোটেলে হিরোশিমা শহরের কোমাচি হোনশোজি মন্দিরের প্রধান কর্মকর্তা য়োশিআকি কাকেই এসে অনুরোধ করেন যে, তাঁদের মন্দিরটি বোমার আঘাতে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে। তাঁদের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে স্মৃতিফলকে তিনি যেন কিছু বাণী উৎকীর্ণ করেন। তিনি আগন্তুকের অনুরোধ রক্ষাকল্পে এক রাত গভীরভাবে চিন্তা করে কাগজে লিখে দেন একটি বাণী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় উদ্বৃতিসহ। বাণীটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

নির্য্যাতিত এশিয়ার মুক্তিযজ্ঞে
মন্ত্রদীক্ষিত স্বর্গত আত্মার
শান্তি কামনায়।
"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্মিতেন
যথা নিযুক্তো জস্মি তথা করোমি"

রাধা বিনোদ পাল
৫ নভেম্বর, ১৯৫২।

কালো পাথরের ফলকে সেটি তিনটি ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়। মূল বাংলা ভাষা থেকে ইংরেজি ও জাপানিতে অনুবাদ করেন ড.পালের দোভাষী এ.এম. নায়ার। হোনশোজি বৌদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গনে স্থাপিত সেই ফলকটি এখনো আছে। অনেক বাঙালিই স্বদেশ-বিদেশ থেকে হিরোশিমায় এসে অনেক কিছু লিখেন কিন্তু জানেন না এই মনীষীর বাণীর কথা। জানেন না আজকের জাপানিরাও।

নভেম্বরের ৬ তারিখে হিরোশিমার উচ্চআদালত প্রদত্ত এক সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হলে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আইনজীবী এবং সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেন তাঁকে। সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, "১৯৫০ সালে ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক তথ্য অনুসন্ধান সংস্থার এক ঘোষণায় বলা হয়--টোকিয়ো ট্রাইবুনালের দন্ডাদেশের উপসংহার শুধু আছে কোন কারণ এবং প্রমাণ নথিবদ্ধ নেই। অথচ ন্যুরেনবার্গের বিচারে প্রদত্ত দন্ডাদেশের সমস্ত দলিলপত্র তিনদিনের মধ্যে সংগৃহীত এবং কারণ-ব্যাখ্যাসহ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু টোকিয়ো ট্রাইবুনালের রায়সমূহ আজ চার বছর হতে চলল এখনো প্রকাশ করা হয়নি। অন্য সকল বিচারকরা আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করেন। কেবল আমিই সকলকে নিদোর্ষ বলে রায় দিই। এবং কেন তার কারণও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অন্যরা তাঁদের দন্ডাদেশের কারণ এবং ব্যাখ্যা-প্রমাণ কিছুই পরিষ্কার করে প্রকাশ করেননি। যে কারণে এখন পর্যন্ত বিচারের রায়ের দলিলপত্র প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কাজেই এই বিচার ভাবাবেগের বশবর্তী

--বলা হলে অস্বীকার করার কিছু নেই।"

তিনি আরও বলেন, "কথা হচ্ছে এই যে, য়োরোপীয় ও মার্কিনীরা 'জাপান এশিয়ায় আগ্রাসী যুদ্ধের জন্য দায়ী' এই অভিযোগকে ইতিহাসে বন্দী করে রেখে এশিয়ায় তাদের আগ্রাসনকেই কৃতিত্বের সঙ্গে প্রদর্শন করার পাশাপাশি জাপানের গত আঠারো (১৯২৮-৪৫) বছর কালকে সামগ্রীকভাবে অপরাধ হিসেবে নির্দেশিত করে তৎপ্রসূত অপরাধবোধ জাপানিদের মনে সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখার পরিকল্পনাই করেছিল এতে কোন ভুল নেই। আমি ১৯২৮ থেকে ১৯৪৫ সালের ইতিহাস দুই বছর আট মাস কাল ধরে পরীক্ষা এবং সেইসঙ্গে সর্বদিক থেকে মূল্যবান দলিলপত্র সংগ্রহ করে গবেষণা করি। এর ভিতরে জাপানিদের জানা নেই এমন সমস্যাও আছে। তাও আমি আমার রায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমার এই ইতিহাস যদি পাঠ করা হয় তা হলে য়োরোপ এবং আমেরিকা যে সেই ঘৃণ্য এশিয়া-আগ্রাসীদের প্রথম দল তা না বোঝার কথা নয়। কিন্তু জাপানের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই আমার রায়টি পড়েননি। এবং নিজেদের বংশধরদেরকে 'জাপান আন্তর্জাতিক নীতি লংঘনকারী অপরাধী', 'জাপান জোরপূর্বক আগ্রাসী অপরাধ সংঘটিত করেছে' ইত্যাদি শেখাচ্ছেন। চীনের মাঞ্চুরিয়া ঘটনা থেকে শুরু করে মহাএশিয়া যুদ্ধ (The Great Asia War) পর্যন্ত ঘটমান সত্যিকার ইতিহাস আমার রায় পড়ে যতখানি সম্ভব গবেষণা করুন এটা আমার অনুরোধ। জাপানের আগামী প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাসজাত অপরাধবোধ নিয়ে অবক্ষয়ের স্রোতে ভেসে যাবে এটা আমি নিস্পৃহভাবে দেখব তা হতে পারে না। যুদ্ধকালীন তাদের (মার্কিনীদের) অপপ্রচার (প্রপাগান্ডা) মন থেকে মুছে ফেলুন। বিভ্রান্তিকর ইতিহাস সঠিক করে না লিখলে নয়।" এই সময় তিনি জাপানিদের উদ্দেশে একটি মন্তব্য করেন যা পরবর্তীকালে বহুল প্রচার লাভ করে, সেটি হল "জাপানিরা জাপানে ফিরে এসো!"

হিরোশিমা সম্মেলন শেষে ড.পাল শিমোনাকার নেতৃত্বে ওসাকা, ফুকুওকা, কিয়োতো, কোবে গমন করেন। সেখানে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন-জাপানের সহযোগী সংস্থার আয়োজনে একাধিক সভা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ কর্তৃক সংবর্ধিত হন; শান্তির পক্ষে জাপানিদেরকে

পুনরায় উঠে দাঁড়াতে আহবান জানান। সাক্ষাৎ করেন অনুষ্ঠানে আগত তরুণ প্রজন্মের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। তাদের উদ্বুদ্ধ করেন আপন জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, নীতিজ্ঞান সঠিকভাবে আহরণ করে প্রকৃত মানুষ হতে। মতবিনিময় করেন যুদ্ধাপরাধী বলে কথিত দন্ডপ্রাপ্তদের আত্মীয়-বর্গের সঙ্গে। ফুকুওকা শহরে অবস্থিত যুদ্ধপূর্ব উগ্র জাতীয়তাবাদী গুপ্ত সমিতি 'গেনয়োশা' 'কোকুরিউ কাই', প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব যিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, হেরাম্বলাল গুপ্তর রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা মিৎসুরু তোয়ামার সমাধি পরিদর্শন করেন।

য়োকোহামা বন্দরনগরীর ওকুরায়ামা শহরে তাঁকে এক প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানানো হয়। তিনি তৎকালীন টোকিয়োস্থ সুগামো প্রিজন যেখানে টোকিয়ো ট্রাইবুনালের এ. বি. সি. পদাবীযুক্ত আসামি ৩০০ জন বন্দী ছিলেন সেটা পরিদর্শন এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

এছাড়া তিনি তাঁর ৪৫ দিন ভ্রমণকালে হিরোশিমা, কিয়োতো, টোকিয়ো, ওয়াসেদা, মেইজি, হোসেই বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংবর্ধনা লাভ এবং সেগুলোতে এশিয়ার ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পরিদর্শন করেন কানাগাওয়া-জেলার হাকোনে শহরে অবস্থিত কোয়া কান্নন্ বৌদ্ধ মন্দির। এখানে পালের একটি স্মৃতিফলক সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই মন্দিরটি জেনারেল মাৎসুই ইওয়ানে নির্মাণ করেন জাপান-চীনসহ্ এশিয়ায় সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে।

টোকিয়ো অবস্থানকালে টোকিয়ো আইনজীবী সমিতি বিচারপতি ড. পালকে এক গুরুত্বপূর্ণ সংবর্ধনা প্রদান করে। সেখানে তিনি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত দেশী-বিদেশী বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষকদের সামনে সাহসিকতার সঙ্গে টোকিয়ো ট্রাইবুনালকে নাকচ করে দিয়ে বলেন, "বিজয়ী শক্তি প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে আন্তর্জাতিক বিধিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। প্রশাসনিক বিধিবিধান এবং আইন প্রণয়নের ধারাকে একে অপরের সঙ্গে অবৈধভাবে মিশ্রণ ঘটিয়ে জেনারেল ম্যাক্‌আর্থার

যেভাবে সামরিক বিচারের আয়োজন করেছেন তাতে করে আইনভঙ্গের কারণে তিনি নিজেই অপরাধী হয়ে পড়েছেন।” ....“আমি আপনাদের আহবান করছি এই বিচারকে যথার্থভাবে মোকাবিলা করে এর সঠিক সমালোচনা করুন। এই বিচারের পক্ষে মার্কিনী অপপ্রচারে কান না দেয়াই শ্রেয়। ‘জাপানের অতীত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের জন্য দায়ী’ এই প্রচারণা বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে জাতির পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আত্মিক বিশ্বাস লুপ্ত হওয়া। আর এই আধ্যাত্মিক চেতনালুপ্ত জাতি পরাশক্তির উপনিবেশে পরিণত হতে বাধ্য। কাজেই আপনারা মিত্রশক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ‘যুদ্ধাপরাধী’ এই অপবাদ মাথা থেকে মুছে ফেলুন।” তিনি কয়েকবার এই কথাটি উচ্চারণ করেন। বস্তুত যুদ্ধের ষাট বছর পর বিচারপতি পালের মন্তব্য অনুসারে আজকের জাপান কোন্ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তা সহজেই অনুমেয়।

যাহোক, জাপানের গণমাধ্যম সারা দেশব্যাপী তাঁর এই সফরকে ‘পাল ছেনপুউ’ অর্থৎ ‘পাল-হাওয়া’ বলে অভিহিত করেছিল। জাপানে ড. পালের অনেক ঘটনা বা অধ্যায় আছে যা এখনো উদ্ধারের বাকী। একটি ঘটনা এখানে বলতে চাই যা তাঁর শিষ্য মাসাআকি তানাকার স্মৃতিকথায় মুদ্রিত হয়েছে। শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার পর থেকেই মাঝে মাঝে ড. পাল একটি ছবি বুক পকেট থেকে বের করে দেখতেন। ছবিটি ছিল তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর। হাকোনে অবস্থানকালে কোয়া কান্নন্ মন্দির পরিদর্শন করে আসার পর রাতে সমুদ্রসংলগ্ন হোটেলের কক্ষে পুনরায় যখন ছবিটি করকমলে নিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন তখন তানাকাসহ অনেকের বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। শিমোনাকা ছবিটি প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে প্রাক্তন বিচারপতি জানান, এটা তাঁর স্ত্রীর ছবি। তিনি অসুস্থ স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলেন সুস্থ হলে পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জাপান ভ্রমণ করবেন। জাপানের সুন্দর প্রকৃতি, মানুষজন তাঁর খুব ভালো লেগেছে। তিনি যখন টোকিয়ো ট্রাইবুনালের বিচারে নিযুক্ত তখন একদিন মেয়ের কাছ থেকে মায়ের অসুস্থতার খবর নিয়ে একটি জরুরী বার্তা আসে। তিনি তৎক্ষণাৎ বিমানযোগে কলকাতায় ফিরে যান। উল্লেখ্য যে, তাঁর এই অকস্মাৎ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় জেনারেল ম্যাক্আর্থার

স্বেচ্ছায় তাঁর নিজস্ব বিমানবহর ড. পালকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। বাস্তবিকই যা অবিশ্বাস্য ঘটনা। শুধু তাই নয়, টোকিয়োতে ফিরে এসে তাঁর রায় উপস্থাপনের অনুরোধও করেছিলেন বলে জানা যায়। কলকাতায় পৌঁছে তিনি অসুস্থ স্ত্রীর শয্যাপাশে উপস্থিত হলে স্ত্রী তাঁর রুগ্ন হাত স্বামীর হাতের ওপর রেখে বলেন, "আমি খবর পাঠানোর কথা বলিনি, দুশ্চিন্তা করে মেয়ে বার্তা করেছে তাতেই তুমি আমাকে দেখার জন্য ছুটে এসেছ, তার জন্য আমার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কিন্তু তুমি আজকে একটি মহান কাজের দায়িত্বে আছ। জাপানের ভাগ্য আজ বিচারাধীন। তুমি আমার জন্য চিন্তা করো না, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি মরব না--তুমি কর্মস্থলে ফিরে যাও।"

মহীয়সী পত্নীর কথায় তিনি পুনরায় টোকিয়ো প্রত্যাবর্তন করেন। বিচারকার্য শেষ হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে স্বদেশ ফিরে যান। তার পাঁচ মাস পর প্রচন্ড অসুস্থতায় পর্যবশিত স্ত্রী স্বর্গবাসী হন। এই অধ্যায় শোনার পর শিমোনাকা তৎক্ষণাৎ তাঁর পরম প্রিয় পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশে একটি বিশেষ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করেন টোকিয়োর ৎসুকিজি শহরের বিখ্যাত হোন্‌কানজ়ি বৌদ্ধ মন্দিরে নভেম্বরের ২৬ তারিখে। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন-জাপান, জাপান বৌদ্ধ ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ প্রায় আড়াইশ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে উপস্থিত ছিলেন।

জাপান সফর শেষে কলকাতা ফেরার পূর্বক্ষণে জরুরী ভিত্তিতে মাসাআকি তানাকা রচিত হেইবোনশা পাবলিশার কর্তৃক প্রকাশিত ড.পাল কর্তৃক প্রদত্ত টোকিয়ো ট্রাইবুনালের রায় সম্পর্কিত জাপানি ভাষায় রচিত 'জাপান নির্দোষ রায়' নামে একটি গ্রন্থ তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। এই প্রথম তাঁর রায় সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পাওয়াতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

ড. পালের রায় নিয়ে তর্কবিতর্ক রয়েছে, এখনো তা চলছে। কেউ কেউ বলেন, ড. পাল ছিলেন কট্টোর জাতীয়তাবাদী এবং শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষী তাই জাপানি 'ন্যাশনালিস্ট'দের পক্ষ সমর্থন করে তাঁদের যুদ্ধাপরাধ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। চীনের মাঞ্চুরিয়ায় সংঘটিত জাপানি রাজকীয় সেনাবাহিনীর গণহত্যাকে উপেক্ষা করেছেন। জাপানিদের প্রতি দরদী

হয়ে এই রায় প্রদান করেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে তিনি টোকিয়ো আন্তর্জাতিক মিলিটারি ট্রাইবুনালকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই দেখেছেন, যা সত্য তাই রীতিমতো গবেষণা করে রায় ঘোষণা করেছেন। তার জবাব তিনি দিয়েছেন টোকিয়ো আইনজীবী সমিতির সংবর্ধনা সভায়। জনৈক জাপানি আইনজীবী বক্তৃতাকালে ড. পালকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনি দয়ার বশবর্তী হয়ে নির্দোষ রায় দিয়ে জাপানের হৃত সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন।" ড.পাল তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঐ বক্তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "আমি দরদী হয়ে এই রায় প্রদান করিনি। আন্তর্জাতিক আইনের নামে এটি ছিল একটি প্রহসন মাত্র, আইনের কোন ভিত্তি সেখানে ছিল না, তাই সেটাকে আদালত বলা যায় না। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই আমি আসামি সকলকে খালাস করে দিয়েছি। অন্য কোন কারণে নয়। এখানে ভুল বোঝাবুঝির কোনও স্থান নেই।"

তবে এটা ঠিক যে, ড. পাল নির্দোষ রায় দিয়ে জাপানের অপহৃত গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা সচেতন জাপানিরা আজও স্বীকার করেন। তিনি কট্টোর জাতীয়তাবাদী জাপানিদের শুষ্ককণ্ঠ জলাসিক্ত করেছিলেন। পাশাপাশি মার্কিনী, য়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গ শক্তির মুখোশ খুলে দিয়ে বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এই রায়ের পরপরই তিনি দুবার বৃদ্ধ বয়সে জেনেভাস্থ শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক আইন সভার সম্মানীত চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়েছিলেন। আপন মাতৃভূমিতে শ্বেতাঙ্গদের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বরাবরই প্রতিবাদী ছিলেন তিনি। সেই আত্মচেতনা এই বিচারের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

তার পরের বছর ১৯৫৩ সালেও তিনি শিমোনাকার আমন্ত্রণে জাপান সফর করেন য়োকোহামা নগরে এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত ওকুরায়ামা সেইশিন কাগাকু কেনকিউজো (ওকুরায়ামা স্পিরিচুয়াল সায়েন্স রিসার্চ সেন্টার) কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে। এখানে তিনি জাপানশীর্ষ ভারততত্ত্ববিদ ড. হাজিমে নাকামুরাসহ 'প্রাচীন ভারতীয় আইন-দর্শন

বিদ্যা' এবং 'ভারতীয় দর্শন' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৯৫৫ এবং ১৯৫৭ সালে ইয়াসাবুরো শিমোনাকা ভারত সফর-কালে তাঁর মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ্ এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে পরিচিত হন। এশিয়ার শান্তি বিষয়ে নেহেরুর সঙ্গে তিন ঘন্টাব্যাপী আলোচনা করেন। জাপানের শান্তির দূত হিসেবে তাঁর পাকিস্তান, ইরান, সিরিয়া, লেবানন, মিশর, শ্রীলংকা বার্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ সফর তাঁকে সত্যিকার অর্থে একজন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা অধিনায়কে উন্নীত করেছিল। এই রকম ব্যাপক শান্তিমিশন ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর কোন জাপানি সম্পাদন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তিনি একাধিক জাপানি সভা-সমিতি-সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বা চেয়ারম্যান ছাড়াও গ্রেট এশিয়া এসোসিয়েশন, গান্ধী এসোসিয়েশন-জাপান, পাকিস্তান এসোসিয়েশন-জাপান, ইন্টারন্যাশনাল ইয়ূথ হোস্টেল প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৬২ সালে জাপানে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপনের যে প্রস্তুতি পরিষদ গঠিত হয়েছিল তারও উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতের নানা বিষয়ে প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী বসু প্রমুখের গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত।

১৯৫৫ সালে তাঁর প্রভাবে কলকাতায় ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে তার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ড. রাধাবিনোদ পাল। তাঁর সঙ্গে আরও জড়িত ছিলেন তখনকার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. ত্রিগুণা সেন, প্রধান বিচারপতি ড. বি. মালিক, ইতিহাসবিদ ড. কালিদাস নাগ প্রমুখ। ১৯৫৪ সালে শিমোনাকার নেতৃত্বে টোকিয়োতে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৭ সালে কিয়োতো শহরে তৃতীয় এশিয়া শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবার এশিয়াসহ আফ্রিকার কতিপয় রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রতি শ্রীরাধাকৃষ্ণাণ্ এবং প্রধানমন্ত্রী নেহেরু কন্যা ইন্দিরাসহ জাপান সরকারের আমন্ত্রণে জাপানে এলে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাঁদের তত্ত্বাবধান করেন।

১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখে এই মহান শিক্ষাবিদ, একনিষ্ঠ শান্তিবাদী বীর পরপারে যাত্রা করেন। অন্যদিকে তাঁর মৃত্যুর পর

ড.পাল কলকাতায় ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট মুভমেন্টের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন। ১৯৬২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ১৯৬৬ সালে টোকিয়ো ট্রাইবুনালের সময় তাঁর সহযোগী জাপানি অ্যার্টনী জেনারেল ইচিরো কিয়োসে প্রমুখের আমন্ত্রণে চতুর্থবার জাপান সফর করেন সম্রাটের কাছ থেকে সর্বোচ্চ জাতীয় পদক 'পার্পল রিবন' গ্রহণ করার জন্য। একই সঙ্গে ইয়াসাবুরো শিমোনাকাও তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন স্বরূপ মরণোত্তর উপরোক্ত পদকে ভূষিত হন।

শোনা যায় প্রাক্তন বিচারপতি ড. পালের অবদান স্বরূপ বর্তমান রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী ভারতীয় বিশাল দূতাবাসের জায়গাটি ভারত সরকার উপরি পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে জাপান সরকারের কাছ থেকে। এই মহান দেশপ্রেমী কর্মবীর ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখে কলকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করেন।

এই দুজন ব্যক্তিত্বের পরিত্যক্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পোশাক, চিঠি, আলোকচিত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি সংরক্ষণকল্পে কানাগাওয়া-জেলার হাকোনে শহরের এক নয়াভিরাম নির্জন পাহাড়ের কোলে ১৯৭৪ সালে দুজনের শিষ্য মাসাআকি তানাকার উদ্যোগে হেইবোনশা পাবলিশার কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে 'পাল-শিমোনাকা স্মৃতিশালা'। ভারত ও জাপানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পরিদর্শনে যান বিশেষ বিশেষ দিনে।

শান্তিনিকেতন এবং ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ জাপানে সমার্থক, প্রবীণদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। ১৯১৩ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি আর কোন দেশে হয়নি। কিন্তু তাঁকে ছাড়িয়ে ড. পাল উপচে উঠেছেন জাপানিদের চেতনার সমুদ্রে। এখনো যে সকল গবেষণা বা স্মৃতিকথা যুদ্ধ ও টোকিয়ো ট্রাইবুনাল সম্পর্কে প্রকাশিত হয় তাতে তিনি প্রসঙ্গায়িত হন শ্রদ্ধার সঙ্গে। টোকিয়োর চিদোরিগাফুচি শহরে অবস্থিত জাতীয় যুদ্ধ বিষয়ক যাদুঘরের দেয়ালে তাঁর বিশাল ছবি শোভা পাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে কিয়োতোর হিগাশি ইয়ামায় অবস্থিত 'শোওয়া নো মোরি' শীর্ষক পবিত্র ভূমিতে ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্মরণে তাঁর একটি সুদৃশ্য স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে। জাপানের প্রথম সারির ৮২টি বৃহৎ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা

করেছে। টোকিয়োতে রাজপ্রাসাদ এবং ভারতীয় দূতাবাস সংলগ্ন শিনতো মন্দির 'ইয়াসুকুনি জিনজা'র অভ্যন্তরেও তাঁর স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়েছে

তথাপি, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আজকের তরুণ প্রজন্ম ছাড়াও পঞ্চাশোর্ধ জাপানিরা এই দুই মনীষীর কথা জানেন না বললেই চলে। তাঁদেরকে এইসব ইতিহাস জানানো হচ্ছে না। আজ ভুলেও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ড. পাল সম্পর্কে পড়ানো হয় না। গণমাধ্যমেরও তাঁর সম্পর্কে উদাসীনতা আমাদেরকে বিস্মিত করে! বিস্মিত হই যখন হিরোশিমাকে কেন্দ্র করে শান্তি বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করা হয় তখন তাঁর নাম, শিমোনাকার নাম কিংবা তাঁদের প্রচেষ্টায় একদা যে শান্তি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এখানে সেই ইতিহাসও স্মরিত হয় না দেখে! কেন এই বিস্মরণ তার কোন জবাব আজকের জাপানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড্ড বেদনাদায়ক এই উদাসীনতা, বিস্মরণ এই জাতির!

বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমাঘাতপ্রাপ্ত বর্তমান জাপান যে শান্তিবাদী ভূমিকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত তারও ফাটল ধরছে ক্রমশ উত্তর কোরিয়া ও চীনের সঙ্গে বিরাজমান স্নায়ুযুদ্ধের কারণে। প্রধানমন্ত্রীর 'ইয়াসুকুনি জিনজা' পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক জাপানবিরোধী দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনের 'জাতীয়তাবাদী' প্রকাশ্য বিক্ষোভ জাপানের নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ বলে মনে করছেন অধিকাংশ জাপানি নেতৃবৃন্দ। চীনের সামরিক শক্তি জোরদার করাকেও জাপান সহজ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে না। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক লড়াইও পুরনো এক অস্বস্তি। যুদ্ধবিরোধী রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকার যুদ্ধসংক্রান্ত উদ্যোগের আর্থিক সমর্থন যোগানোও তার জন্য নীতিবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচিত, প্রকম্পিত জাপান সচেতন শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর তীক্ষ্ণ শীতল দৃষ্টির তলে। ফলে জাতীয়তাবাদী একদল রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীমহল ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করছেন আমেরিকা-তৈরি সংবিধানে রদবদল এনে নিরাপত্তার জন্য মিত্রশক্তি আরোপিত সাংবিধানিক 'অস্ত্র তৈরি, আমদানি এবং প্রয়োগ' এই নিষিদ্ধ বিধিবিধানকে মুছে ফেলে 'সংবিধানসিদ্ধ' করে তোলার জন্য। জাপান যদি অস্ত্র উৎপাদন করে আমেরিকা প্রকাশ্যে কোন আপত্তি করবে

না--এই অভয় প্রদান করলেও তাদের অন্তরাত্মার ভিতরে তা কখনোই সমর্থিত হবে না। কেননা আমেরিকা-সৃষ্ট আজকের জাপান বহুদিক দিয়ে প্রভুকে ছাড়িয়ে গেছে। জাপানকে হাতের মুঠোতে ধরে রাখার মার্কিনী ছলচাতুরি বহু প্রাচীন। কিন্তু এই জাতিটির আত্মিক শক্তি অন্য জিনিস। যদি জাপান প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধিকল্পে মারণাস্ত্র তৈরি করে তবে সেটা শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই নয় তাবৎ বিশ্বের সমরাস্ত্রকে ছাড়িয়ে যাবে প্রযুক্তিগত কারণে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন অস্ত্র তৈরির অভিজ্ঞতায় জাপানি কতিপয় ভারীশিল্প ও প্রযুক্তিসংস্থা যুদ্ধপূর্বকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। তারা বহুকাল ধরে অস্ত্র উৎপাদন করে আসছে বাণিজ্যিকভাবে। ১৯৫০ এর কোরিয়া যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হয়েছিল জাপানেই এবং মার্কিন প্রশাসনের ফরমায়েশেই। প্রকৃতপক্ষে, এখান থেকেই জাপানের ধনী হওয়ার সূচনা। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমা 'লিটল বয়', 'ফেট বয়'-সৃষ্ট জিঘাংসা কি এই জাতির সকলেই ভুলে গেছে বা ভবিষ্যতে ভুলে থাকবে? কে বলতে পারে? এখনকার কাঁটাতার দিয়ে কি ভবিতব্যকে আটকে রাখা যাবে?

সময়ের দাবিতে, নুতুন ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়োজনে জাপান তার আরোপিত বর্তমান সাংবিধানিক শান্তিবাদী ভূমিকা ছিঁড়ে ফেলতে পারে। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ মানসচক্ষে দেখেছিলেন 'সভ্যতার সংকট' জাপানিদের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতায় আঘাত পেয়ে। কড়া মূল্য দিতে হয়েছিল তাই জাপানকে উক্ত দার্শনিকের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে। তিনি বেঁচে থাকলে হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞ দেখে কী ভাবতেন জানি না। কিন্তু আরেক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল হিরোশিমায় যা দেখেছেন তাতে থমকে গিয়েছিলেন ১৯৫২ সালে। হিরোশিমায় নিহতদের উদ্দেশে নির্মিত স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ তৎকালীন মেয়র শিনজো হামাই এর একটি বাণী ড.পালের মনে দারুণ সংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাণীতে বলা আছেঃ "ইয়াসুরাকানি নেমুত্তে কুদাসাই। আয়ামাচি ওয়া কুরিকায়ে-শিমাসেনু কারা.....।" বিচারপতি পাল এই বাণীটি তিন-তিনবার সঙ্গী এ.এম. নায়ারকে ভালো করে অনুবাদ করতে বলেন। অনুবাদকৃত বাণীটির কথাগুলো ছিল, 'নির্বিঘ্ন শান্তিতে তোমরা নিদ্রিত থাকো। (বোমা

ফেলার মতন) ভুল পুনর্বার ঘটতে দেব না........'। এটি শোনার পর তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করান এভাবে, 'আণবিক বোমা ফেলার মতন ভুলের ক্ষেত্র যে জাপানিরা সৃষ্টি করেননি সেটা পরিষ্কার। যারা বোমা ফেলেছেন তারাও অপরিচিত নন। কিন্তু তাদের হাত এখনো কলুষিত। ....তথাপি পুনর্বার ভুল সংঘটিত না করার অর্থ ভবিষ্যতে অস্ত্র গ্রহণ না করা। এটা ব্যতিক্রমী এক মহান সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি জাপান পুনরায় সমরাস্ত্র তৈরির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এটা হবে এইসব উৎসর্গীত প্রাণের পবিত্র আত্মার প্রতি নির্মম অবমাননা, চরম বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন'।

হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণকে সাম্প্রতিককালে কোন কোন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি রাজকীয় সেনাবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'ঐশ্বরিক শাস্তি' বলে অভিহিত করছেন (দি ডেইলি য়োমিউরি ১৭.৭.২০০৩)। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে লক্ষ লক্ষ নিরীহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে পাকিস্তানী হানাদাররা নির্বিঘ্নে স্বদেশ ফিরে যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের উপর ঐশ্বরিক কোন শাস্তি বর্ষিত হয়েছে বলে জানা নেই। ভারত শাসনকারী ইংরেজদেরও হয়নি। আফ্রিকা শোষণকারী ফরাসী, বেলজিয়ানদেরও কিছু হয়েছে বলে পড়িনি, শুনিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার এ্যাপার্টহেইট (Aparthcid) বর্ণবৈষম্যবাদী ইংরেজদের উপর শাস্তির ধ্বজা ভেঙ্গে পড়েছে কি? তা না হয়ে থাকলে একই অপরাধের জন্য শুধুমাত্র জাপানিদের উপর এই শাস্তি নেমে আসবে কেন? তার যেমন কোন যুক্তি নেই, তেমনি তার অর্থ খোঁজাও বৃথা। তাই ঐশ্বরিক শাস্তির বিষয়টি যে অবাস্তব-মনগড়া-কুসংস্কারাচ্ছন্ন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু হিরোশিমা-নাগাসাকি আজ জ্বলন্ত ইতিহাস! হিরোশিমা-নাগাসাকি শান্তিতে ঘুমুতে চায়। শান্তিতে জীবন যাপন করতে চায় প্রতিটি সাধারণ নাগরিক। কেন্দ্রীয় সরকার যতই বর্হিবিশ্বের আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে সমরাস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করুক, শান্তিরক্ষার কর্মী হিসেবে রাজপথে জাপানিরা নামতে রাজি নন, সেই নেতৃত্বও নেই। নেই ইয়াসাবুরো শিমোনাকার মতন আজন্ম 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' মতাদর্শী। নেই শান্তিবাদী বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল। নেই বিশ্বশান্তিবাদী

আন্দোলক রাজামহেন্দ্র প্রতাপ। তাঁরা আজ ইতিহাস কিন্তু জাপান-ভারত-বাংলাদেশের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে তাঁদের স্থান নেই! সে এক নিদারুণ পরিহাস! হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে হিরোশিমা-নাগাসাকিও থাকবে না বরং আরও হিরোশিমা-নাগাসাকি এশিয়াতেই সৃষ্টি হয়ে যাবে! হতে পারে আমেরিকায়! ইরাকে! হতে পারে য়োরোপে! সেই নির্ঘাৎ ধবংসযজ্ঞের ভ্রুণ সৃষ্টি করছে না অন্তরালে থেকে ইতিহাস কে বলতে পারে?

১০০ বছর আগে ১৯০২ সাল থেকে 'এশিয়া এক' (Asia is One) এই মতবাদের জাপানি প্রবক্তা, শিল্পকলার ইতিহাসবিদ তেনশিন ওকাকুরা এবং নোবেল বিজয়ী শান্তিবাদী কবি রবীন্দ্রন্নাথ ঠাকুরের যৌথ প্রচেষ্টার উদ্বোধন হয়েছিল বৃহত্তর এশিয়ার শান্তি, সংস্কৃতি ও প্রাচ্য দর্শনকে রক্ষাকল্পে। কিন্তু ওকাকুরার নিজের দেশকেই চীন-আক্রমণ থেকে বিরত রাখা যায়নি! হয়তো বা ইতিহাসের প্রয়োজনেই বৃটিশদের ভাষায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলি, মার্কিনী ভাষায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ বলি আর জাপানি ভাষায় দাইতোয়া ছেনসো (মহাএশিয়া যুদ্ধ) বলি সংঘটিত হয়েছে।

তবুও শান্তিবাদ---তার আন্দোলনের ইতিহাসও তো সুপ্রাচীন। নতুন ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়োজনেই যদি এশিয়ার শান্তিরক্ষার্থে হিরোশিমা-নাগাসাকিকে কেন্দ্র করে আমরা দলমত, জনমত, ধর্মমত নির্বিশেষে আন্দোলনে একত্রিত হই হয়তো বা অনাগত ধ্বংসযজ্ঞকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। আর এই তৎপরতার প্রথম পদক্ষেপটি হতে হবে হিরোশিমা দিবসকে "আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং এই দুই শহরে সংঘটিত আণবিক বিস্ফোরণের প্রকৃত ইতিহাস শিশু ও তরুণ প্রজন্মের জন্য ইতিহাসগ্রন্থে বাধ্যতামূলক পাঠ্য করে তোলা। এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তিরক্ষার্থে এটাই হবে হিরোশিমার প্রধান ভূমিকা। এই প্রস্তাবটি আমি গত ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৩, জাপানের ঐতিহ্য গবেষক.লেখক য়োশিআকি হারা মহাশয়ের 'Heroes of the Indian Independence and Japanese' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে তুলে ধরেছি। উপস্থিত বেশ কয়েক জন জাঁদরেল জাপানি ন্যাশনালিস্ট যাঁরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পালের অনুসারী এবং সমর্থক---নড়ে চড়ে উঠেছিলেন।

জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়!

জাপানি সংস্কৃতির হৃদকম্পন মহাএশিয়ার বৃহত্তর সংস্কৃতির তরঙ্গে তরাঙ্গায়িত। তার প্রমাণ এ দেশীয় সংস্কৃতির জাদুঘরে প্রত্যক্ষিত বাংলাদেশ-ভারতের 'কুলা', 'মই', 'ঢেঁকি' প্রভৃতি যা এখন গ্রামীণ ঐতিহ্য হিসেবে পর্যটন-নগ[illegible] অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে

原文
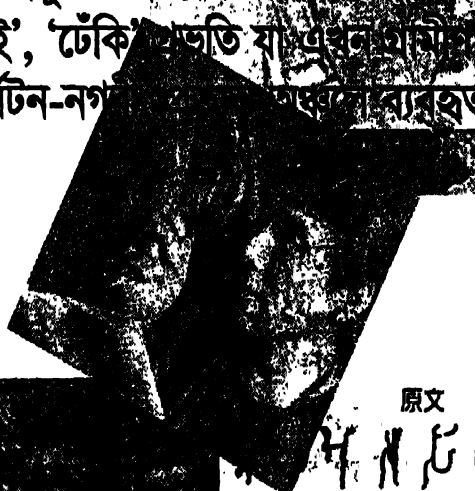
アヒルクサ文字

音

メ ハ ハ キ サ リ モ ロ ム

翻字

めはは 幸 守 宝

জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়।

মানুষ মাত্রই তার জাতিগত উৎপত্তির ইতিহাস জানতে চাইবে এটা খুবই স্বাভাবিক। জাপানিদের বেলায়ও তাই। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণেই হোক অথবা স্বাভাবিক কৌতুহলের বশেই হোক, বুদ্ধিজীবী এবং কৌতুহলী সাধারণ জাপানিরা আজকে নিজেদের জাতিগত উৎপত্তির খোঁজে চষে বেড়াচ্ছেন স্বদেশ বিদেশ। ব্যয় করছেন অঢেল পয়সা।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণা এবং আবিষ্কৃত নতুন তথ্যাদি থেকে জাপানি জাতির উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু কোন তথ্যই বুদ্ধিতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে নয় বলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক কেইচি ওমোতো রক্তের শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'ইয়ামাতোগোত্র' যাঁরা পঞ্চম শতাব্দীতে জাপানি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা ছিলেন মিশ্রজাতির মানুষ। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত ও স্থানীয়দের সংমিশ্রণে তাঁদের জন্ম। স্থানীয়রা জাপানের পূর্বপুরুষ বলে তাঁর ধারণা। ওমোতোর গবেষণার মূল ভিত্তি বা বিষয় ছিল দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা জাপানিদের রক্তের 'হ্যাপ্‌টোগ্লোবিন' (Haptoglobin) এবং রক্তের জলীয় ভাগের GC-শ্রেণীর আমিষ উপাদান। এবং অন্যান্য তথ্যসূত্রেরও সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছেন।

জাপানের সবচেয়ে প্রাচীন মানব ফসীল আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৮ সালে। যার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩২,০০০ বছর। কিন্তু জাতিতত্ত্বের দিক দিয়ে তা জাপানি পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে জাপানিদের পূর্বপুরুষরা উত্থিত হয়েছিল আজ থেকে ১০,০০০ হাজার বছর পূর্বে, যাদেরকে বলা হয় 'জমনগোষ্ঠী'। তারা ছিল বহিরাগত এবং জমন-সংস্কৃতির স্রষ্টা। তারপর 'ইয়ায়োই' যুগে (খৃঃপূঃ২৫০-খৃঃ ২৫০) তাদের শারীরিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তারাই আজকের আধুনিক জাপানির বংশধর বলে একদল গবেষক মনে করেন। অন্যদিকে ওসাকা চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিদেও মাৎসুমোতো, তিনিও গত কয়েক দশক ধরে একই বিষয়ে গবেষণা করে আসছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি তাঁর গবেষণায় দেখান যে, জাপানিদের

রক্তের ab3st জিন্ দ্বারা প্রমাণিত হয় জাপানিরা মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত। গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায় মঙ্গোলীয় জাতিদলের মধ্যে চারটি Gm জিন্ রয়েছে যেমন ag, axg, ab3st এবং afb1b3. তার মধ্যে সাধারণ মঙ্গোলীয়রা প্রধাণত দুটি জিনে বিভক্ত। উত্তরাঞ্চলীয়দের মধ্যে জাপানি, কোরিয়ান, তিব্বতী, মূল সাইবেরিয়ান এবং আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা তাঁরা ag এবং ag3st জিন্ভুক্ত। আর দক্ষিণাঞ্চলীয়দের মধ্যে চীনারা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয়রা তাঁদের রক্তের মধ্যে কাজ করছে afb1b3 জিন্।

অন্যদিকে রক্তের শ্বেতকণিকা নিয়ে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম গবেষণা করে দুজন বিজ্ঞানী জুন ওওহাশি এবং কাৎসুশি তোকুনাগা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

ক) মূলভূখন্ডের জাপানি অধিবাসীরা চীন থেকে কোরিয়া উপত্যকা হয়ে অথবা কোরিয়ো দ্বীপাঞ্চল থেকে সরাসরি জাপানে প্রবেশ করেছে এমন জনগোষ্ঠীর প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খ) আইনুদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণাঞ্চলীয় চীনাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

গ) রিউকিউ দ্বীপ (ওকিনাওয়া) এর অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ এবং আইনুদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। তবে ইয়ায়োই যুগ থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় চীনাদের জাতিগত প্রভাব জাপানিরা প্রচন্ডভাবে গ্রহণ করেছেন বলে মনে করেন।

মিটোকনডোরিয়াল ডিএনএ (Mintochondrial DNA) এর মাধ্যমে ২০০১ সালে গবেষক কেনইচি শিনোদাকে জমন ৫৪ এবং ইয়ায়োই ৪১ জনের জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে বলেছেন, জাপানের মূল ভূখন্ডের এক বিশাল জনগোষ্ঠী ইয়ায়োই যুগে এশিয়া থেকে আগত মানবজনের সংমিশ্রণে জন্মলাভ করেছে। সেইসঙ্গে তারা আইনু, রিউকিউ জনগোষ্ঠী এবং মঙ্গোলীয় রক্তের সঙ্গেও সংম্পৃক্ত। তবে তাঁর পরীক্ষায় ঐ জীবাশ্মগুলোর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগোষ্ঠীর কোনও জাতিগত ধারার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আমেরিকান গবেষক এম. হ্যামার (M.Hammer) এর গবেষণায়

জাপানিদের ওয়াই-ক্রোমৌসৌম (Y-Chromosome) থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন হেপলোটাইপ (Haplotypes) অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, জমন জনগোষ্ঠীর মূল প্রোথিত রয়েছে মধ্য এশিয়ায় এবং ইয়ায়োইদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোক।

আবার অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন সাইবেরিয়ার 'লেক বাইকাল' (Lakc Baikal) থেকে জাপানিদের পূর্বপুরুষরা এদেশে এসেছিলেন। এই বিষয়ে NHK (নিপ্পন হোসো কিয়োকাই=জাতীয় বেতার ও টিভি সম্প্রচার কেন্দ্র) একটি তথ্য ও নিদর্শনবহুল 'Long Journey to Prehistoric Japan' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজনও করেছে ২০০১ সালে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত। কিন্তু তারও কোন সমর্থিত প্রমাণ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এমনি আরও অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা, গবেষণামূলক তথ্য ও সংবাদ রয়েছে। রয়েছে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক। জাপানি জাতির মূল উৎপত্তি সম্পর্কে প্রকৃত সিদ্ধান্ত এখনো অপেক্ষমান ভবিষ্যতের ঘরে।

কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়েও জাতিগত উৎপত্তির শিকড় অনুসন্ধান করা সম্ভব। এই নিয়েও ধারণা করা হয় যে, জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন। অবশ্য এই ধারণাকে জাপান ও ভারতবর্ষে প্রাপ্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা অনেকেই সঠিক বলে স্বীকার করেন। তাছাড়া জাতিগত এবং মনোস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এই মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অ্যালান রোল্যান্ড এর 'IN SEARCH OF SELF IN INDIA AND JAPAN, Toward a Cross-Cultural Psychology' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। লেখক তাঁর গ্রন্থে দুদেশের কয়েকটি বিষয় সাংস্কৃতিক মনোস্তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন ভারতে ও জাপানে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এবং পুরো পরিবারই একটি বর্ণ বা জাতি বা বংশের প্রতীক। ভারতে তাকে বলা হচ্ছে 'জাতি' আর জাপানে বলা হচ্ছে 'ইয়ে' অর্থাৎ পরিবার বা বংশ। যা পাশ্চাত্যে খুব বেশি লক্ষ করা যায় না।

সাংস্কৃতিক দিক থেকেও প্রতিটি জাতির উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া

সম্ভব--এই প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে গত শতাব্দীর শেষদিকে জাপানিদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কতিপয় কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন য়োশিনোরি তাকাহাশি, বিশ্বসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক। তিনি দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কার করেন জাপানি জাতির পূর্বপুরুষের মূল বাসভূমি। তাঁর আবিষ্কৃত প্রথম অভিযানের অভিজ্ঞতা, মতামত ও ধারণা নিম্নে উপস্থাপন করা গেল:

জাপানের প্রাচীন বর্ণমালার উৎপত্তি দক্ষিণ ভারতের পার্বত্যাঞ্চলে

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে চীনা ভাষা কানজি জাপানে আমদানি হয়। তার পূর্বে প্রাচীন যুগে জাপানের নিজস্ব কোন অক্ষর বা ভাষা ছিল কিনা তা আজও সুস্পষ্ট নয়। তবে প্রস্তরযুগে নির্মিত কোন কোন বৃহৎ ঘন্টা বা তলোয়ারে খোদিত যে নকশাকারে বর্ণমালা পাওয়া গেছে তা কি শুধুই নকশা নাকি কোন ভাষা তাও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তবে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এই নকশা বা বর্ণমালাকে যথাক্রমে নকশা বা পৌরাণিক বর্ণমালা বলে আখ্যায়িত করেছেন বটে তবে এখনো পর্যন্ত এগুলো এ দুটি ধারণার বাইরে 'অন্যকিছু' বলেও গভীরভাবে সন্দেহ জাগিয়ে রেখেছে। যদি এগুলো বর্ণমালাই না হবে, তাহলে সেই যুগের মানুষেরা কেন এরকম জটিল নকশা প্রস্তরে বা মৃতব্যক্তির জিনিসপত্রে খোদিত করেছিল? এই নকশাগুলো ঠিক চীনা কানজিও নয়, আবার নিছক নকশা বলে প্রতিভাত করার কোন লক্ষণও কোথাও বর্তমান নেই।

উদাহরণ স্বরূপ 'ইজ্জুমো জিন্‌গু' বা ইজ্জুমো শিনতো মন্দির এর কথা বলা যেতে পারে। সেখানে নারা যুগ (খৃ:৭১০-৭৯৪) থেকে শুরু করে এদো যুগ (১৬০৩-১৮৬৮) পর্যন্ত সংরক্ষিত পাথরখন্ডে কানজিও নয়, আবার অন্য কোন বর্ণমালাও নয় এমন সব অজানা অচেনা লিপি খোদিত আছে, যাকে 'আহিলুকসা' কিংবা 'ইজ্জুমোলিপি' বলে পন্ডিতরা চিহ্নিত করেছেন। এই বর্ণমালা থেকে জাপানের সঙ্গে অতিপ্রাচীনকালে ভারতীয় ও চীনা সভ্যতার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

অন্যদিকে আবার আইচি-জেলার আসাকুরা গ্রামের 'কিনোমোতো'

নামক প্রস্তরের তলদেশ থেকে উত্তোলিত একটি ঘন্টার গায়ে যে লিপি দেখা যায় তা মিশরীয় সভ্যতার হস্তীবিশিষ্ট আকৃতির বর্ণমালার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 'তোয়োকুনি'লিপি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে উপরোল্লিখিত নকশাগুলোও যে বিশেষ কোন ভাষার অনুশাসন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন 'নাজো নো শিনছেন শোজিরোকু' নামে তোকুমোন শোতেন প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকেও অদ্ভুত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাহল হেইয়ান যুগের (খৃ:৭৯৪-১১৮৫) প্রথম দিককার একজন সম্রাট সাগাতেন্‌নো একটি গ্রন্থ তৈরি করেন, যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তৎকালীন জাপানের প্রতিনিধিত্বকারী এক হাজার কয়েকশ' বংশের প্রথম পুরুষ--তাদের উৎপত্তিস্থান, বর্তমান বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য। গ্রন্থটি অত্যন্ত কঠিন চীনা কানজি দিয়ে লিখিত। তা সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা না গেলেও উক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্যগুলোর মধ্যেই যে জাপানি জাতির উৎপত্তির রহস্য লুকিয়ে আছে তাতে কোন দ্বিমত পোষণ করেন না গবেষক তাকাহাশি।

উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেছেন, যেমন জাপানে অত্যধিক প্রচলিত বংশ পদবী হিসেবে রয়েছে 'সুজুকি'। এই বংশের পূর্বপুরুষে 'ফুৎসুকুরো' 'দাইমেপু' প্রভৃতি অদ্ভুত সব নাম লক্ষ করা যায়। এইসব নাম কানজিতে না পড়ে ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় পড়লে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে: ফতেহ্‌গড় ও মহাবলিপুরম, যা কিনা ভারতের বিখ্যাত স্থানের নাম নির্দেশ করে। তাতে করে একটি শক্ত ধারণা জন্মলাভ করে যে, সুজুকি বংশের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষের এই সকল স্থান থেকেই জাপানে এসেছেন। উক্ত গ্রন্থে এরকম আরও উদাহরণ রয়েছে। তবে ব্যবহৃত কানজি অক্ষর শুধুমাত্র ছদ্মনামের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে তা এই জন্যে যে, প্রাচীন জাপানে গ্রীক ঈশ্বর-পুরাণে রূপান্তরিত করার জন্য মূল নামটিকে সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হত। যদিও নামের এরকম 'সংকেতায়িত' করার পদ্ধতির মধ্যে 'এ্যানাগ্রামে'র ব্যবহার ছিল প্রাচীনদের একটি অত্যন্ত উন্নতমানের কাজ। 'নাজো নো শিনছেন শোজিরোকু' নামক গ্রন্থের ভেতরে এরকম নামের এ্যানাগ্রামের পাঠোদ্ধার

অব্যাহত রেখে খোদিত ইতিহাস পাঠ করে দেখা গেছে জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতের 'কুরু'বংশের লোক ছিল, আর জাপানি পুরাণের স্বর্গভূমি ছিল দক্ষিণ ভারতের কোন এক পর্বত।

যাহোক, আমরা জাপানি ভাষার মূল উৎপত্তি ভারতবর্ষে ছিল কিনা তার সন্ধানে দক্ষিণ ভারতের বাজা ও কালোরা গুহা-মন্দির পরিদর্শন করি। এবং আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে সেখানে আমরা নির্ভুলভাবে জাপানে প্রবর্তিত প্রাচীন লিপিমালার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হই!

আমরা বোম্বে শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১২০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত বাজা গুহা-মন্দিরে প্রবেশ করি। এই মন্দিরটি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্যবংশরাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের ভিতরে ১৮টি গুহার মধ্যে এখনো সবচেয়ে ভালো অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন ১২ নম্বর গুহার ভিতরে ইয়েন (বৃত্ত) আকৃতির একটি স্তুপ দেখতে পাই। গুহার আকৃতিটি অনেকটা ঘোড়ার খুরের মতো। আমরা গুহার স্তম্ভের উপরের দিকে কিছু খোদিত বর্ণের সন্ধান লাভ করি। কিন্তু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই অজ্ঞাত বর্ণমালাকে 'আহিলুকসা' অক্ষরে প্রয়োগ করলে যে অর্থ দাঁড়ায় তা এরকম: 'মুরো মরি সাকি হামামে' অর্থাৎ 'এই গৃহ যে রক্ষা করবে তার উপরে শান্তি বর্ষিত হবে'।

এছাড়াও ১২ নম্বর গুহার দক্ষিণ দিকে ৫০ মিঃ দূরে অবস্থিত ১৪ নম্বর মূল স্তুপটি রয়েছে। তার বামদিকের গায়ে আরও কিছু বর্ণমালা আমরা লক্ষ করি। সেগুলো জাপানের মেইজি যুগের প্রথম দিকে 'টোকিয়ো নৃতত্ত্ব পাঠচক্র' নামক সাময়িকীতে 'হোক্কাইদো অজ্ঞাত লিপি' হিসেবে তুলে ধরা 'আইনুলিপি' ও 'তোয়োকুনিলিপি'র মিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। পাঠোদ্ধারকৃত লেখার অর্থ হচ্ছে: 'অন্যের পরিবর্তে মৃত্যু প্রার্থনা করি'। এছাড়া অন্যান্য স্তুপে খোদিত বর্ণমালাগুলো আইনুলিপিতে প্রয়োগ করে 'কালাবংশ' এই কথাটি উদ্ধার করা গেছে। এই সমস্ত শিলালিপির অর্থ বিবেচনা করলে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও জাপানে একই ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল বলে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ জাপানিদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষ থেকে জাপানে আগমন করেছিলেন এ কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে এসে যায়।

জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়।

বাজা পর্বত গুহার অদূরে, কালোরা গুহামন্দিরেও অনুরূপ লিপির সন্ধান আমরা পেয়েছি। মন্দিরের গভীরে অবস্থিত শিলাস্তম্ভের মাথায় দুজন তরুণ বয়সী দম্পতির নগ্নমূর্তি খোদিত রয়েছে। তার পাশে খোদিত বর্ণমালা 'তোয়োকুনিলিপি'র মাধ্যমে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। 'হিনি অ মে হোৎসু মুরো ৎসুকুরি ইনোচি অ উমু' কথাটি লেখা আছে, যার অনূদিত অর্থ হচ্ছে: 'এই তলগৃহটি নতুন দম্পতির সন্তান লাভের আতুড়গৃহ'। অর্থাৎ নতুন প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার কারণে এই গৃহটি স্বর্গীয় আতুড়ঘর হিসেবে পবিত্র। সেখানে এমনকি জাপানে প্রচলিত ধর্মীয় চিহ্ন 'মান্‌জি' আমরা আবিষ্কার করেছি। এখানে চমৎকার একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, ভারত উপমহাদেশের বহুস্থানে শিবমন্দিরে শিব দেবতার প্রতীক হিসেবে শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও এর প্রকৃত অর্থটি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই শিবলিঙ্গ প্রতীকটি 'তোয়োকুনি-লিপি'তে প্রয়োগ করলে 'শিব' উচ্চারণই দাঁড়ায়। অর্থাৎ হিন্দুদের তিনজন প্রধান দেবতার অন্যতম দেবতা শিব খ্রীস্ট পূর্বাব্দে জাপানিদের পূর্বপুরুদের্ও দেবতা ছিল এই কথাই নির্দেশ করে।

সাঁচি অঞ্চলের পশ্চিম দিকে ২০০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত প্রাচীন অবন্তী রাজ্যের (খৃ: পূ: ৪-৩ শতাব্দী) রাজধানী উজ্জয়িনী নগরের নিদর্শন কালিয়াদ প্রাসাদের (কালা রাজার প্রাসাদ) দেয়ালের গায়ে রাজদম্পতির মূর্তি খোদিত করা আছে। যাদের মুখচ্ছবির সঙ্গে রয়েছে সাধারণ জাপানিদের চেহারার বিস্ময়কর মিল! এছাড়াও সাঁচি শহরের বহিরাঞ্চলের একটি জায়গা বাজিপুরে অবস্থিত ভারতের সর্বোচ্চ বিশাল শিবমন্দিরের গায়ে যে যুগল নর-নারীর মূর্তি লক্ষ করা যায়, তার সঙ্গেও এই রাজদম্পতির মূর্তির হুবহু মিল বর্তমান! তাহলে কি অবন্তী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিল জাপানিদের পূর্বপুরুষরা? বস্তুত উত্তর হবে--হ্যাঁ। কেননা 'ইজুমো' শব্দটিকে উল্টো করে সাজালে 'উনাদে' হয়। 'উজ্‌জাইন' শব্দটির এ্যানাগ্রামে 'উন', 'জাজি' প্রয়োগ করলে 'উজ্জয়িন' অর্থ দাঁড়ায়। এভাবে দেখলে বাজা এবং কালোরার গুহামন্দিরের স্তূপে খোদিত লিপির রহস্য পরিষ্কার হয়ে আসে। অন্যদিকে বিশ্ববিজয়ী মহাবীর আলেকজান্ডার

এর ভারত অভিযানের সময় জাপানিদের পূর্বপুরুষগণ উক্ত বাজা ও কালোরা গুহামন্দির রক্ষাকল্পে সমাবেত হয়ে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করার পাশাপাশি গুহামন্দিরের দেয়ালে ঐ সকল পবিত্র ধর্মীয় অনুশাসন খোদিত করে গেছেন--এরকম ধারণা করাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে বাজা পর্বতগুহার মধ্যে আরও অনাবিষ্কৃত তথ্য ও নিদর্শন রয়ে গেছে, রয়ে গেছে সিন্ধু সভ্যতার রহস্য, পড়ে রয়েছে অন্যান্য প্রাচীন লিপিমালার দুর্বোধ্য ইতিহাস। ইত্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতরে জাপানিদের পূর্বপুরুষদের আরও পদচিহ্ন গোপন রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেসব উদঘাটনের লক্ষ্যেই আমরা আবার অচিরেই ভারতের দিকে যাত্রা করব।

য়োশিনারি তাকাহাশির গবেষণা ও তাঁর মন্তব্য

জাপানি ইতিহাস অনুযায়ী জাপানি ভাষার উদ্ভব মূলত চীনা কানজি থেকে। পরবর্তীকালে ভাষাগত সুবিধার্থে কানজি ভেঙ্গে মানয়ো গানা তারপর কানা অক্ষরের জন্ম হয়। ১৯৭৭ সালে ইজ্জুমো মন্দিরের পাথরে উৎকীর্ণ কিছু উৎসর্গ-বাণী আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রাচীন লিপির সত্যিকারের পাঠোদ্ধার কর্মসূচী এগিয়ে চলে। এবং বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, ইজ্জুমো মন্দিরে প্রাপ্ত ঐ বাণীগুলো যথাক্রমে 'আহিলুকসা' এবং 'ইজ্জুমো' এই দুই প্রাচীন লিপিতে লেখা হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কানজি কিংবা কানার সঙ্গে তাদের গঠনাকৃতির কোন মিল নেই। 'আহিলুকসালিপি' মূলত খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে প্রাচীন চীনদেশে ব্যবহৃত 'কোকোংসুলিপি' বা চীনা কানজির মূল কাঠামো লিপিরই অপর নাম, অর্থাৎ এই লিপির টানা লেখার বর্ণই 'আহিলুকসালিপি' নামে পরিচিত। ইজ্জুমো লিপি ২০০০ বৎসর পূর্বে শিমানে-জেলার ইজ্জুমো তাইশা শিনতো মন্দিরের অদূরে এক গুহায় আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কার থেকে এই বর্ণমালার নাম হয় 'ইজ্জুমোলিপি'। কিন্তু প্রাচীন কিংবদন্তী অনুযায়ী এই লিপি 'ইজানাগি মিকোতো'র চেয়ে আরও পুরনো কোন এক দেবতা কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে বলে সাধারণ মানুষের ধারণা।

জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়!

তাকাহাশি মনে করেন, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দিকে ভারতবর্ষে প্রচলিত 'খরোষ্ঠী' ও 'ব্রাম্মীলিপি'র সঙ্গে 'আহিলুকসা' ও 'ইজ্জুমোলিপি'র অনেক মিল রয়েছে এবং এই সূত্র মিশরীয় ভাষা এবং ইসরায়েলে ব্যবহৃত 'হিব্রুলিপি'র সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং জাপানি ভাষার ইতিহাসে উল্লেখিত চীনা কানজি যে একেবারেই নতুন তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না।

এছাড়াও তিনি 'নাজো নো শিনছেন শোজিরোকু' গ্রন্থ অনুযায়ী বিভিন্ন কিংবদন্তীর সন্ধান লাভ করেছেন। জাপানি পুরাণে দেবতারা 'তাকামানোহারা' তথা স্বর্গে অবতরণ করার জন্য 'হোরাই' পর্বতটিকে নির্ধারণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সেই 'হোরাই' পর্বতটি ছিল দক্ষিণ ভারতের 'রাকাজুয়াল' পর্বত। 'রাই' নামক শব্দটির প্রতিশব্দ 'আকাজা' যার অর্থ ঔষুধিবৃক্ষ। তাহলে 'হোরাই' শব্দটিকে বদলে দিলে 'হো আকাজা' দাঁড়ায়। 'রাকাজুয়াল' শব্দটি 'আকুজোহাও' এমনকি কোন কোন স্থানে 'আকাজাহো' হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

জাপানি পুরাণমতে আরও জানা যায়, 'তাকামানোহারা'র শীর্ষ দেবতা 'তাকাগিনোকামি' রাজা 'তেনশিতাহারাঅ' (টোটেন খামেন এর জাপানি নাম) এর মৃত্যুর পর মিশরের ফারাও হন এবং ঘটনাক্রমে পরবর্তীকালে ভারতে পলায়ন করে কুরু (কালা)বংশ এবং কুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশধরদের কথাই পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্য 'মহাভারতে' বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'মহাভারতে' বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনী পুরাণভিত্তিক 'ইজানাগি-ইজানামি' দেবযুগের পূর্বে লিখিত ইতিহাসের মধ্যেও পাওয়া যায়। এছাড়াও বর্তমানে হোক্কাইদো দ্বীপে বসবাসরত জাপানের প্রাচীন অধিবাসী 'আইনু'দের রচিত 'য়ুকালা' রচনার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে বলে গবেষক তাকাহাশির অভিমত।

তাকাহাশির দ্বিতীয় ভারত-অভিযান সম্পর্কে জানা যায়নি কিন্তু নতুন তথ্য আবিষ্কার করে থাকবেন তাতে সন্দেহ দেখি না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত হয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ যেখানে গিয়েছে তার মননের সঙ্গে বাহিত হয়েছে ভাষা, সংস্কৃতি আর ব্যবহারিক পণ্যসামগ্রী-হাতিয়ার। আফ্রিকা থেকে হোমো

সেপিয়ান তথা আজকের মানবজাতির প্রথম বংশধররা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল আজ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই বংশধররা পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের তাগিদে ভাগাভাগি হয়েছে। তাদের একটি ভাগ এশিয়া মহাদেশের সবুজ তৃণভূমির দিকে অগ্রসর হয়েছে। আবার তাদের বংশজাত সন্তানরা চীন, ভারতবর্ষে এসেছে। একদিন ভারতবর্ষ থেকে সেই রক্ত-মানুষের ধারা জাপানের ভূমিতে সম্প্রসারিত হতেই পারে। নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক প্রাচীনত্ব--তার ঐতিহ্য, রীতিনীতি স্থানীয় স্রোতে সংমিশ্রণ ঘটলেও কিংবা ক্ষয়িত হলে পরেও কিছুটা থেকে যাবেই। আজকের জাপানি-সংস্কৃতির হৃদকম্পন মহাএশিয়ার বৃহত্তর সংস্কৃতির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। অস্বীকার করার কোনও পথ নেই। বড় প্রমাণ তো জাপানি-সংস্কৃতির জাদুঘরে প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাচীনকালে ব্যবহৃত 'কুলা', 'মই', 'ঢেঁকি' প্রভৃতি যা এখনো গ্রামীণ ঐতিহ্য হিসেবে পর্যটন-নগরী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব বাংলাদেশের গ্রামে ছেলেবেলায় আমি দেখেছি। নিশ্চয়ই ভারতের গ্রামাঞ্চলেও এখনো আছে।

জাপানি ভাষা বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণার কথাই যদি বলি, তাহলে তুলে ধরতে হবে প্রবীণ জাপানি ভাষা বিশেষজ্ঞ সুসুমু ওওনোর গবেষণার প্রসঙ্গ। তিনি গত ৪০ বৎসরেরও অধিক সময় গবেষণা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, জাপানি ভাষার উৎস হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের 'তামিল' তথা দ্রাবিড় ভাষা! বহু বছর ধরে জাপানি পন্ডিতসমাজ তাঁর এই অভিমত এড়িয়ে গেছেন যা সম্প্রতি স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করেছে অভিজ্ঞ মহলে।

অন্যদিকে জাপানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক.শিক্ষাবিদ বৌদ্ধধর্মপন্ডিত এবং বিদেশী ভাষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. জুনজিরো তাকাকুসুর 'What Japan owes to India' প্রবন্ধ থেকেও জানা যাচ্ছে যে, "But I should like to emphasize the fact that the influence of India, material and intellectual, must have been much greater in an earlier period than we at present consider to have been the case. There were, for instance, several Indians, whom the Kuroshiwo current, washing almost the whole soutren coast, brought to the Japanese shore."

মহাএশিয়া! প্রজ্বলিত চোখঃ তোয়ামা মিৎসুরু এবং গেনয়োশা

অনেকে বলেন তোয়ামা মিৎসুরু জাপানি ইয়াকুজা-দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেটা ভিন্ন কাহিনী। যুদ্ধোত্তরকালে তাঁকে ইয়াকুজাদের সঙ্গে এককরে ফেলা হয়েছে

জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়।

আবার অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন, "It cannot be denied that several Indians came to Japan, especially in view of so many Indians finding their way to China by sea."

উপরোক্ত প্রবন্ধের আরও এক জায়গা থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত বোধিসেন ভরদ্বাজ আরেকজন পুরোহিতসহ 'চম্পা' (বর্তমান ভিয়েতনাম) হয়ে ওসাকা তারপর নারা এসে পৌঁছেন। সেখানে এসে তিনি আরেকজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। যিনি জাপানিদেরকে সংস্কৃত ভাষা শেখাচ্ছিলেন। ড. তাকাকুসু তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন, "His monastery and tombstone, with a written eulogy, still exist in Nara, Just at the time a Japanese alphabet or syllables is said to have been invented. The fifty syllables, Gojuin, are arranged by a hand, evidently with practical knowledge of Sanskrit method. "

অদূর ভবিষ্যতে সংস্কৃতি গবেষক য়োশিনোরি তাকাহাশির গবেষণাও স্বীকৃতি অর্জন করবে। এটাই ইতিহাসের কাজ। ইতিহাস কাজ করে গোপনে গোপনে।

তথ্য সংগ্রহ:

ক. দি ডেইলি য়োমিউরি

খ. দি ডেইলি জাপান টাইমস্

গ. টোকিয়োশিম্বুন

ঘ. মাসিক মানচিত্র

ঙ. Indo-Japanese Association Journal, January, 1910

....

* ১৯৯২ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত

* আলোকচিত্র: হেইবোনশা পাবলিশাব; সাপ্তাহিক স্পা এর সৌজন্যে

অতীত অপ্রতিরোধ্য এক ঝড়োহাওয়া। অতীত স্মৃতি হয়ে অথবা কোনও না কোনও সূত্র ধরে বাতাসের মতো সে ফিরে ফিরে এসে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা পুলকিত হই, হই আশান্বিত কিন্তু প্রেরণা লাভ এবং শিক্ষা গ্রহণ করি একমাত্র অতীত থেকেই। অতীতের জনমানুষ এবং ঘটনাসমূহ কখনও কখনও দুঃখময়, বেদনাবহ হলেও কম রোমাঞ্চকর নয়। যদি তা ইতিহাস সৃষ্টিকারী অসামান্য কিছু হয়ে থাকে।

একুশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে দাঁড়িয়ে যদি আমরা আজকে বিগত বিংশ শতাব্দীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবি অবশ্যই সেটা রোমাঞ্চকর না হয় শিহরণমূলক হয়ে দেখা দেবে আমাদের মানসে। বিগত একশ বছরে বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার জন্ম হয়েছে এই এশিয়া মহাদেশেই। এই জাপানে, ভারতে, চীনে। বিংশ শতাব্দীর তেমনি এক রোমাঞ্চকর যুগের স্মরণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে জাপানের অন্যতম প্রাচীন, জাতীয় এবং বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারবহুল দৈনিক সংবাদপত্র বলে কথিত 'য়োমিউরিশিম্বুন' (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রধান দপ্তর) ২০০১ সালে। 'দাইআজিয়া! মোয়েয়ুরু মানাজাশি: তোয়ামা মিৎসুরু তো গেনয়োশা' অর্থাৎ 'মহা-এশিয়া! প্রজ্বলিত চোখ: তোয়ামা মিৎসুরু এবং গেনয়োশা'।

তোয়ামা মিৎসুরু এক কিংবদন্তী-পুরুষ জাপানি আধুনিক রাজনীতির ইতিহাসে। গণমুক্তি আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা, বিখ্যাত গুপ্ত রাজনৈতিক সংস্থা 'গেনয়োশা' (Black Ocean Society)-র প্রতিষ্ঠাতা এবং এশিয়াবাদের ঘোর সমর্থক। শুধু রাজনৈতিক মহলেই নয় তাঁর প্রভাব ছিল তৎকালীন উদীয়মান সামরিক শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সর্বত্রব্যাপী। তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন রাশিয়ার পলাতক অন্ধকবি ভাসিলি এরশেনকো, চীনের বিপ্লবী. চিন্তাবিদ. জাতীয়তাবাদী নেতা সোনবুন, কোরিয়ার বিপ্লবী নেতা কিন গিয়োকুকিন তথা কিম ওককিউন, ফিলিপিন্সের জাতীয় সংগ্রামী নেতা এমিলিও এগুইনালডো, ভারতের বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু, হেরেম্বলাল গুপ্ত প্রমুখকে তৎকালীন বৃটিশের মিত্র জাপানি সরকারের আইন ও রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে এসকল এশীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে মিলে তোয়ামা বৃটিশ

তথা পাশ্চাত্য সম্রাজ্যবাদকে এশিয়া থেকে বিতাড়িত করে শান্তিপূর্ণ, ভাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী "এক এশিয়া" গঠনের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে 'গেনয়োশা' সংস্থার ছিল গভীরতম সম্পর্ক। শ্বেতাঙ্গশক্তি কর্তৃক পদদলিত এশিয়ার মহামুক্তি আন্দোলনের যে রক্তাক্ত ইতিহাস আজ বিস্মরণের তলে তলিয়ে যাচ্ছে তা যদি কোনদিন পূর্ণাঙ্গভাবে রচিত হয় তাহলে তোয়ামা মিৎসুরু এবং গেনয়োশা গুপ্তসংস্থার যথার্থ মূল্যায়ন হবে।

বিংশ শতকের জাপানের প্রখর জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং শিল্পকলার পন্ডিত তেনশিন (কাকুজো) ওকাকুরা (১৮৬২-১৯১৩)-র দর্শন থেকে উদ্ভাসিত 'Asia is One'এই আপ্তবাক্য দ্বারা গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন বহু জাপানি চিন্তাশীল লেখক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা। একসময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেনশিনের মতাদর্শের সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করেছিলেন। উপরোক্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দও ঐ দর্শনে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তোয়ামা জাপানে পলাতক ঐ সকল বিপ্লবীদের শুধু আশ্রয়ই দেননি, স্বদেশকে শ্বেতাঙ্গদের দখল থেকে মুক্তি করার লক্ষ্যে তাঁদের নেতৃত্বকেও সাহস, সাহায্য, সহযোগিতা দিয়েছেন। বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে তোয়ামার অবদান অনস্বীকার্য---কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ভারতের জাতীয় ইতিহাসে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ হয়নি।

জাপানে ১৯২৪ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তোয়ামা মিৎসুরুর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই দুর্লভ ছবি ধারণ করা আছে তোয়ামার পারিবারিক প্রকান্ড অ্যালবামে। প্রদর্শনীতে এটাও গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। এরকম প্রায় ২৫০টি স্মারক বস্তু প্রদর্শনীতে সন্নিবেশিত হয়ে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই সকল বস্তুর মধ্যে ছিল তোয়ামার স্বহস্তে লিখিত মন্তব্য, পত্র, আলোকচিত্র, ব্যবহৃত সামগ্রী; গেনয়োশার সদস্য, কর্মী, কর্মকর্তাদের আলোকচিত্র, দলিলপত্র ইত্যাদি। প্রদর্শনীতে তোয়ামা মিৎসুরুর জীবনভিত্তিক একটি ভিডিও চলচ্চিত্রও সর্বক্ষণ প্রদর্শিত হয়।

প্রদর্শনী আরম্ভ হয় অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে চলে ২১ তারিখ পর্যন্ত। প্রদর্শনীস্থল ফুকুওকা শহরের জাতীয় শিল্পকলা ভবন। তাতে প্রায়

৮০০০ দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। যাঁদের অনেকেই ছিলেন বয়স্ক ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আত্মীয়-স্বজন। অনেক বিদেশীও আগ্রহ সহকারে প্রদর্শনীটি উপভোগ করেন। আগতদের অনেকেই বলেন, "এই প্রদর্শনীটি ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ৫০ বছরে জাপান বৃহত্তর এশিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়েছে। অথচ গত শতাব্দীর প্রথম ৪০ বৎসর এশিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্র চীন এবং ভারতের সঙ্গে জাপানের যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আজকের যুদ্ধোত্তর প্রজন্ম জানে না বললেই চলে। বর্তমান প্রজন্মের কথা বলে তো কোনও লাভ নেই। তৎকালীন জাপানের ইতিহাস নিয়ে পত্রপত্রিকা গ্রন্থাদি বিস্তর প্রকাশিত হলেও তার পাঠক নিতান্তই সীমিত। প্রাচ্যের অন্যতম প্রাচীন এক সুসংস্কৃত দেশ জাপানের অধিবাসীদের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে প্রাচ্যের মূল্যবোধ ও প্রাচ্যজাতিসমূহের ভাতৃত্ববোধকে নিয়ে চিন্তা করা নতুন করে। এই দুর্লভ ঐতিহাসিক স্মৃতিসম্ভার সেই প্রেরণাকে নতুন প্রজন্মের ভিতরে জাগ্রত করবে" এই ছিল বয়োজ্যেষ্ঠদের আশাবাদ।

প্রদর্শনীতে ফুকুওকা নগর প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তোয়ামা মিৎসুরুর প্রপৌত্র তোয়ামা ওকিসুকে, 'গেনয়োশা'র অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হিরাওকা কোতারোর প্রপৌত্র লেখক.গবেষক তানাকা তাকেয়ুকি। তাকেয়ুকি আমাকে বলেন, "তোয়ামা মিৎসুরু, হিরাওকা কোতারো, উচিদা রিয়োহেই প্রমুখরা শুধুমাত্র জাতীয়তবাদী ছিলেন তা নয়, তাঁরা সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। এশিয়ায় জাপানের সম্প্রসারণবাদী ভূমিকা রাখার চেয়ে বলা যায় বৃহত্তর এশিয়াবাসীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তৎসময়ে আগ্রাসনবাদী পাশ্চাত্য সামরিক শক্তিকে এশিয়ায় মোকাবেলা করার মতন শক্তি একমাত্র জাপানই ছিল। যে কারণে চীন, কোরিয়া, ভারত, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশের জাতীয়তাবাদী নেতা, বিপ্লবীরা জাপানের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। তোয়ামা ও তার' গেনয়োশা' জাপানি রাজনীতিকদেরকে তাই পরবর্তীকালে নাড়া দিতে পেরেছিলেন।

অনেকেই বলেন তোয়ামা মিৎসুরু বা 'গেনয়োশা'র সদস্যরা জাপানি 'ইয়াকুজা' বা 'মাফিয়া'দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেটা ভিন্ন কাহিনী। যুদ্ধোত্তর কালে তাঁদেরকে ইয়াকুজাদের সঙ্গে এক করে ফেলা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে আর করেছে মূলত সমাজতন্ত্রীরা। যেহেতু তোয়ামারা জাতীয়তাবাদী ছিলেন তেমনি জাপানি ইয়াকুজরাও জাতীয়তাবাদী ফলে মিলিয়ে দেয়াটা সহজ হয়েছে। আর তথাকথিত সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রীদের দমন করার জন্য এলডিপি (লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি)-র নেতারা ইয়াকুজাদের ব্যবহার করেছে, ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন এই ইয়াকুজা অথবা বর্তমান জাতীয়তাবাদীরা যদি তাঁদের দপ্তরে বা পকেটে তোয়ামাদের ছবি রেখে দেয় আর তোয়ামা, হিরাওকা বা 'গেনয়োশা'র তেজস্মিতা, অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয় তাহলে তার অর্থ এই নয় যে তোয়ামারা ইয়াকুজাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই যদি হবে, তাহলে 'য়োমিউরিশিম্বুনে'র মতো দায়িত্বশীল জাতীয় পত্রিকা এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন না, এভাবে আগ্রহ সহকারে দলে দলে লোকজন আসতেন না প্রদর্শনীতে। আসলে যাঁরা তোয়ামা মিৎসুরুকে উগ্রপন্থী, ইয়াকুজাদের 'বস্' বলে অপপ্রচার চালাচ্ছেন তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তা করছেন, ইতিহাস না জেনেই তাঁরা সেটা করছেন। প্রকৃতপক্ষে, অনর্থক অপপ্রচার চালিয়ে প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত বা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।"

প্রদর্শনীতে আরও উপস্থিত ছিলেন জাপানে আশ্রিত মহাবিপ্লবী রাস-বিহারী বসুর শ্বশুরালয় শিনজুকু শহরের সুবিখ্যাত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 'নাকামুরায়া প্রাইভেট কোম্পানি'র অন্যতম ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. কোয়ামাদা। তিনি বলেন, "তোয়ামা মিৎসুরুর মাধ্যমে শ্রীমতি নাকামুরা হারু রাসবিহারী বসুর কাছে 'ভারতীয় কারি'র রান্নাপদ্ধতি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন--আজ প্রথম জানতে পেরে আমি সত্যি বিস্মিত হয়েছি!" উল্লেখ্য যে, নাকামুরা হারু (১৮৮৪-১৯৭১) [বিহারী বসুর নাকামুরায়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন] নাম্নী এক তরুণী তোয়ামা মিৎসুরুর জন্মস্থান ফুকুওকার জন্মসূত্রে নাগরিক। তিনি ১৮৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফুকুওকারই এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরী

নেন। রান্না বিষয়ক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে য়োকোহামা, কোবে প্রভৃতি নগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মশিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে যখন তিনি পুনরায় প্রথম কর্মস্থলে ফিরে আসেন তখন সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে মহিলা মহাবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। নারী শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার কৃতিত্বস্বরূপ ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সালে দু'দুবার তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক অর্জন করেন। ১৯২১ সালে তিনি যখন য়োকোহামা শহরে ছিলেন তখন টোকিয়ো শিনজুকু শহরের নাকামুরায়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় কারি তৈরির পদ্ধতি শেখার লক্ষ্যে আবেদন করেন কিন্তু অনুমতি লাভে ব্যর্থ হন। নাকামুরায়ার 'ইন্‌দো কারেএ' তথা 'ভারতীয় কারি'র নামডাক তখন রাজধানী টোকিয়ো ছাড়িয়ে অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হারু পরে তোয়ামা মিৎসুরুর শরণাপন্ন হয়ে নাকামুরায়া প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত রাসবিহারী বসুর ভারতীয় রেস্টুরেন্টে শিক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। ভারতীয় কারি শিক্ষাকালীন বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তিনি ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিখে গেছেন। সেটি 'দোরিয়োকু নো উয়ে নি হানা গা সাকু' (প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করেই ফুল ফোটে) নামক জীবনীগ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। হারুর ছবি ও সেই গ্রন্থ প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়।

প্রদর্শনীর আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য বস্তু ছিল সোনবুন (Dr. Sun Yat-sen, ১৮৬৬-১৯২৫)-এর পৌত্রী কর্তৃক হাওয়াইই থেকে প্রেরিত একটি বাণী। বাণীতে তিনি উল্লেখ করেন, পিতামহের সঙ্গে তোয়ামা মিৎসুরু, হিরাওকা কোতারো, 'গেনয়োশা'র গভীর সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেছেন, "গণচীনের আধুনিকীকরণ, গণতন্ত্রায়ণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন পিতামহের সহযাত্রী। এই প্রদর্শনীর আয়োজন দুই দেশের নাগরিকদের সুদীর্ঘকালের বন্ধুত্বকে আবারও উদ্দীপ্ত করবে।" বাণীটি তানাকা তাকেয়ুকির মাধ্যমে সংগৃহীত এবং জাপানিতে অনূদিত হয়ে প্রদর্শিত হয়। অনেকেই আগ্রহ সহকারে এটি পড়েন।

এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত বিভিন্ন মূল্যবান দলিলপত্রাদি থেকে জানা যায় যে, কট্টোর জাতীয়তাবাদী নেতা তোয়ামা মিৎসুরু রাজকীয়

সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রাখলেও তিনি চীন-জাপান যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। শুধু তাই নয়, জার্মানের নাৎসীদের কড়া সমালোচনা করে বলেছিলেন, "যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলে অস্ত্র দিয়ে নয়—নীতি দিয়ে।" মূলত তিনি দর্শন ও চিন্তাশক্তির মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের স্বাধীনতা ও শান্তি অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। গভীরভাবে জাতীয়তাবাদী ছিলেন বলেই তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা সত্যিকার আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তোয়ামা তুরস্কের মুক্তিসংগ্রাম, ইতালির উপনিবেশ আফ্রিকার 'ইথিওপিয়া'র স্বাধিকার আন্দোলনকে পর্যন্ত সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন! এই প্রদর্শনী ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষর তুলে ধরে এটা প্রমাণ করে দিল যে, মেইজি সংস্কারের (১৮৮৬৮-১৯১২) ধারা ধরে যুদ্ধপূর্ব সময় পর্যন্ত জাপানে আন্তর্জাতিকতাবাদ বর্তমানের চেয়ে অনেকাংশে এগিয়ে ছিল। যেমনটি সমগ্র এশিয়ার আর কোথাও লক্ষ করা যায় না।

প্রদর্শনীতে আগত লেখক ইচিরো শিরাইশি মনে করেন, "যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জাতিগতযুদ্ধ ও লড়াই চলছে সেসবকে বন্ধ করতে পারে এই ধরনের সময়োপযোগী আয়োজন। এশিয়ার শান্তি অর্জনে এই আয়োজন আরেকবার এশিয়াবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছে।"

অনেক বয়োবৃদ্ধ নাগরিকও প্রদর্শনীতে ভীড় করেছেন তাঁদের প্রিয় ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। ৮২ বছরের কুরিহারা মহাশয় বলেন, "তোয়ামা মহাশয় ছিলেন বিশাল এক মানুষ, ফুজি পর্বতের মতো।" ষোল বছর বয়সে তিনি তোয়ামা মিৎসুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তোয়ামার ৮০ বৎসরপূর্তি উৎসবে কুরিহারা মহাশয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি ফুকুওকা শহরে অবস্থিত এশিয়ার সংস্কৃতি বিষয়ক একটি NPO প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। তাঁর মতো আরও অনেকেই জানালেন, স্যার তোয়ামা মিৎসুরুর কাছেই আমরা প্রথম আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের শিক্ষার্জন করি।

গুরু তোয়ামা মিৎসুরু

তোয়ামা মিৎসুরু ১৮৫৫ সালে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ফুকুওকা-জেলার এক সামন্ত (সামুরাই) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে

মেইজি সংস্কারের পর তিনি তরুণ বয়সে তৎকালীন স্থানীয় প্রভাবশালী চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, শিক্ষিকা এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞা শ্রীমতি তাকাবা ওসামুর স্বদেশবাদী পাঠচক্রে জড়িয়ে পড়েন। তাকাবার পিতার পরিবার এদো যুগের (১৬০৩-১৮৬৮) এক ঐতিহ্যবাহী চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরিবার। পিতামহ এবং পিতার পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পেশা গ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনযাপনের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, লেখালেখি, শোদোউ তথা জাপানি লিপিকলার চর্চাও বজায় রেখেছিলেন। স্থানীয় সামুরাই পরিবার কিননোসুকের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক। ১৮৭৭ সালে ফুকুওকা-হেন্ তথা ফুকুওকা বিদ্রোহের নায়ক তাকেবে কোশিরো এবং পরবর্তীকালে 'গেনয়োশা' প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিরাওকা কোতারো, হাকোদা রোকুনোসুকে, কিজিমা ৎসুনেয়োশি প্রমুখের সঙ্গেও হৃদ্যতা ছিল প্রচন্ড। শ্রীমতি তাকাবা যেমন ছিলেন শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী মহিলা তেমনি ছিলেন নির্লোভি, নিরংহকারী এবং সহানুভূতিশীল। তিনি তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষা দিতেন। ঘরের বাইরে সর্বদা তিনি গোরু নাহয় ঘোড়ায় চড়তেন বলে কথিত আছে। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনিই মূলত ইতিহাসখ্যাত ডানপন্থী/জাতীয়তাবাদী সমিতি 'গেনয়োশা'র উদ্গাত্রী। যাকে পরে তোয়ামা মিৎসুরু বাস্তবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন যে, গুরুজন তাকাবার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল তোয়ামার উপর। 'গেনয়োশা' প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮৭৯ সালে তিনি 'কোয়োশা' নামক অনুরূপ আর্দশবাদী একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে নিবিষ্ট হন। পরে ১৮৮১ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে 'গেনয়োশা'তে রূপান্তরিত করে তার প্রধান পরিচালক নির্বাচিত করেন সতীর্থ হিরাওকা কোতারোকে। তিনি পেছনে থেকে নেপথ্য পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে এশিয়াব্যাপী জাপানের প্রভাব সম্প্রসারণের বিষয়ে গভীরভাবে নিযুক্ত হন।

চীন-জাপান যুদ্ধের (১৮৯৪-১৮৯৫) কিছুপূর্বে তোয়ামা 'তেন্যুকাই' নামক একটি আধা-সামরিক সংস্থা গঠনে সহায়তা করেন। এটি তখন কোরিয়াতে জাপানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে চীনের অরক্ষিত মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে জাপানি কর্তৃত্ব স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন।

এই জন্যে যে তখন তিনি রাশিয়াবিরোধী সংস্থা 'তাইরো দোশিকাই' (১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) এর সদস্য হিসেবে চেয়েছিলেন রশিয়া যাতে চীনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে। কেননা তিনি তৎকালীন চীনা বিপ্লবী নেতা সোনবুনকে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন যাঁর দ্বারা ১৯১১ সালে চীনে বিপ্লব সংঘটিত হয়। সোনবুনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৯৭ সালে য়োকোহামাতে। পরবর্তীকালে সোনবুন নিয়ন্ত্রিত চীনের একাংশে নবগঠিত সরকারের একজন উপদেষ্টা হিসেবে তোয়ামা চীন সফর করেন।

চীনা বিপ্লবের পর তোয়ামা জাপানের এশিয়ায় সম্প্রসারণ নীতির নেপথ্যে প্রধান কৌশলী হিসেবে কাজ করেন। যার ফলে বৃটিশপন্থী জাপান সরকারকে তোয়াক্কা না করে এশিয়ার প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী স্বাধীনচেতা বিপ্লবীদেরকে আশ্রয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন জাপানের মাটিতে এক প্রকার প্রকাশ্যে। পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদীদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের অগ্নিবীণা বেজে উঠেছিল তাঁর এবং সতীর্থদের প্রজ্জ্বলিত বক্ষ থেকেই।

২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আধুনিককালের জাপানি জাতীয়তাবাদের জনক বলা যায় তাঁকে কেননা তিনিই জন্ম দিয়েছিলেন 'গেনয়োশা', 'কোকুরিউকাই' (আমুর রিভার সোসাইটি) প্রভৃতি ডানপন্থী সংস্থা, যার সদস্যরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ মহাদাপটের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন এবং বাকী অর্ধাংশ তাঁদের উত্তসূরীদের দ্বারা কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতেও সে ধারা মুছে যাবে না আবার 'এশিয়াবাদ' এই শতাব্দীতেই নতুন মাত্রা নিয়ে জেগে উঠবে এমন ধারনারই জন্ম দিয়েছে আলোচিত প্রদর্শনীটি।

গুরু তোয়ামা মিৎসুরু ১৯৪৪ সালে ৯৯ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। *তাঁর নাম বাদ দিয়ে আধুনিক এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। এমনই এক বিশাল ব্যক্তিত্বের পুরুষ ছিলেন তিনি।*

কাকুরিউকাই

ভাবমূলক অর্থে 'আমুর রিভার সোসাইটি', আক্ষরিক অর্থে 'ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটি'। একটি অতিজাতীয়তাবাদী সমিতি এবং 'গেনয়োশা'র

প্রশাখা। উচিদা রিয়োহেই ১৯০১ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন মূলত পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত আমুর নদীর দক্ষিণাঞ্চল থেকে রাশিয়াকে হটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। সমিতিটি 'কোকুরিউ' পরবর্তীতে 'আজিয়া জিরোন' নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ করে। এই সাময়িকীতে সাইবেরিয়া, মাঞ্চুরিয়াতে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া কাজ করছে সে সম্পর্কে সংগৃহীত গোপন তথ্যাদি প্রকাশ এবং জাপান সরকারকে শক্তিশালী বিদেশনীতি গ্রহণের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে লেখালেখি হত। এই সমিতি 'দাইআজিয়াশুগি' তথা 'প্যান-এশিয়ানিজম' মতবাদের প্রবক্তা এবং সেইসূত্র ধরে বিপ্লবী সোনবুন এবং ফিলিপিন্সের এমিলিও এগুইনালডোকে সমর্থন করে। এই সময় রুশো-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-০৫), জাপানের কোরিয়া অভিযান (১৯১০) এবং সাইবেরিয়া হস্তক্ষেপ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সমিতির সদস্যদের সেখানে পাঠানো হয় স্থানীয় রাজনৈতিক ধারাকে ভিন্নখাতে প্রবাহের তৎপরতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে।

১৯২০ সালের শেষ এবং ১৯৩০ সালের প্রথম নাগাদ সমিতিটি উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং বামপন্থীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং আহবান জানায় সম্রাটকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পুর্নগঠনের। যদিও এই সমিতির অধিক সংখ্যক সদস্য ছিল না তথাপি তোয়ামা মিৎসুরু প্রমুখ অগ্রণী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সামরিক বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা এবং শক্তিশালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে 'কোকুরিউকাই' অনেক বেশী প্রভাবশালী ছিল অন্যান্য উগ্রডানপন্থী সংস্থা-সমিতির চেয়ে। যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে মিত্রশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ সমিতিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

গেনয়োশা

Black Ocean Society জাপানের ইতিহাসে অগ্রণী ডানপন্থী এই *সমিতিটি ১৮৮১ সালে হিরাওকা কোতারো (১৮৫১-১৯০৬), তোয়ামা* মিৎসুরু এবং ফুকুওকা অঞ্চলের প্রাক্তন সামুরাইদের দ্বারা গঠিত হয়। এর আগে তাঁরা মেইজি সরকারের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিদ্রোহী সামুরাইদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু মেইজি সরকার যখন সাৎসুমা বিদ্রোহীদেরকে ১৮৭৭ সালে দমন করেন তখন তাঁরা অংশ নেন সামুরাই ইতাগাকি

তাইসুকে কর্তৃক গঠিত জাপানের প্রথম রাজনৈতিক দল 'জিউমিনকান উন্‌দো' তথা 'Freedom and People's Rights Movment' নামক একটি আন্দোলনে এবং গঠন করেন রাজনৈতিক সংগঠন 'কোয়োশা' জাতীয় সংসদকে নাড়া দেবার লক্ষ্যে। উল্লেখ্য যে, ১৮৮১ সাল থেকে এই দলের সদস্যরা কোরিয়া অভিযান নিয়ে বির্তকে জড়িয়ে পড়ে। এই সময় সংগঠনের নাম বদলে রাখা হয় 'গেনয়োশা' গেনকাই নাদা (Genkai Sea)কে স্মরণে রেখে। যা কিনা জাপান ও কোরিয়াকে দুভাগ করে রেখেছে।

'জিউমিনকান উন্‌দো'র পাশাপাশি সরকারি নেতা ওকুমা শিগেনোবু আরেকটি দল গঠন করেন। ১৮৮৯ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওকুমা শিগেনোবুর সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে 'গেনয়োশা'র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে সমিতির এক সদস্য কিজিমা ৎসুনেয়োশি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওকুমাকে গুরুতরভাবে আহত করেন। এই সমিতিটি বিরোধী দলগুলোকে ভীতি প্রদর্শন এবং সরকারকে সহযোগিতা করে ১৮৯২ সালের নির্বাচনে। যখন চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-১৮৯৫) শুরু হয় তখন এই সমিতি কোরিয়াতে গোপন তৎপরতায় লিপ্ত থাকে। ১৯০৪-০৫ সালে সংঘটিত রুশো-জাপান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 'গেনয়োশা' গোপন তথ্য সংগ্রহে ভূমিকা রাখে। যুদ্ধের পরে 'গেনয়োশা' প্যান-এশিয়ানিজমকে সমর্থন এবং কোরিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণে (১৯১০) সহযোগিতা করে। এটি পরবর্তীকালে গঠন করে Greater Japan Production Party অথবা দাইনিপ্পন সেইসানতো, শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য। এই সংস্থার বড় কৃতিত্ব হচ্ছে দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদের সৃষ্টি এক নাকানো সেইগো (১৮৮৬-১৯৪৩). যিনি ছিলেন প্রথম জীবনে টোকিয়ো আসাহিশিম্বুন পত্রিকার সাংবাদিক এবং পরবর্তীকালে রাজনীতিতে প্রবেশ এবং আটবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাপান-আমেরিকা (১৯৪১) যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো হিদেকির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন যা তাকে পরবর্তীকালে ঘটনাক্রমে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। অন্যজন 'হিরোতা কোউকি' যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা থেকে পরবর্তীকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন

এবং 'এ' শ্রেণীর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনালের রায়ে দন্ডিত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। 'গেনয়োশা'র সঙ্গে এশিয়ার তৎকালীন প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন তা পূর্বে বলা হয়েছে।

শুধুমাত্র রাজনীতি, কূটনীতি ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-কলা, শোদোউ (লিপিকলা), ক্রীড়া প্রভৃতিতে 'গেনয়োশা' বিশেষ ভূমিকা রাখে। যেমন জাপানে পলাতক রাশিয়ান অন্ধ কবি ভাসিলি এরশেনকো 'গেনয়োশা'র কল্যাণেই নাকামুরায়ার অভ্যন্তরে সংস্কৃতিচর্চা আসরের একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন। চীন থেকে জাপানে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে পালিয়ে আসা সুয়োনাগা মিসাও শোদোউ, ভাস্কর্য এবং কানজি বিদ্যায় ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'গেনয়োশা'র একজন সক্রীয় কর্মী। খ্যাতিমান পাশ্চাত্যবাদী চিত্রশিল্পী ওয়াদা সানজো ছিলেন 'গেনয়োশা'র নিয়মিত সদস্য।

যুদ্ধের পর মিত্রশক্তি মার্কিনী প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সংগঠনের সুদীর্ঘ তৎপরতার পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তার প্রভাব বিগত ষাট বছরেও অনুভূত হচ্ছে প্রবলভাবে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। আগামীতেও এই আধ্যাত্মিক ধারা প্রবাহমান থাকবে জাপান ও বৃহৎ এশিয়ার দেশপ্রেমিক প্রজন্মের ভেতরে তাতে কোন সন্দেহ দেখি না। 'দাই আজিয়া মোয়েয়ুর' মানাজাশি: তোয়ামা মিৎসুরু তো গেনয়োশা'র এই প্রদর্শনী তারই উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

শুধু তাই নয়, তোয়ামা মিৎসুরুর এশিয়াবাদী চিন্তাচেতনা থেকে জন্ম নিয়েছে সম্প্রতি 'কুরেতাকে কাই (এশিয়া ফোরাম)' নামক একটি সংস্থা। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোন মূল্যে রাজকীয় ঐতিহ্যকে লালন, এশিয়ার সার্বিক স্বার্থরক্ষা এবং শতাব্দী প্রাচীন প্যান্-এশিয়ানিজমকে পুনর্জীবন দান। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটা করে পালিত হয় গুরু তোয়ামা মিৎসরুর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী। বর্তমান সমাজে বিস্মৃতপ্রায় এই মহান ব্যক্তিত্বের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে প্রায় সহস্রাধিক নাগরিক উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। যাদের অধিকাংশই ছিলেন বয়সে তরুণ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীবৃন্দ। এই উপলক্ষে

সুবিখ্যাত সুদৃশ্য 'মেইজি কিনেনকান' মিলনায়তনের অভ্যন্তরে প্রদর্শিত হয় এক মনোরম চিত্রপ্রদর্শনী এবং স্লাইডশো। তাতে করে তোয়ামা মিৎসুরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সেই সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও যুদ্ধের ষাট বছর পরে এই প্রথম জাপানের জনসম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে গুরু তোয়ামা সম্পর্কে একাধিক জীবন ও কর্মকান্ড ভিত্তিক প্রকাশনা। সহযোগিতা করেছেন একাধিক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ।

তথ্যসূত্র:

১. 'দাইআজিয়া মোয়েযুরু মানাজাশি: তোয়ামা মিৎসুরু তো গেনয়োশা' প্রদর্শনীর স্মরণিকা

২. য়োমিউরিশিম্বুন

৩. হিতোআরিতে তোয়ামা মিৎসুরু তো গেনয়োশা (গ্রন্থ)

....

*** কৃতজ্ঞতা স্বীকার:**

ইতিহাস বিষয়ক লেখিকা.পরিবেশবাদী আন্দোলনের সংগঠিকা ইউকো তোজো; কুরেতাকেকাই (এশিয়া ফোরাম) এর চেয়ারম্যান ওকিসুকে তোয়ামা; তানাকা তাকেযুকি

* আলোকচিত্র: কোদানশা; তানাকা তাকেযুকি, য়োমিউরিমিম্বুনের সৌজন্যে

জাপান
ও
এশিয়া
বৃষ্টির উৎসব
জাপানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার সম্মনার্থে এবং
মহান একুশের বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা
নিবেদন স্বরূপ 'শহীদ মিনার' নির্মাণ জাপান ও
এশিয়ার আরেকটি সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রতীক
সম্পর্কের
একাংশ

জাপান ও এশিয়া সম্পর্কের একাংশ

যীশুখ্রীস্টের জন্মের বহু প্রাচীনকাল আগে থেকেই জাপানের সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও গোষ্ঠীর মানুষজন জাপানে প্রবেশ করে স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে গেছেন। জাপান এশিয়ারই একটি রাষ্ট্র। প্লেস্টোসিন যুগে জাপানের দ্বীপগুলো এশিয়ার মূল স্থলভাগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ধারণা করা হয় প্রথম আদিম মানুষ এ ভূখন্ডে আগমন পর্যন্ত এই সংযোগ রক্ষিত ছিল। জাপানি গবেষকদের আবিষ্কৃত প্রাক্-আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত সময়কার সকল নরকংকাল, মাটির তৈষজপত্র, অস্ত্র, হাতিয়ারসহ নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ ভুখন্ডে এশিয়া থেকে আগত জনগোষ্ঠীর সময়কাল ২০০,০০০ বছর প্রাচীন। তবে তাদের পরিচয় অস্পষ্ট, রহস্যময়। এখনো সেই ইতিহাস গবেষণাধীন।

অবশ্য তার মধ্যে ১৯৪৯ সালে গুন্‌মা-জেলার 'ইয়াজুকু' স্থানে খনন কাজের ফলে যে সকল পাথরের অস্ত্র, হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর অনুরূপ বস্তু চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতে পাওয়া গেছে। এগুলোর বয়স ১০০,০০০ থেকে ২০০,০০০ বছরের মধ্যে বলে পন্ডিতরা বিশ্বাস্ করছেন। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, বর্তমান্ জাপানিদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন এশিয়া জাতি-গোষ্ঠীর রক্তধারার মানুষ ছিল।

জাপানিদের ভাষাও তুর্কি, হাঙ্গুল (কোরিয়ো), চীনা, মালয়, তামিল, সংস্কৃত, পলিনেশিয়ো প্রভৃতি ভাষাদ্বারা প্রভাবিত, গঠিত। এখনো জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরসমূহে প্রাচীন ভারতীয় 'সিদ্ধাম' ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণত প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে কিংবা এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে তার সঙ্গে গিয়েছে ভাষা, জ্ঞান, খাদ্য, সংস্কৃতি, কর্মপদ্ধতি, হাতিয়ার ইত্যাদি। কাজেই জাপানিদের মধ্যে উপরোক্ত ভাষাগত জাতির রক্ত নেই এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে কখন জাপানিরা জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয় তা সঠিক করে আজও বলা মুশকিল। বিভিন্ন পন্ডিতদের বিভিন্ন মত রয়েছে একটি মিশ্রিত জনগোষ্ঠী থেকে 'জাতি' হিসেবে জাপানিদের আত্মপ্রকাশের সময়কাল নিয়ে।

জাপানেও প্রাচীনকালে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ছিল, তাদের অধিকাংশ

যুগে যুগে বহিরাগতদের সঙ্গে মিশে গেছে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিজ্ঞাত আদিবাসী হচ্ছে বর্তমানে হোক্কাইদো প্রদেশে বসবাসরত 'আইনু' জনগোষ্ঠী। তাদের ইতিহাসও অত্যন্ত রহস্যময়। সর্ব দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপ-প্রদেশ প্রাচীন রিউকিউ বর্তমানে 'ওকিনাওয়া'ও জাপানের মূল ভূখন্ডের সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিল না, মেইজি যুগে (১৮৬৮-১৯১২) জাপান দ্বীপটিকে দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে অনেক জাপানি এবং ওকিনাওয়াবাসীরা বিবাহের মধ্য দিয়ে মিলেমিশে গেছেন।

যে প্রাচীন 'জমন' জনগোষ্ঠীকে জাপানিরা তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে গর্ব করে থাকেন তাঁরাও যে খৃ:পূ: ৪,৫০০ বছর (কিংবা তারও বেশি) পেছনকার লোক তা তাঁদের পরিত্যক্ত মৃৎপাত্র ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু থেকে প্রমাণিত হয়েছে। খৃ:পূ: ৩য় শতাব্দীর দিকে এই জমনরাও বসতি ফেলে সরে যায় উত্তর কিউশু থেকে অপেক্ষাকৃত শ্বেতাঙ্গ 'ইয়ায়োই' জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে। অনেক পণ্ডিত নবাগতদেরকে কোরিয়া অঞ্চলভুক্ত জনগোষ্ঠী বলে ধারণা করেন। এবং তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত উঁচু সংস্কৃতির ধারক, বাহক এক মানব গোষ্ঠী। তাঁদের সঙ্গেও স্থানীয় জনগোষ্ঠী মিশে যায়, অনেকে অন্যত্র সরে যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত প্রাচীন 'নিহোন কোজিকি' বা 'প্রাচীন ঘটনা-পঞ্জি' এবং 'নিহোন শোকি' বা 'কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি' থেকে জানা যায় যে, খৃ:পূ: ৬৬০ অব্দে জাপানের প্রথম শাসক আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি সম্রাট জিম্মু। যদিওবা তা প্রমাণিত নয়, কিংবদন্তী মাত্র। তথাপি সেই হিসেব ধরেই ১৯৪০ সালে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী জাপান সরকার 'রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা'র ২,৬০০তম বার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করে। অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে, একদিনে রাষ্ট্র হিসেবে জাপান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুপ্রাচীনকাল থেকেই জাপান ছিল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। সমাজের শক্তিশালী পরিবারের বংশধররাই শাসন করতেন সে সকল রাজ্য। পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। তবু 'ইয়ামাতাইকোকু' বা 'ইয়ামাতো' নামে যে কেন্দ্রীয় জাপানের রাজধানীর প্রসঙ্গ ইতিহাসে পাওয়া যায় তার শাসককর্তা ছিলেন এক অবিবাহিত নারী। রানী 'হিমিকো' বা 'হিমোকো' (Sun Princess)। এই রানী সম্পর্কে তথ্যাদি

লিপিবদ্ধ আছে চীনা কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জিতে। তৎকালীন চীনা সরকারি কর্মকর্তা বা বণিক যাঁরা জাপান ভ্রমণ করেছেন তাঁদের কাহিনী 'ওয়েই চি' নামক ঐ কালানুক্রমিক পঞ্জিতে খৃ:পূ: ২৯৭ অব্দে লিপিবদ্ধ করা হয়। চীনাসূত্র থেকে জানা যায়, হিমিকো অত্যন্ত কঠোর ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন রাজ্যে। তাঁরই উদ্যোগে পরবর্তীকালে একজন রাজা সৃষ্টি করে তাঁর অধীনে ৩০টি রাজ্যকে যুদ্ধনীতি-পন্থা থেকে সরিয়ে এনে একটি 'ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিমেকো প্রশাসনের পশ্চাতে উপাসিকা ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে মুলত রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। রানী হিমিকোর মৃত্যুর পরও 'ইয়ামাতাইকোকু' সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ এবং 'ইয়ামাতো' শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জাপানের বর্তমান হেইসেই সম্রাট আকিহিতো হচ্ছেন ১২৫তম সম্রাট। সম্রাটের এই বংশানুক্রমিক ধারা সৃষ্টি হয়েছে এই ইয়ামাতো যুগ থেকে। জাপানি রাজকীয় পরিবারের উৎপত্তি নিয়ে রয়েছে নানা মত, নানা রকম যুক্তিতর্ক ও বিতর্ক। একদল পণ্ডিত মনে করেন 'ইয়ামাতাইকোকু'র প্রাচীন শাসক রানী হিমিকোই হচ্ছেন সরাসরিভাবে জাপানি সম্রাটের পূর্ব-পুরুষ। আবার অনেকে মনে করেন, সম্রাট ইয়ামাতাইকোকুর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ 'কুনাকোকু'র বংশধর। আরেক দল মনে করেন, সম্রাট ইয়ামাতো অঞ্চলের কোন প্রভাবশালী স্থানীয় শাসকের বংশধর হবেন।

এখানে যদি আমরা প্রথম দলের মতামতকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, জাপানি সম্রাটরা জাপান বর্হিভূত জনগোষ্ঠী 'ইয়ায়োই'দের বংশধর। কেননা ইয়ায়োইরা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল কিউশু মতভেদে নারা অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে ৩০০ শতাব্দীর দিকে 'হোন্‌শু' বা 'মূলভূখন্ডে'র দিকে ছড়িয়ে পড়েন। ইয়ামাতাইকোকু অথবা ইয়ামাতো মতভেদে উত্তর কিউশু অথবা নারা দুয়ের যে কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তাতে কোন ভুল নেই। এবং ইয়োয়োই বংশধররাই যে এই রাজ্য বা রাজ্যগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল এটাও অবিশ্বাস্য নয়। আর রানী হিমিকো যে ইয়ায়োই জনগোষ্ঠীরই পরবর্তী ধারার জন তাতেও নিশ্চয়ই প্রথম পণ্ডিত দল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, যে

কারণে বলছেন জাপানি সম্রাটরা রানী হিমিকোর বংশধর অর্থাৎ জাপানি মূল ভূখণ্ডের আদিবাসী তাঁরা নন অর্থাৎ বহিরাগত। বিষয়টি অত্যন্ত রহস্যময় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ইয়ায়োইদের পরে বর্হিবিশ্ব থেকে আরও জনগোষ্ঠী এসে এখানে মিশে গেছেন। আধুনিককালে এসেছেন কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ান থেকে অভিবাসীরা। বর্তমান জাপানিরা যে শতকরা একশ ভাগ খাঁটি নন, বরং বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর রক্তধারায় মিশে এক সংকরজাতি তা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। সম্প্রতি একটি চাঞ্চল্যকর খবর সংবাদপত্রে উঠে এসেছে তাহল বর্তমান সম্রাটের পূর্বপুরুষ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার এক প্রাচীন রাজবংশের পূর্বপুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল--বর্তমান সম্রাট আকিহিতো নিজমুখেই তা প্রকাশ করেছেন। যা বহু বছর সরকারি-বেসরকারিভাবে দুদেশেই গোপন রাখা হয়েছিল।

প্রাগৈতিহাসিক কাল ছাড়াও ঐতিহাসিককালে জাপান প্রভূত বিদেশী প্রভাব গ্রহণ করেছে। প্রথম ধাপে হচ্ছে চীন-কোরিয়া, দ্বিতীয় ধাপে মেইজি সংস্কারের (১৮৬৮) পর ব্যাপকভাবে য়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব গ্রহণ করে ক্রমাগত আন্তর্জাতিকতার দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিগত দুই হাজার বছরের মধ্যে জাপান ও বর্হিবিশ্বের মধ্যে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যোগাযোগও কম ঘটেনি। মেইজি যুগ পূর্ব পর্যন্ত চীনা কনফুশিয়ান দর্শন ও ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে জাপানি সমাজব্যবস্থার পরতে পরতে তা আজও এক কথায় অটুট। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এক হয়ে হিন্দু ধর্মের দেবদেবীরাও জাপানে সমধিক ভক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত। জাপানি জেন্ (ZEN) বৌদ্ধধর্ম বলে যে সম্প্রদায় রয়েছে সেটাও ভারতীয় 'ধ্যান্', বা 'সমাধি' (Meditation) থেকে চীন হয়ে আগত এবং আজকের জাপানে বৃহৎ পরিসরে অনুসৃত হচ্ছে। জাপানি সংস্কৃতির অধিকাংশ জুড়ে আছে চীনা প্রভাব, তারপর কোরিয়ো। যেমন ভাষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে, তেমনি জীবনযাপন, রীতিনীতি, ব্যবসা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে। তারপরই আসে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বৌদ্ধধর্ম অনুসারে যেমন মৃতদেহের আগুন দ্বারা সৎকার, শোকানুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ, ধ্যান্, উপাসনা ইত্যাদি জাপানি সমাজের

জাতীয় আচারানুষ্ঠান। জাপানি ভাষা গঠনে যেমন রয়েছে আদিকাল থেকে চীনা কানজি, হাঙ্গুল, তুর্কী ভাষার সরাসরি সংযোগ তেমনি প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত, খরোষ্ঠী, দেবনাগরী, ব্রাম্মী, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষারও প্রভাব রয়েছে। যেমন জাপানি মূল কানা শাখার 'হিরাগানা'র প্রথম অক্ষর 'আ' সেটি গঠিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি অনুসারে বলে কথিত আছে। সংস্কৃত 'ধন' থেকে উদ্ভূত জাপানি 'ধান্না' শব্দ যার অর্থ স্বামী, গৃহকর্তা, মনিব প্রভৃতি। 'নমো নমো' জাপানিতে 'নামু নামু' নামে প্রচলিত। আমাদের বাংলা 'চা'কে জাপানিরাও চা-ই বলেন। বাংলায় 'আছে' তাঁদের 'আরু' কিংবা 'নাই' জাপানিতেও 'নাই'। অথবা বাংলায় যা 'বোকা' জাপানিতে তা 'বাকা'।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই জাপান ও ভারতের মধ্যে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ যে ছিল তার নতুন নতুন প্রমাণও দিন দিন প্রকাশ পাচ্ছে লেখক, গবেষক এবং ঐতিহাসিকদের কল্যাণে। যদিওবা মেইজি পর্যন্ত সাধারণ জাপানি সমাজে ভারতের পরিচিতি ছিল ক্ষীণতর। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে দুই দেশের মধ্যে ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ছিল। খ্রীস্টপূর্বাব্দ কাল থেকে মধ্যযুগের পূর্বভাগ পর্যন্ত মনে করা যেতে পারে যে, জাপানিদের বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণের তীর্থভূমি ছিল 'কারা' (মহাচীন) এবং 'তেন্‌জিকু' (ভারতবর্ষ)। ইতিহাস তুলে ধরেনি এমন ঘটনাও জানা যাচ্ছে আজকের দিনে গবেষণার ফলে জাপান ও ভারতের মধ্যকার প্রাচীন যোগাযোগের সংবাদ। নতুন প্রজন্মের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসা অথবা স্বজাতি কিংবা স্ববংশের উৎপত্তি সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ছেন আগ্রহী গবেষকরা। তুলে ধরার চেষ্টা করছেন নতুন নতুন সূত্র, তথ্য, সংবাদ। তেমনি একজন 'বিশ্ব-সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রে'র পরিচালক য়োশোনারি তাকাহাশি গত শতকের শেষদিকে একটি সাময়িকীতে ভাষাগত প্রমাণাদি উপস্থাপন করে বলতে চেয়েছেন যে, জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়! তিনি জাপানি জাতির উৎস খুঁজতে গিয়ে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন নিদর্শন ও স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করেন। অবশ্য জাপানি জাতির উৎপত্তির খোঁজে গত দুই দশক ধরেই বিভিন্ন স্তরে ক্রমাগত গবেষণা চলছে। বিভিন্ন ধরনের তথ্যাদি পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরা

হচ্ছে, রচিত হচ্ছে গ্রন্থাদি। এগুলোর মধ্যে শৌখিন ও পেশাদার উভয় পক্ষীয় গবেষকদেরই কর্মকান্ড রয়েছে। অবশ্যই এগুলো ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার আকর হিসেবে বিবেচিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু য়োশিনারির গবেষণাই নয়, ইতিহাস বিষয়ক একটি সাময়িকীতে ২,৩০০ বছর পূর্বে একজন জাপানি পর্যটক কোন্‌গো সানমাই এর ভারতভ্রমণের কথা তুলে ধরা হয়েছে প্রাচীন চীনা পাণ্ডুলিপি অনুসারে। বলা হচ্ছে, সম্ভবত তিনিই হবেন প্রথম জাপানি যিনি বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ভারত গিয়েছিলেন। কেননা বিখ্যাত চীনা পর্যটক গেন্‌জো (Xuan Zang [হিউয়ান সাং], খৃ:পূ: ৬০২-৬৬৪) তখন ভারত ভ্রমণরত, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে কোন্‌গো এর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মগধের রাজধানী রাজগৃহের মন্দিরে। এই তথ্য লিখিত আছে উক্ত পাণ্ডুলিপিতে। সম্প্রতি জাপানি প্রত্নতাত্ত্বিকদের আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, গেন্‌জো বর্তমান আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশেও ছিলেন। যেখানে সম্রাট কনিষ্ক দুটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত সেখানে প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধমঠ বা বিহার ছিল। যাই হোক, তারও অনেক পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্মের জাপানে আগমন ঘটে। শোতোকু তাইশি (প্রিন্স শোতোকু) নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এর পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে উন্নীত করতে সচেষ্ট হন। সম্রাট অশোকের মতো ভগবান বুদ্ধের জনকল্যাণকর বাণীর মাধ্যমে জনসাধারণকে একটি ধর্মীয় বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিতের লেখক অধ্যাপক হায়াশিমা কিয়োশো জানাচ্ছেন যে, জাপান ও ভারতের মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষ সেতুবন্ধনকারী হচ্ছেন ভারতীয় ব্রাহ্মণ পন্ডিত-সন্ন্যাসী 'বোধিসেনা' (জাপানি নাম বোদাইসেন্‌না)। ৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে জাপানে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মীয় মহানুষ্ঠানে সরকারিভাবে ভারতীয় প্রধান পুরোহিত হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। অন্যদিকে সুবিখ্যাত প্রাচীনতম 'হোরিউজি' বৌদ্ধ মন্দিরে এখনো সংরক্ষিত আছে একাদশ শতকের বাংলা হরফে লিখিত ধর্মীয় কিছু অনুশাসন যা জাপানি পুরোহিতগণ অনুসরণ

জাপানে বৌদ্ধধর্ম আগমনের পরে শাক্যমুনির জন্মস্থান ভারতবর্ষ ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে তীর্থস্থান। কোন কোন রাজন ও বৌদ্ধভিক্ষু ভারতভ্রমণে অগ্রণী হয়েছিলেন। কেউ কেউ মাঝপথে গিয়ে বিফল হয়েছেন। কেউ কেউ সিল্ক পথের বহু বাধা বিপত্তি, বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এক রকম সতীর্থহারা অবস্থায় একা ভারত ভ্রমণ শেষে স্বদেশে ফিরেছেন এমন তথ্য অবগত হওয়া যায়। তবে আজও অনেক অনুসন্ধানী, পন্ডিত, ভিক্ষু ভারতের বৌদ্ধধর্মীয় তীর্থস্থানসমূহ ভ্রমণের যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন।

আধুনিক কালে মেইজি যুগে (১৮৬৮-১৯১২) এসে বাংলা-জাপান শিক্ষা.সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। প্রাচ্যাদর্শবাদী 'এশিয়া ইজ ওয়ান' এই আপ্তবাক্যের দার্শনিক.শিল্পবোদ্ধা.পন্ডিত তেনশিন ওকাকুরা ১৯০২ সালে কলকাতায় থাকাকালীন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন। দুদুবার তিনি ভারত ভ্রমণ করেন। শান্তিনিকেতনে জাপানি চারুকলা শিক্ষা অনুষদ স্থাপন এবং তাঁর জাপানি সতীর্থদের ভারতে পাঠানো--সেইসূত্র.ধরে রবীন্দ্রনাথের পাঁচ-পাঁচবার জাপানভ্রমণ জাপান-বাংলা সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করে তোলে। তারপর দুই বাংলার সুসাহিত্যিক.গবেষক আনন্দশংকর রায়, লেডি অমলা বসু, বুদ্ধদেব বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কৃপালিনী, শান্তিদেব ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশীষ সান্যাল, আহমদ রফিক, মুনীর চৌধুরী, কবীর চৌধুরী, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, হাসনাত আবদুল হাই, ফজল শাহাবুদ্দিন, নির্মলেন্দু গুণ, সমুদ্র গুপ্ত, ইমদাদুল হক মিলন, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল প্রমুখ জাপান ভ্রমণ করে গেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের ভূমিকা সর্বজন বিদিত। সেই সুবাদে জাপানে এসেছিলেন জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব সিলেটের রমানাথ রায়, সম্ভবত তিনিই হবেন প্রথম বাঙালি আধুনিককালে জাপান ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর পর জাতীয়তাবাদী নেতা.মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জাপানে আশ্রয়, শিনজুকু শহরের সুবিখ্যাত 'নাকামুরায়া' ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সোমা আইজো পরিবারের জ্যেষ্ঠকন্যা তোশিকোর সঙ্গে বিবাহবন্ধন, জাপানি নাগরিকত্ব গ্রহণ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জাপান

আগমন এবং পরিশেষে সমাধিস্থ হওয়া যুদ্ধের ষাট বছর পরেও আলোচিত, আলোড়িত হচ্ছে জাপান ও বাংলার জনজীবনে। নেতাজির দেহভস্ম আজও টোকিয়োর 'রেনকোজি' বৌদ্ধ মন্দিরে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষিত হচ্ছে। তাঁর মৃত্যু নিয়ে অশেষ বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও প্রবাসী নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সশরীর উপস্থিত হয়ে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। এসেছিলেন নেতাজির দাদা শরৎচন্দ্র বসু, কৃষ্ণা বসুসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন প্রমুখ। অন্যদিকে যুদ্ধস্মৃতি বহনকারী মণিপুর রাজ্যের অর্ন্তগত 'ইম্ফলে'র মানুষজন আজও যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী জাপানি সৈন্যদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। স্থাপিত হয়েছে যুদ্ধস্মৃতি স্তম্ভ। আজকাল লিখিত হচ্ছে জাপান-ভারত-বাংলা সম্পর্ক নিয়ে বিবিধ গ্রন্থাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালির অহঙ্কারকে আবার জাগ্রত করেছিলেন বিচারপতি পাল তাঁর 'নির্দোষ রায়' প্রদানের মাধ্যমে। আজও তিনি এই সমাজে অবিস্মরণীয়। কানাগাওয়া-জেলার 'হাকোনেমাচি' শহরে 'পাল-শিমোন্নাকা স্মৃতিমন্দির' আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। স্মৃতিমন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত উদ্বোধনী পাথরখন্ডে বাংলায় স্বহস্তে লিখেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। জাপানিরা ভারতীয় উপমহাদেশের মাত্র দুজন ব্যক্তিকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করে থাকেন। তাঁরা হলেন দার্শনিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ন্যায়দন্ডের মূর্তপ্রতীক বিচারপতি ড. পালকে। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীও এদেশে সর্বজন নমস্য একটি নাম। তাঁর মূর্তি জাপানেও স্থাপিত হয়েছে। অন্যতম বৌদ্ধধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 'সোকাগাক্কাই' ভারত ও বাংলাদেশে স্থাপন করেছে প্রতিষ্ঠানের শাখা-অনুষদ। অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই দেশেই গৌতম বুদ্ধ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত নানা অনুষ্ঠান, সেমিনার। সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত রবি শংকর, চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় জাপানের সঙ্গীত-চলচ্চিত্র মহলে যেমন শ্রদ্ধার পাত্র তেমনি অনুকরণীয়। 'নমস্তে ইন্ডিয়া' নামক ভারতীয় উৎসব গত এক দশক ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে টোকিয়োতে। প্রচুর জাপানি তরুণ-তরুণী আগ্রহ সহকারে উপভোগ করে থাকেন ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খাবারদাবার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাপানি নাগরিকদের সহানু-মর্মিতা, সমর্থন, তৎপরতা সর্বজন বিদিত। যে সকল জাপানি ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবী বাঙালির স্বাধিকারকে সেদিন সমর্থন করেছিলেন তাঁরা হলেন প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী রাজনীতিবিদ তাকাশি হায়াকাওয়া, অধ্যাপক ড. কাজুও আজুমা, অধ্যাপক ড. ৎসুয়োশি নারা, রাজনীতিবিদ তামোন ইশিকাওয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বলা হয়ে থাকে মৃত্যুর পর জাপান-বাংলা সম্প্রীতির বন্ধন স্বরূপ তাকাশি হায়াকাওয়ার চিতাভস্মর একাংশ ঢাকার ধর্মরাজিকা বৌদ্ধবিহারে সমাহিত করা হয়েছে। কিছু কিছু জাপানি তরুণ সেই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরসেনানী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপানসফর বাংলা-দেশকে আরও একবার মেধা, শৌর্য-বীর্যকে জাপানিদের কাছে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলা, বাঙালি জাতি--তার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন এমন জাপানি পন্ডিত, বুদ্ধিজীবীও নিতান্ত কম নন। স্বনামধন্য অধ্যাপক কাজুও আজুমা, ৎসুয়োশি নারা, তোমিও মিজুকামি, ড.মাসায়ুকি উসুদা; 'শাপলা নীড়' NPO-র সাবেক প্রেসিডেন্ট ফুকুজাওয়া ইকিবুন, বার্ষিক 'সোওকা' (উজান যাত্রী) সাময়িকীর প্রাক্তন প্রকাশিকা, সম্পাদিকা,অনুবাদিকা কিকুকো সুজুকি, বাংলাভাষার পন্ডিত ড. কিয়োকো নিওয়া এমনি নাম না জানা আরও অনেক।

শুধু রাজনীতি, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, আমার ধারণা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মধ্যযুগের এদো শাসনামলে ভারত তথা বাংলা অঞ্চলের বিখ্যাত তাঁতের সুতা, কাপড় রাজপরিবারসহ সমাজের অভিজাত শ্রেণীর ঘরে পৌঁছে থাকবে সামুদ্রিক বণিক অথবা চীনা পর্যটকদের মাধ্যমে। মেইজি, তাইশো যুগে (১৯১২-১৯২৬) বৃটেন থেকে বাংলা অঞ্চলের বস্ত্রাদি জাপানে সরাসরি আমদানি হত এমন তথ্য অবশ্য পাওয়া যায়। জাপানে প্রাপ্ত ভারতীয় সুতোর কাপড় যাকে জাপানিরা বলেন 'সারাসা'র তার একাধিক নমুনা টোকিয়ো জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ১৭-১৮ শতাব্দীর দিকে 'ইনদো-সারাসা' বা 'Chintz' জাপানে আমদানি হয়। পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়া থেকেও আসে। বাংলার বিশ্ব-

খ্যাত 'মসলিন' কাপড়ের কথা জাপানি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষজন জানতেন না তা অবিশ্বাস্য। খুঁজলে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ জাপানেই পাওয়া যাবে। আধুনিককালে য়োকোহামাতে ভারতীয় সিল্ক (রেশম) বস্ত্রাদির জমজমাট ব্যবসা গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণাঞ্চলের কিউশু, কাগোশিমা অঞ্চল কিংবা ওকিনাওয়া দ্বীপের বস্ত্রশিল্পে যে 'নীল' রঙের ব্যবহার আজও হচ্ছে তার উৎস যে বাংলা অঞ্চল তাতে তো সন্দেহই নেই। এখন তো বাংলাদেশের কোন কোন প্রতিষ্ঠান জাপানি জাতীয় পোশাক ঐতিহ্যবাহী 'কিমোনো'র সিল্ক কাপড় তৈরি করছে বলে পত্রিকান্তরে জানা যাচ্ছে। মেইজি, তাইশো যুগে ভারতীয় কয়লাখনির শ্রমিকরাও জাপানের অগ্রসর কয়লা উত্তোলন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য জাপানে এসেছিলেন তার সংবাদ জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাপানি মিলিটারি ক্যাডেট কলেজে অনেক ভারতীয় তরুণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। ড. কাজুও আজুমার ভাষ্য অনুযায়ী তাইশো ও শোওয়া যুগে--বিশেষ করে যুদ্ধপূর্ব পর্যন্ত জাপানি শিক্ষক, বৌদ্ধধর্মীয় পন্ডিত, ব্যবসায়ী, কারিগর, কাঠমিস্ত্রি, ক্রীড়াপ্রশিক্ষক, চিত্রকর, সঙ্গীত্শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশা মিলিয়ে কমপক্ষে হাজার জন বাংলা অঞ্চলে যাতায়াত, বসবাস, বিয়েসাদি করেছিলেন। এখন কলকাতায় নির্মাণাধীন 'ভারত-জাপান সংস্কৃতি কেন্দ্র' এবং বাংলাদেশের সিলেট জেলায় 'বাংলাদেশ-জাপান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' উদ্বোধন হলে পরে জাপান-ভারত-বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে বিশ্বাস করি। ইতিমধ্যে একটা সৌরভ যেন অদৃশ্য রেণুরাজির সমন্বয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ বছরের এপ্রিল মাসে রাজধানী মহানগর টোকিয়োর অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র 'ইকেবুকুরো' শহরে এই প্রথম বর্হিবিশ্বে নির্মিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার সম্মনার্থে এবং মহান একুশে ফেব্রুয়ারির বীর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ স্মৃতিস্মম্ভ 'শহীদ মিনার', যা একটি বিরাট মাইলফলক বলে মনে করি।
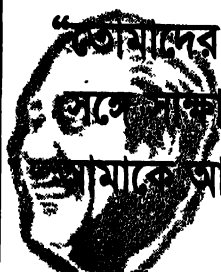
উপরে বর্ণিত এই কিছু সংখ্যক ঘটনা আদৌ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বহু বছরের মানব,জাতির ক্রমবিকাশের ধারারই অংশ এইসব ঘটনা। আজও তা প্রবাহমান বিশ্বব্যাপী। জাপানও তার ব্যতিক্রম নয়।

পরিশেষে বলব, আজকের জাপানে বিদেশী তথা এশিয়াবাসীদের প্রতি এ দেশের নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের যে শীতল মনোভাব এবং যে বৈষম্যমূলক আচরণ অদৃশ্যভাবে বর্তমান, এশিয়ার শ্রমিকদের যে অমানবিক সমস্যা তা দূরীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে দূর/নিকট অতীতের দিকে তাকাতেই হবে। অতীতের জাতিগত রক্তধারার অস্তিত্ব মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা করা হচ্ছে বলেই এক এশিয়ায় থেকেও জাপান ও বৃহত্তর এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তর মানবিক, সাংস্কৃতিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, অন্ততঃপক্ষে গত পাঁচ দশকের মধ্যে। এটা আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে কারও জন্যেই শুভকর নয়।

....

* ২০০২ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত।

* আলোকচিত্র· আবদুল ওয়াদুদ; আরিফুর রহমান ববি; মানচিত্রের সৌজন্যে।

"তোমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। করমর্দন করার পর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। এই স্মৃতি কখনো ভুলবার নয়।"

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর জীবিতকালে তৎকালীন বিশ্বের প্রায় সকল অগ্রগণ্য রাষ্ট্রপ্রধান এবং বুদ্ধিজীবীর সান্নিধ্য ও আন্তরিক বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। যা আর কোন বাঙালি নেতা পাননি। এটা সম্ভব হয়েছিল তিনি একটি উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে। আর সেটিই হচ্ছেঃ বহু বছরের পরাধীন বাঙালি জাতির রাজনৈতিক মুক্তিদান। অকুতো ভয় আত্মত্যাগী এমন জাতীয়তাবাদী নেতা বিশ্বে খুব কমই দেখা গেছে। এই কারণে তিনি বিশ্বনেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। অর্জন করতে পেরেছিলেন বহু বিদেশী কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, অধ্যাপক, শিল্পীর হৃদয়মথিত ভালবাসা। এই সকল ব্যক্তিত্ব কত জন তার হিসেব আমরা নিইনি কোনদিন। কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়নি রাষ্ট্রীয় বা দলীয়ভাবে। ফলে বাঙালি জাতি জানে না তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা কত খ্যাত-অখ্যাত মানুষের মনে একজন আদর্শ বীরের ভাবমূর্তি নিয়ে আজও সমুজ্জ্বল। নতুন প্রজন্ম সেই ইতিহাস জানে না বলেই বর্হিবিশ্বে গিয়ে তাঁর নামও উচ্চারণ করতে পারে না। আজ পর্যন্ত তাঁর একটি 'জীবনী' বা 'আত্মজীবনী' আমাদের হাতে আসেনি! এটা কতখানি দুঃখজনক বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দেশ-বিদেশে তাঁর অনেক ভক্তদের মধ্যে তেমনি একজন হচ্ছেন মাসাআকি তানাকা। ১৯১১ সালে জন্ম কট্টোর জাতীয়তাবাদী এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ছয় বছর আগে টোকিয়োর অদূরে হাচিওজি শহরে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। কথা হয়েছিল অনেকক্ষণ। এমন একজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ হয়েছিল বাংলাদেশে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! তাঁদের দুজনের সাক্ষাৎকার যে নানা দিক দিয়ে অর্থবহ এবং উৎসাহব্যঞ্জক তা বলাই বাহুল্য। এশিয়ার দুই সত্যিকার জাতীয়তাবাদী যাঁরা আন্তর্জাতিক শান্তিবাদেরও ছিলেন মহান প্রবক্তা, এশিয়ার শান্তিরক্ষার্থে সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছেন।

সেই জ্বলন্ত ইতিহাস মাসাআকি তানাকা যখন বার্ধক্যজনিত কারণে হাসপাতালের শয্যায় শুনে মনটা বড় বিচলিত হয়ে উঠল। টেলিফোনে খবরটা জানালেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজোর

নাতনি ইউকো তোজো। আজ হোক কাল হোক তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্মৃতিকাতর অগ্নিযুগের পর্দা নেমে আসবে। যে যুগে এশিয়া মহাদেশ সৃষ্টি করেছে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। দখলদার য়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে হটানোর লক্ষ্যে সুদীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী জাতীয়তাবাদী লড়াই। এই লড়াইয়ের অগ্রসৈনিকের জন্ম হয়েছিল এই জাপানে--তিনি তেনশিন ওকাকুরা। বৃটিশ শাসনের অধীনে থেকে তখন চলছে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার রেঁনেসা আন্দোলন। যার পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। এই আন্দোলন দুজন বিদেশীকে আন্দোলিত করেছিল--একজন তেনশিন অন্যজন আইরিশ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের আত্মত্যাগী কন্যা ভগ্নি নিবেদিতাকে। তাঁদের উদ্যোগ ও সমর্থনে কলকাতায় গঠিত হয়েছিল কট্টোর স্বদেশীদের গুপ্ত বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতির'র। ঢাকায়ও এর শাখা গড়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ হিসেবে তৎকালীন বৃটিশ ভারতের বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজনীতিক সুভাষচন্দ্র বসু, শিক্ষাবিদ হুমায়ুন কবীর, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ। বিশ শতকে এশিয়ায় জাতীয়তাবাদের যে তুমুল উত্থান ঘটেছিল তার নায়করা ছিলেন উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের শেষ উত্তরসূরি।

কিন্তু তানাকা মহাশয় আমাকে বললেন, শেখ মুজিব ছিলেন সার্থক উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। তিনি মুক্তিকামী শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর মতো প্রখর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী এবং দেশপ্রেমিক আর সহসা এশিয়ায় জন্ম নেবেন বলে আমার মনে হয় না। নেতাজির মতো তিনি স্পষ্টতই অনুধাবন করেছিলেন রক্ত আর সশস্ত্র লড়াই ছাড়া বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব। মহান নেতা গান্ধীর পর এশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা এবং মৈত্রীসুলভ সুস্পষ্ট কূটনৈতিক নীতিজ্ঞানসম্পন্ন কোন বড় মাপের নেতা আমি এশিয়া-আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় একমাত্র শেখ মুজিবকেই দেখেছি। ছোট্ট একটি রাষ্ট্রের স্থপতি হওয়া সত্বেও তাঁর পুরুষালী বিশাল ব্যক্তিত্ব, বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে

স্বচ্ছদৃষ্টি তাঁকে বিশ্বের মানুষের কাছে একজন মহান রাষ্ট্রনায়কে উন্নীত করেছিল। এটা সত্যি ব্যতিক্রম। আমরা তাঁর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর হত্যাকান্ড এশিয়াসহ বিশ্বের জন্য এক অপরিসীম ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা প্রচন্ড বেদনাহত হয়েছি।

সেদিন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আবেগাপ্লুত তানাকা মহায়শয়ের মূল্যায়নে আমি শিহরিত হয়েছি। আমি এইসব কথা একজন অসাধারণ মানুষের মুখ থেকে শুনে প্রচন্ডভাবে গৌরবান্বিত হয়েছি। আমি জানতে চাইলাম তাঁর পরিচয় এবং কিভাবে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতে সক্ষম হলেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর লিখিত কিছু গ্রন্থ, পুরনো সংবাদচিত্র আমাকে দেখালেন। সেগুলো দেখে তাঁর সুবিশাল কর্মজীবনের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হলাম। হলাম আন্দোলিত। মেইজি ৪৪ অর্থাৎ ১৯১১ সালে নাগানো-জেলায় জন্ম মাসাআকি তানাকা স্থানীয় ঈদা বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হওয়ার পর টোকিয়ো আজিয়াগাকুজুকু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন তখনকার জাপানের গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাজনীতির আলোকে জাগ্রত শান্তিবাদী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং পরবর্তীকালে জাপানের দশ জন শিক্ষাবিদের অন্যতম ইয়াসাবুরো শিমোনাকার শিষ্য হন। পরে টোকিয়ো এসে শিমোনাকা প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত আজিয়াগাকুজুকু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা শুরু করেন। তখনই, সেই তরুণ বয়সে জাপান-এশিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৩৩ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে তৎকালীন জাপানস্থ 'আজিয়া কিয়োকাই' অথবা 'দি এশিয়া এসোসিয়েশনে' সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস ফর ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন-জাপান এর কর্মসচিব নিযুক্ত হন। এশিয়ার দেশসমূহে স্বাধীনতার আন্দোলনে তাঁর রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। এছাড়া তিনি কিছুদিন জাপানি রাজকীয় স্থলবাহিনীর অন্যতম জেনারেল মাৎসুই ইওয়ানের সচিব ছিলেন। যিনি টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনালের রায়ে ফাঁসীর দণ্ডাদেশে দন্ডিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তানাকা মহাশয় 'নানশিনজিজিশিম্বুন্' সংবাদপত্রের

সম্পাদক, প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকুশোকু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভৃতি দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও লিভারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) তরুণ সাংসদ ও রাজনীতিকদেরকে রাজনীতির পাঠ দিতেন।

তাঁর রচিত কতিপয় গ্রন্থ এক কথায় অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রামাণ্য দলিল। পাআরু হাকুশি নো নিহোন মুজাই রোন (বিচারপতি পালের জাপান নির্দোষ রায়), আজিয়া নো আকেবোনো (এশিয়ার উন্মেষ), নান্‌কিন গিয়াকুসাৎসু নো সোকাৎসু (নান্‌কিন হত্যাযজ্ঞের সংক্ষিপ্তসার), আজিয়া দোকুরিৎসু এ নো মিচি (এশিয়ার স্বাধীনতার পথ), দাই আজিয়া ছেনকাকু দেন্ (বৃহৎ এশিয়ার অগ্রযাত্রা বৃত্তান্ত), ইনদো নো তোসো সুভাষ চন্দ্রা বোউস (ভারতের সংগ্রাম: সুভাষচন্দ্র বসু), শিনরি নো সাবাকি পাআরু নো নিহোন মুজাই রোন (সত্যের বিচার: ড.পালের জাপান নির্দোষ রায়), হেইওয়া নো ছেন্‌গেন্: পাআরু গেনগো রোকু (শান্তির ঘোষণা: পালভাষ্য সংকলন), নিহোন মুজাই রোন (জাপান নির্দোষ রায়), সেকাই রেনপো উনদো নিজু শু নেন (ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন মুভমেন্টের বিশ বছরের ইতিবৃত্ত), সেকাই রেনপো.সোনো শিসো তো উনদো (ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন: দর্শন ও আন্দোলন), পাআরু হাকুশি নো কোতোবা (বিচারপতি পালের ভাষ্য) প্রভৃতি গ্রন্থ। এশিয়ায় হারিয়ে যাওয়া একটি অগ্নিযুগের ইতিহাস রচনায় এই গ্রন্থগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। গ্রন্থগুলো পাঠ করে ভারতীয় উপমহাদেশ ও জাপানের সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম সেই ইতিহাস লিখব।

তাঁর বৈঠকঘরের চর্তুদিকে ড. পালসহ নানা ঘটনার ছবি দেখে তাঁকে জিগ্যেস করলাম, বাংলাদেশে কখনো গিয়েছেন কিনা? সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, অবশ্যই গিয়েছি। ১৯৭২ সালে। তোমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। করমর্দন করার পর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। এই স্মৃতি কখনো ভুলবার নয়।

আমার মুখ থেকে কোন কথা সরছিল না। আনন্দে, আবেগে আপ্লুত আমি জিগ্যেস করলাম, স্যার, সেই সাক্ষাতের কোন ছবি আছে কি?

বললেন, আছে। আমার শোবার ঘরে। এসো তোমাকে দেখাচ্ছি। যা কেউ জানে না।

আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে। সেখানে মাঝারি একটি শো-কেসের উপর রক্ষিত সাধারণ আকৃতির চেয়ে বেশ বড় একটি ছবি দেখতে পেলাম। করমর্দনরত দুজনের সাহাস্য ছবি। আমি যেন হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত রত্নের সন্ধান পেলাম! হাতে তুলে নিয়ে দেখছিলাম। তিনি হাসিমুখে আমাকে বললেন, ১৯৭২ সালে চার সদস্যের একটি দল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাকুয়েই তানাকা মহাশয়ের নির্দেশে ঢাকায় যায়। এই দলের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী তাকেশি হায়াকাওয়া মহাশয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। শেখ মুজিবর রহমানের গুণমুগ্ধভক্ত। তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই শুধু বেসরকারি ব্যক্তি ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, আপনি গান্ধী, নেহেরু, রাসবিহারী বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে দেখেছেন, তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। তাঁদের সুযোগ্য উত্তরসূরি বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবর রহমানকে জাপান সফরের আমন্ত্রণ করে আসুন। বলবেন জাপান তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ জাপান তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা প্রদানের জন্য অপেক্ষা করছে। যদিও মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ছিল অল্প কিন্তু যে আন্তরিকতা দিয়ে তিনি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তা ছিল অতুলনীয়। তাঁর সান্নিধ্য এখনো আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়।

সেদিন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বর্ষীয়ান তানাকা মহাশয়ের মন্তব্য এবং ভালবাসা আমার দুচোখ ভরে উষ্ণঅশ্রু এনেছিল। বললাম, স্যার এই ছবিটি আমি অনুলিপি করার অনুমোদন পেতে পারি কি?

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বলে ছবিটি ফ্রেম থেকে খুলতেই নিজেই আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওও! দুটো দেখছি ছবি! তুমি খুব ভাগ্যবান। একটি ছবি তোমাকে উপহার দিচ্ছি।

আত্মহারা হয়ে তাঁর হাত থেকে জাপানি কায়দায় কপালে ছুঁইয়ে

ছবিটি গ্রহণ করলাম। আমার বুকটা ভরে গেল অপূর্ব এক আনন্দে। এসেছিলাম টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনালের (১৯৪৬-৪৮) এগারো জন বিচারপতির অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পালের পুত্রসম অনুসারী তানাকা মহাশয়ের কাছে পাল সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব বলে। তাঁকে বললাম ড.পাল ভারতীয় হলেও তাঁর জন্ম হয়েছে বর্তমান বাংলাদেশে। সেই কথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেখো দেখো ড.পালের জন্মভূমি থেকে এসেছেন মি. সরকার!

তাঁর স্ত্রী এসে মাথা নত করে জাপানি কায়দায় আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

পুনরায় বৈঠকখানায় ফিরে আসতে গিয়ে দেয়ালে দেখলাম প্যালেস্টাইন স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে তানাকা মহাশয়ের একটি বাঁধানো ছবি। তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, কী সৌভাগ্য তানাকা মহাশয়ের! যিনি উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় শেষ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানেরও উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এক জীবনে। তাও সম্ভব হয়েছিল জাতীয়তাবাদী নেতা কাকুয়েই তানাকার আগ্রহেই। জিগ্যেস করলাম, স্যার, এত বড় বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশেছেন কিন্তু শেখ মুজিবকে এত আলাদা করে নিভৃতে কাছে রাখার কারণ কি?

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বললেন, শেখ মুজিব ছিলেন এশিয়ার আপোষহীন শেষ বীরযোদ্ধা। যিনি একটি বিদেশী শক্তির পরাধীন জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। এটা তুলনাহীন। যখনই তাঁর প্রতিকৃতিটি দেখি আমার সমস্ত অতীত ঝলসে ওঠে! রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিবিম্ব তাঁর মুখমন্ডলে ভেসে আছে দেখতে পাই। যা আজও আমাকে চঞ্চল করে। তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গনের সেই অনুভূতি থেকে আমি অনুভব করেছি, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালিকে তাঁর মতো করে কেউ কখনও ভালবাসবেন কিনা সন্দেহ আছে। আমার শ্রদ্ধা, ভালবাসার এই মানুষটি একজন মহান মানুষ ছিলেন

এশিয়ার বুকে--তাঁর মতো বীরের স্পর্শধন্য হওয়া আমার জীবনের অনন্য এক ঘটনা। যে কারণে আমার শিয়রের কাছে তাঁকে রেখে দিয়েছি।

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৯৫ বছর বয়সে মাসাআকি তানাকা মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের মধ্য দিয়ে এশিয়া মহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অগ্নিজ্বলা এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

....

* ২০০৬ সালে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত।

* আলোকচিত্র: তানাকা মাসাআকি; মানচিত্রের সৌজন্যে।

ইচিনোসে
তাইজোর চোখে
সদ্য স্বাধীন
বাংলাদেশ
বুকের মধ্যে ছিল সর্বক্ষণ আতরুণ লালিত স্বপ্ন:
'আঙ্কোরভাটে' একদিন যাবেন, ছবি তুলে বিশ্ববাসীকে
জানাবেন তাঁর অভিযানের কাহিনী। কিন্তু ভাবতে
পারেননি কখনো খেমাররুজ গুপ্তচরদের হাতে মুছে
যাবে তাঁর জীবন-প্রদীপ। যে আলোর শক্তিতে তিনি
প্রতিদিন তাঁর স্বপ্ন-চোখকে ধুয়েমুছে নিতেন

বয়স হয়েছিল মাত্র ২৬, যখন তিনি নিখোঁজ হন যুদ্ধ কবলিত কম্বোডিয়া থেকে। ছিলেন আলোকচিত্রগ্রাহক। তাইজো ইচিনোসে। যুদ্ধক্ষেত্রের আলোকচিত্রী হতে চাননি কখনো খ্যাতিমান রবার্ট ক্যাপা, কর্নেল ক্যাপা, জেমস্ ডীনের মতো। মূলত স্বপ্ন ছিল অন্যরকম। তার বুকের মধ্যে লালিত হয়েছিল দুটি প্রত্যাশা। একটি মার্কিন দেশের বিখ্যাত 'পুলিৎজার পুরস্কার' অর্জন অন্যটি কম্বোডিয়ার প্রত্নস্থাপত্য 'আঙ্কোরভাট' এর ছবি তোলা। যেতে পেরেছিলেন আঙ্কোরভাটের কাছাকাছি। গিয়েওছিলেন কিন্তু সেখান থেকেই হারিয়ে গেলেন চিরতরে। যুদ্ধের চিত্রগ্রাহক হতে চাননি বলেই কি যুদ্ধ তাকে ছিনিয়ে নিল? এর কোন উত্তর নেই।

১৯৭৩ সাল, তখন চলছে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া জুড়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছবি তুলেছেন সেইসব যুদ্ধক্ষেত্রের। তার মধ্যেই স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গেও তৈরি হয়ে গিয়েছিল চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সেইসব দুর্লভ অভিজ্ঞতার আলোকচিত্র পাঠিয়েছেন জাপানে, প্রকাশিত হয়েছে সুবিখ্যাত.মর্যাদাসম্পন্ন 'আসাহিগ্রাফ্' সাময়িকীতে। দৈনিক 'আসাহিশিম্বুন' পত্রিকার সঙ্গে ছিল পেশাগত সম্পর্ক। তাঁর প্রতিভার প্রথম প্রহর উন্মোচণকারী স্বনামধন্য প্রভাবশালী কাগজ। জাপানে ফেলে যাওয়া পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হয়েছে চিঠি বিনিময়। বুকের মধ্যে ছিল সর্বক্ষণ আতরুণ লালিত স্বপ্ন: 'আঙ্কোরভাটে' একদিন যাবেন, ছবি তুলে বিশ্ববাসীকে জানাবেন তাঁর অভিযানের কাহিনী! কিন্তু ভাবতে পারেননি কখনো খেমাররুজ গুপ্তচরদের গুলিতে মুছে যাবে তাঁর জীবন-প্রদীপ। যে প্রদীপের আলোতে তিনি প্রতিদিন তাঁর স্বপ্ন-চোখকে ধুয়ে মুছে নিতেন।

নিখোঁজ হওয়ার পর ১৯৮২ সালে তাইজোর পিতামাতা সন্তানের মাথার খুলি, অস্থি কম্বোডিয়ার এক জঙ্গলাকীর্ণ ঘাসবন থেকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হন। খুঁজে পান ছেলের তোলা প্রায় ৫০০টি নেগেটিভ। অধিকাংশই ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়ার যুদ্ধের আলোকচিত্র। অত্যন্ত মূল্যবান সেইসব আলোকচিত্র পরিস্ফুটন করে, পিতা ছেলের ছবি ও চিঠি পত্রাদির সমন্বয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৯৪ সালে। 'ইচিনোসে তাইজো: ছেন্‌বানিকিয়েতা ক্যামেরাম্যান' অর্থাৎ 'ইচিনোসে তাইজো: যুদ্ধ-

ক্ষেত্রে হারিয়ে যাওয়া ক্যামেরাম্যান' এই শিরোনামে। উক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত তাইজোর চিঠি থেকে জানা যায় যে, তিনি কম্বোডিয়ায় প্রবেশের পূর্বে ভারতের কলকাতা ও বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন কিছুদিনের জন্য।

তাইজো সাগা-জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের ১ তারিখে। স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করে টোকিয়ো নিহোন দাইগাকু গেইজুৎসু (নিহোন বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পকলা) অনুষদের ফোটোগ্রাফি বিভাগে ভর্তি হন ১৯৬৬ সালে। সেই সময় টোকিয়োর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তুমুল ছাত্র-আন্দোলনের জোয়ারে অশান্ত, অস্থির, প্রকম্পিত। সেইসব রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ছবিও তিনি ক্যামেরাবন্দী করেন।

ছাত্রকালীন মুষ্টিযুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার চর্চায় কিছুদিন নিযুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় খেলায় গৃহীত আলোকচিত্রের সংকলন হিসেবে 'আই'ম এ বক্সার' নামে একটি অ্যাল্বাম্ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত দক্ষিণাঞ্চলের 'আরিতা' নামক স্থানের মৃৎশিল্প বিষয়ক আলোকচিত্রের অ্যাল্বাম্ 'আরিতা নো নিওই' বা 'আরিতার সৌরভ'ও প্রকাশ করেন। যা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেইসময়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর ইউ.পি.আই (United Press International) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার টোকিয়ো ব্যুরোতে চাকরী নেন ১৯৭০ সালে। কিন্তু ১৯৭১ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে টোকিয়োর অদূরে ফুসা শহরস্থ য়োকোতা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ফোটোশপ বা স্টুডিও চালু এবং অবসর সময়ে পার্টটাইম কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করেন ভিয়েতনাম ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। ভিয়েতনাম যাত্রার পূর্বে কলকাতা হয়ে বাংলাদেশ গমন করেন ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

মাঝি পর্যন্ত টোকিয়োর আসাকুসা ফোটোগ্রাফিক কালচার সেন্টার মিলনায়তনে তাইজোর জীবন ও কর্ম বিষয়ক একটি আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সাজানো ছিল ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার গৃহীত বহু ছবি। প্রদর্শিত হয় তাইজোকে নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের

তৈরি তাঁর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র। কিন্তু সেখানে বাংলাদেশ বা কলকাতার কোন চিত্র স্থান পায়নি। টোকিয়োর একটি টিভি চ্যানেলেও তাইজোর উপরে দীর্ঘ একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয় কয়েক বছর পূর্বে কিন্তু সেখানেও বাংলাদেশের প্রসঙ্গ থাকে অনুল্লেখিত।

বর্তমান রচনায় আলোকচিত্রী তাইজো ইচিনোসের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় থাকাকালীন বর্ণনা তাঁর চিঠিতে যেভাবে পাওয়া গেছে সে সম্পর্কে একটি রেখাচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ছাত্রজীবনের এক বন্ধুর কাছে লিখিত চিঠি থেকে জানা যায়, তাইজো কলকাতা থেকে বাংলাদেশের ভিসা সংগ্রহ করেন জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখে। অবশ্য এর আগে, কলকাতা যাত্রার প্রাক্কালে জনৈক পরিচিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জানতে পারেন তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন। তাইজো তার সঙ্গে ভারতের দিকে যাত্রা করেন।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখে একই বন্ধুকে লিখিত চিঠি থেকে ঢাকার বিস্তৃত বর্ণনা যা পাওয়া যায় তা এই রকমঃ গতকাল, ঢাকার উচ্চশ্রেণীর হোটেল থেকে সস্তা হোটেলে স্থানান্তরিত হয়েছেন। রুম মোটামুটি ভালোই, আগের হোটেলে অনেক টাকা ব্যয় করে তাঁর ক্ষতিই হয়েছে।.........মুক্তিবাহিনীর জীপে চড়ে পাহারা দেবার সময় বিহারীদের স্বয়ংক্রীয় অস্ত্রের মুখে পড়েন, প্রথমেই ভারতীয় একজন সাংবাদিক রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে যান, তাইজো রাস্তায় পড়ে যাওয়ার সময় একজন ছাত্র কমান্ডার তাঁকে রক্ষা করেন কিন্তু কমান্ডারটি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ায় ছবি তোলার কোনও সুযোগ পাওয়া যায়নি, কিন্তু নিকোন এফ. সিরিজের ক্যামেরাটি দলে মুচড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। পরেরদিন সারারাতব্যাপী মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা বিহারী অঞ্চলে গোলাগুলি করে, সান্ধ্যআইন দিয়ে রাখে। তখন তাইজোও আহত হন এবং ভালো কিছুই এখানে নেই বলে আক্ষেপ করেন। অবশ্য পরে লিখেছেন, ইউ.পি.আই, এ.এফ.পি, রয়টার এর সাংবাদিকদের সঙ্গে চলাচল করছেন বলে অনেক কিছু দেখাশুনা করা যাচ্ছে। সাংবাদিক দলে আছেন বলেই সরকার পক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করে গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছেন, খরচও কমছে।

শেষ পর্যন্ত ঐ দলের একজন সদস্য এবং আসাহিশিম্বুনের একজন ফোটো-সাংবাদিক হিসেবে তাইজো ঢাকায় থেকে যান। যদিও বাংলা-দেশে ছবি তোলার মতো তেমন কিছু নেই। ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাঘুরি বৃদ্ধি পেলেও ছবি তোলার সুযোগ পাচ্ছেন না বলে দুঃখ করছেন। ফলে ক্ষান্ত দিয়ে ভিয়েতনাম যাবেন কিনা ভাবছেন। এমন সময় জানা গেল জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার কথা। সেটা দেখে যাবেন কিনা মনে করেই সস্তা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। আর স্বীকৃতি দিলেই বা কি, ছবি তোলার সুযোগ নেই। বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘোরাঘুরির কারণে তিনি যে 'চীনা' নন প্রমাণ দিতে হচ্ছে বারবার। যখন বুঝতে পারেন যে, তিনি চীনা নন তখন সেনাবাহিনীর লোকেরা সহযোগিতা করে। তাছাড়া ভাষাও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাংলাদেশের মানুষের ইংরেজি অর্ধেকও বুঝতে পারছেন না।

ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে হাঁটা ধরলে আবার দল বেঁধে লোকজন পেছনে লেগে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'জয় বাংলা' স্লোগানও দেয়। ন্যাংটা ছেলে থেকে শুরু করে রাস্তায় শুয়ে থাকা বৃদ্ধরা পর্যন্ত কণ্ঠ মেলায়। আজ সকালে বিহারীদের ক্যাম্পে গিয়ে মানুষের মৃতদেহ কুকুর ও কাকে টেনে ছিঁড়ে খাওয়ার দৃশ্য দেখে; কবে থেকে না খেয়ে থাকা মৃতপ্রায় লোকজনকে দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এর আগেও (যুদ্ধকালীন) বাংলাদেশের বেদনাদায়ক অবস্থা দেখে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন। যুদ্ধ মানব জীবনে যা বয়ে নিয়ে আসে তার মধ্যে যাঁরা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায় না তাঁদেরকে শক্তিবলে নিয়ে এসে অশান্তির মধ্যে ফেলে দেয় বলে মন্তব্য করেছেন।

এ সকল দেখার পরে আজকেও খাবার মুখে তোলা যাবে কিনা যখন দুশ্চিন্তা করছিলেন তখন ঢাকায় ফিরে আসা দৈনিক আসাহিশিম্বুন পত্রিকার এক সাংবাদিক একসঙ্গে খাওয়ার আমন্ত্রণ করলেন। ঢাকায় আর যাইহোক, দ্রব্যমূল্য অত্যধিক দাম বলেছেন। তাই রাস্তার দোকানে কারির প্লেট হাত নিয়ে খেতে হচ্ছে (কারির মধ্যে আবার মাছি বসে থাকা সাধারণ ব্যাপার; মাঝেমাঝে পচাও থাকে), কখনও বা খেতে হচ্ছে কলা। রোগাক্রান্ত হওয়া যদিও প্রধান দুশ্চিন্তা তারপরও পেটভরে খেয়ে নিচ্ছেন।

ফেলেছেন। ইউ.পি.আই এর সাংবাদিকদের সঙ্গে থেকে দেখছেন যে, এখানে ক্যামেরাম্যান যে কেউ জনপ্রিয় কিন্তু ছবি তোলার মতন কিছু আছে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশও করছেন। এক জায়গায় জুতো মূল্যবান সম্পদের মতো ব্যবহার করছেন বলে লিখেছেন।

একই বন্ধুকে লিখিত ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের ৬ তারিখের চিঠি। এ চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে, তাইজো মার্চ মাসের ১ তারিখে কলকাতায় ফিরে যান। বাংলাদেশে এক মাস ছিলেন বলে জানাচ্ছেন। বাংলাদেশে তোলা ছবির নেগেটিভ ইউ.পি.আই এর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। গত এক মাসে তোলা ঢাকার ছবি ইউ.পি.আই কর্তৃক জাপানে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে কেনেডির আগমনের ছবিও তাঁর তোলা বলেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত একজন বিদেশী সাংবাদিক হিসেবে ঢাকায় ছিলেন, কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি সংস্থা থেকে আসা খ্যাতিমান সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে নিজেও শক্তিশালী মনে করছেন। তাঁর জীবনের আদর্শ ছিলেন ইউ.পি.আই এর সাংবাদিক মি. সাওয়াদা, যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের ছবি তুলে 'পুলিৎজার পরস্কারে' ভূষিত হয়েছিলেন। সর্বক্ষণ তাঁকে মি. সাওয়াদা এই বলে উৎসাহ দিতেন যে, ছবি তোলার আগে তুমি ইংরেজিটা ভালো করে আয়ত্ব করে নাও। যখন তাইজো ইংরেজি অভিধান নিয়ে ঘুরছেন তখন বড় ভাইয়ের মতো সাওয়াদা মহাশয় খুশি হয়ে বলতেন, "এই তো করছো দেখছি।" আবার সুযোগ হলে একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করেছেন তাইজো। ভারতে থাকাকালীন ভারতীয় সৈন্যদের হাতে বন্দী হলে পরে এন.বি.সি-র স্থানীয় মহিলা পরিচালক তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, অল্প বয়স সত্ত্বেও ভালোই কাজ করছো। লড়াই করো! বলে সাইগনে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে গেলে পরে মনোবাসনা পূর্ণ হবে ভেবে সেখানে গিয়েছিলেন।..........

নবজন্ম বাংলাদেশের ভিতরে পাকিস্তানপন্থী বন্দী হিসেবে বিহারী-দের জীবন যাপনের একটি অংশের চিত্র তিনি তুলেছেন। তাঁরা কর্ম-খাদ্য-বস্ত্র-পথ্যহীন সর্বোপরি অসন্তুষ্ট চিত্তে বিদেশীদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

থাকা বিহারীরা নিজেদের রক্ষাকল্পে সাঈদপুরে একত্রিত হয়। এই ক্যাম্পে বিহারীরা বাজার স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবনযাপন করছে। বাঙালি ও ভারতীয় সৈন্যরা পাহারা দেয় এই ক্যাম্প। সন্ধ্যা হলেই তারা বাজার গুটিয়ে নেয়। রাত্র ১০টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত প্রতিদিন সান্ধ্যআইন থাকে। রাত ১১টার পরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। তাইজো ক্যাম্পের ভিতরে অন্ধকারে বিহারীদের সঙ্গে চলাচল করতেন ও ছবি তুলতেন। এভাবে ছবি তোলায় শক্তি অর্জন করছেন লিখেছেন।

আদমজী জুট মিলও তাইজো পরিদর্শন করেন। জুট মিলের ভিতরে বন্দী বিহারীদের দুঃখ, কষ্টময় জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। মিলের বাইরে একটি ভবনের প্লটের পেছনে ডোবা জাতীয় স্থানে গিয়ে দেখেন বাঙালির হাড়গোড় প্লটের তলদেশ থেকে খুঁড়ে তুলে আনা হচ্ছে। পরের দিনও খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। ছবি তুলতে বারণ করা হয়েছে। পরের দিন পরিদর্শনেও নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় সেখানে যাওয়া হয়নি।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে কেনেডি এই মিল পরিদর্শনে এলে তখনই শুধু বিহারীদেরকে ভালো খাবার, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। (এর ছবি ইউ.পি.আই এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।)

ঢাকা থেকে ২ ঘন্টার পথে মুরাবুরা নামক গ্রামেও তাইজো গমন করেন লাল ইটের তৈরি ভবন যা ক্যাম্প--তার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে অনেক বুড়ো, মহিলা, শিশুদের ঠেসে রাখা হয়েছে। কান্নার রোল অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। ইউ.পি.আই, এ.পি, রয়টার, এ.এফ.পি-র সাংবাদিকদের সঙ্গে ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ সেখানে যান। ক্যাম্প পরিদর্শনের অনুমতি থাকা সত্বেও তার ভিতরে প্রবেশ করা যায়নি, বাইরে থেকে ছবি তুলতে হয়েছে। ১২ তারিখে পুনরায় অনুমতি ছাড়াই ইউ.পি.আই এর সাংবাদিকদের সঙ্গে সেখানে গেলে দেখা যায় মূল ভবনের চতুর্দিকে বিহারীদের জন্য গৃহাদি তৈরি হচ্ছে। পরের দিন সেই ভবনের ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তোলা ছবি অধিকাংশ ইউ.পি.আইকেই হস্তান্তর করেন। ফেরার পথে নৌকার মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত অদ্ভুত কান্নার সুর শোনা যায়। এই ধরনের ক্যাম্প মীরপুর, করুফে

(?)ও আছে কিন্তু মিডিয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি।.........

সাঈদপুরে তোলা ছবির মধ্যে, ভবনের সিঁড়িতে বসে থাকা সাদা কাপড়পড়া একজন মহিলার কথা বলছেন, যখনই গেছেন তাঁকে সেভাবেই বসে থাকতে দেখেছেন। সাধারণত ক্যামেরা দেখলে লোকে মুখ লুকায়, কিন্তু তিনি মোটেই না নড়ে চড়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েই থাকেন, ঠোঁটও খোলেন না। কাউকেই জিজ্ঞেস করে মহিলার কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এই হচ্ছে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোকচিত্র গ্রাহক ইচিনোসে তাইজোর মানসিক ছাপ। কালের পরিক্রমায় তাঁর গৃহীত ছবি যে অধিকতর মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে সংযুক্ত করার জন্য তাঁর গৃহীত ও দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলো সংগ্রহ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

....

* ২০০০ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত।

শাপলা নীড় এক অনন্য উদাহরণ
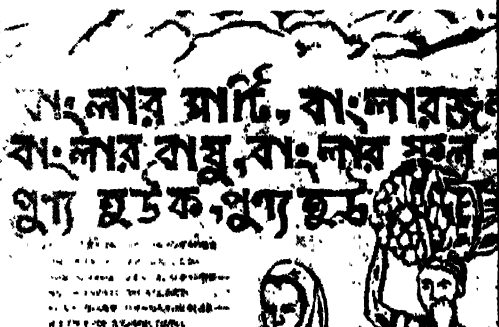
বাংলাদেশের গণমানুষের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল স্থানীয় এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করছে তাদের অনেক কিছুই শেখার আছে 'শাপলা নীড়ে'র কাছ থেকে

শাপলা নীড় এক অনন্য উদাহরণ

আমার একটি ধারণা আছে এনজিও (NGO) সম্পর্কে যে, এরা দীন-দুখী অসহায় মানুষের দারিদ্রকে বিকিয়ে দিয়ে, ধনী লোকের করুনাকে ক্রয় করে। সে করুণা আর কিছু নয় যৎসামান্য চাঁদার অর্থ যা দিয়ে দরিদ্র মানুষ দিন গুজরান করে। দরিদ্র দেশের কিছু সংখ্যক লোক তো বটেই, বেশির ভাগ এনজিও গঠিত হয়ে থাকে ধনী, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে। অনেকে বলে থাকেন সমাজ পলাতক তরুণরাই এনজিওগুলোর দিকে ঝুঁকে থাকে। তবে এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবা এক জিনিস নয়। দুটো করে খুব কম মানুষই সফল বা অর্থনৈতিকভাবে স্বরির্ভর হতে পারেন। তবে এনজিও করা বা দুস্থ মানুষের সেবা করার মধ্যে মাহাত্ম্য আছে বৈকি। ভালো এনজিও যেমন আছে তেমনি স্বার্থান্বেষী স্বেচ্ছাসেবকেরও অভাব নেই। কিন্তু এটাও সত্য কথা যে, এনজিও বা ধনী দেশের সাহায্য দিয়ে কোন দেশই সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি দরিদ্র দেশ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা অর্জন করতে না পারে। স্বচেষ্টায় স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে মুষ্ঠিমেয় কিছু এনজিও আছে যারা দরিদ্র বা পিছিয়েপড়া মানুষের জন্য উদাহরণ হতে পারে। শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নয়--বিভিন্ন দিক দিয়ে। জাপানের অন্যতম নাগরিক সাহায্য নির্ভর এনজিও 'শাপলা নীড়' তেমনি একটি সংস্থা। এটি বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই গ্রামাঞ্চলে মানব উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের বয়সের সমান বয়স এই বেসরকারি সংস্থাটির। অবশ্য সম্প্রতি নেপালেও এর প্রকল্প সম্প্রসারিত হয়েছে। এটা সংস্থাটির কর্মীদের অগ্রগতির সাফল্যেরই প্রমাণ বহন করে।

এই দেশে দু'দশক বাস করার ফলে জাতিটির অনেক দিক কিছুটা হলেও দেখেছি। দুটো বিষয়ে আমার মাথাকে তাদের কাছে নত করতে বাধ্য হয়েছি তা হল, জাপানিদের জানার আগ্রহ আর স্বনির্ভর হওয়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম। এদেশে দেখেছি কেউ যদি একটা কিছু করার জন্য অগ্রসর হয় তাহলে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী সকলেই তাকে সহযোগিতা করতে লেগে পড়ে। এই যে সমবায়ী মানসিকতা তার বাস্তবিকই তুলনা মেলা ভার। এখানেই তাদের সঙ্গে বাঙালির আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, বাংলা অঞ্চলে সমবায় আন্দোলন একদা সারা পৃথিবীতে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল, অর্জন করেছিল প্রশংসা, গৌরব। খুব বেশিদিনের কথা নয়, স্বাধীনতার পর কুমিল্লার 'বাস ড্রাইভারস্ মালিক সমিতি' সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে তুলেছিল অনুকরণীয় একটি প্রতিষ্ঠান। অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে ভরাডুবিও ঘটেছে। এখন সেসব শুধুই স্মৃতি। বাংলাদেশে এখন সমবায় সমিতি বলতে দুর্নীতি আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বকেই বোঝায়। এটা জাতির অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক মেরুদন্ডের ভিতরে ক্ষয়রোগের মতোই কাজ করছে।

কিন্তু শাপলা নীড়ের দিকে তাকালে আমরা কি দেখি। তারা এমন কোন বৃহৎ প্রকল্পও হাতে নেয়নি, আহামরি পরিকল্পনাও নয়--স্রেফ্ বাংলাদেশের গ্রামীণ সভ্যতা থেকে বিলুপ্তপ্রায় একটি ধারণা 'সমিতি'কে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে আজকে জাপানের উল্লেখযোগ্য একটি এনজিও হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অবশ্য সমিতির পরিচালনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে জাপানি ব্যবস্থাপনাকে। সমিতির সদস্যরা কিভাবে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার ভিত্তিতে স্বনির্ভর হওয়া যায় তারই শিক্ষা দিয়ে আসছে সংস্থাটি সুদীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে।

বাংলাদেশে কর্মরত বহুজাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে শাপলা নীড়ের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য হল এই যে বৃহৎ সাহায্য সংস্থাগুলো সাময়িকভাবে মানুষকে সাহায্য করে থাকে। দায়দায়িত্ব বা জবাবদিহিতার কোনও বালাই তাদের নেই। যেন টাকা আছে সেটাকে খরচ করাই বড়কথা। দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদির সময় ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সাময়িকভাবে সাহায্য করাই বহুজাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর মূল উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয়। আসলে এটা একটা নোংরা রাজনীতি--গরীবকে গরীব করে রাখার চেয়েও অলস, অকর্মণ্য পরমুখাপেক্ষীজীবে পরিণত করে রাখা। জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সাহায্য সংস্থা কিংবা ধনী দেশগুলোর সরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোর কথাই ধরা যাক, বিশ্বের এমন কোন সাহায্য সংস্থা এবং এনজিও নেই যা বাংলাদেশে কাজ করছে না! কিন্তু কারোরই পুরোপুরি সফলতার কথা শোনা যায় না। যতখানি কাজ করছে তারা তার

চেয়েও বেশি হচ্ছে প্রচার। সত্যি কথা বলতে একমাত্র ব্যতিক্রম দেখতে পাই জাপানি দু/একটি এবং বাংলাদেশের দু/তিনটি এনজিওর কর্মকান্ড।

অবশ্যই প্রথমে আসে শাপলা নীড়ের কথা। দ্বিতীয় আরেকটি সংস্থা আছে 'রশুন', যাঁদের কর্মকান্ড শাপলা নীড়ের মতো বহুমাত্রিক নয়। রশুন মূলত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ, কুটিরশিল্প এবং বাংলার রান্নাবান্নাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। রশুন প্রধান 'মাগামি' দম্পতি তাদের সংস্থার বেশির ভাগ সদস্যই হচ্ছেন মহিলা। তাঁদেরকে বাংলা ভাষা পাঠদান ও রন্ধন প্রণালী শেখান নিয়মিত। চাঁদা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে। অভিজাত হোটেলগুলোতে টিভি ও চলচ্চিত্রশিল্পীদেরকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে রশুনের প্রকল্পতে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের বাজার উন্মুক্ত করাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। সঙ্গে থাকে ফ্যাশন শো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে বাংলাদেশের দারিদ্রটা সরাসরি আসে না। বরং মর্যাদার সঙ্গে তাঁরা বলে থাকেন আগত অতিথিদেরকে যে বাংলার মেয়েরা একটু শিক্ষা পেলে কী চমৎকার কাজ করতে সক্ষম--সেই কথা। উপস্থাপন করেন প্রমাণস্বরূপ তাঁদের তৈরি পণ্যসামগ্রী। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদেশে দেশী পণ্যের আয়োজনের চেয়ে রশুন বা শাপলা নীড়ের আয়োজনে থাকে অনেক বেশি আন্তরিকতাবোধ এবং দায়িত্বশীলতা। যে কারণে লোক সমাবেশ ও পণ্যের বিক্রির জন্য তাঁদের দুশ্চিন্তা করতে হয় না। অবশ্য বলা ভালো, শাপলা নীড় খুব একটা ব্যয়বহুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে না। কিন্তু প্রাধান্য দেয় বাঙালি সংস্কৃতিকে। আমার ধারণা, বাঙালিদের শিক্ষার অনেক কিছু আছে জাপানি এনজিও বা সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছ থেকে। অন্ততঃপক্ষে তিনটি বিষয় সম্পর্কে: (ক) বাজার আয়োজন করার কৌশল (খ) পণ্য বিক্রির পদ্ধতি (গ) ব্যবসায়িক দর্শন। শাপলা নীড়ের স্টাফ খুব একটা বেশি তাও নয়। অধিকাংশ স্টাফই জাপানি পাশাপাশি রয়েছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী। বেশির ভাগই ছাত্র-ছাত্রী। বাংলাদেশে রয়েছে নামমাত্র কয়েকজন জাপানি পরিচালক ও কর্মকর্তা কিন্তু অধিকাংশ স্টাফ বাঙালি। অহমিকা বলতে এই সংস্থাটির কোন বদনাম নেই, বরং প্রত্যেক কর্মকর্তার ব্যবহার, আচরণ এবং সংযমী চরিত্র

যে কাউকে মুগ্ধ, অভিভূত করবে নিঃসন্দেহে। অনেক বাংলাদেশী এনজিও কর্মী এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থার কর্মকর্তাদেরকে দেখেছি যাদের হাবভাব যেন বিরাট কিছু করে ফেলার অহংকারে মাটিতে পা ফেলার মতো নয়! কাজকর্মের চেয়ে অফিসঘরই বিশাল। সেক্ষেত্রে শাপলা নীড়ের বরং ঢাকার অফিসটিই বড়। বাংলাদেশে ৮৭ জন বেতনভোগী কর্মচারী কাজ করছেন। টোকিয়োর অফিসটি অবস্থিত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ওয়াসেদা হোশিয়েন চত্বরের স্কট্ হলের ভূগর্ভস্থ ছোট্ট একটি কক্ষে। বইপত্র, মালামাল, কম্পিউটার, কপিয়ার, টেবিল চেয়ারে ঠাসাঠাসি। একটি সাইনবোর্ড পর্যন্ত নেই! সদর দরোজায় ছোট্ট করে লেখা জাপানি ভাষার কাতাকানা অক্ষরে 'শাপলা নীড়' ব্যাস। বৃটিশ ক্যাথলিক মিশনারী প্রধান ফাদার স্কট্ সাহেবের নামে উৎসর্গীকৃত লাল সিরামিক ইটের এই ভবনটি টোকিয়ো মেট্রোপলিটান সরকারের সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত--তার ভিতরে শাপলা নীড়ের দপ্তর এক আলাদা মর্যাদায় মহিমান্বিত। শাপলা নীড়ের মানব উন্নয়নের মহৎ কর্ম প্রচেষ্টাই তাঁদেরকে এই বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে। দপ্তরে সংস্থার সর্বমোট ১৩ জন কর্মকর্তা রয়েছেন তাঁদেরকে নিয়মিত অনিয়মত সাহায্য সহযোগিতা করছেন অনেক স্বেচ্ছাসেবী, ছাত্র-ছাত্রী।

শাপলা নীড়ের প্রাণপুরুষ হচ্ছেন ফুকুজাওয়া ইকিবুন সাবেক প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে পরিচালনা পরিষদের অন্যতম সদস্য। এছাড়া প্রথম দিকে জড়িত ছিলেন মি. য়োশিদা, তাঁর স্ত্রী ইউরি সান, মি. হায়াশি, মি. ওওহাশি, সাইতো চিহিরো, মি. নাগাহাতা, মি. তোকুনাগা, মি. নাকাতা, মিস সাতো তোমোকো, য়োশিমুরা শিগেরু, মি. শিমোজাওয়া, মি. ওয়াতানাবে প্রমুখ। যতখানি জানা যায় অত্যন্ত স্বল্প বেতনে সকল কর্মকর্তাই কর্ম সম্পাদন করছেন। বর্তমানে শাপলা নীড়ের ৪,০০০ এর বেশি সদস্য রয়েছে। যাঁরা নিয়মিত সদস্য নন তাঁরা মাসে ১,০০০ ইয়েন করে চাঁদা দিয়ে থাকেন। নিয়মিত সদস্যরা ১,২০০০ ইয়েন, সহযোগী সদস্যরা ৬,০০০ বিশেষ সহযোগী সদস্যরা ৩০,০০০ ইয়েন, দলগত সহযোগী সদস্যরা ৩০,০০০ প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগী সদস্যরা ৫০,০০০ ইয়েন করে চাঁদা দিয়ে শাপলা নীড়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া

রয়েছে অংশীদারী চাঁদাদানের পদ্ধতিঃ যেমন বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ তহবিলে ৭০,০০০ ইয়েন প্রদান করে প্রকল্পের অংশীদার হওয়া। তেমনি রয়েছে আনন্দোচ্ছল গ্রাম গঠনের জন্য ১০০,০০০ ইয়েন এবং বিশেষ প্রকল্প হিসেবে রাজধানী ঢাকার পথশিশুদের পুনর্বাসনকল্পে স্থাপিত ঢাকা, শিশুস্বপ্ন তহবিলের জন্য ২৬,৫০০ ইয়েন। এই ধরনের আর্থিক উৎস ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশে প্রস্তুত কুটিরশিল্প ও পোশাক বিক্রি এবং সারা বৎসরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ অভিযান। এক্ষেত্রে জাপানের ৩২টি স্থানে অবস্থিত সংস্থার সমর্থনকারী অঞ্চলিক দল, সংস্থা রয়েছে তারা সাহায্য করে থাকেন। ইভেন্টগুলোতে শুধু যে জাপানিরা উপস্থিত থাকেন তাই নয়, প্রবাসী বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও আসেন। তখন আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের চমৎকার এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় বৈকি। প্রায়শ ইভেন্টগুলোতে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সুঐতিহ্যের স্বদেশিকতায় লালিত 'নকশিকাঁথা'র বহুল প্রচার ও পসার ঘটেছে জাপানে শাপলা নীড়ের মাধ্যমে। সৌন্দর্য পিয়াসী বহু জাপানি মহিলার মুখে নকশিকাঁথার প্রশংসা শুনেছি। এখন যদিও কোমল আঙুলের বদলে যন্ত্রে বোনা হয়--কিন্তু দৃষ্টিকে আরাম দেয় এই রকম বহুবর্ণ-কোমলতা যেন হারিয়ে যায়নি।

শাপলা নীড়ের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মূলত নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, সমিতি গঠন করে কর্মসংস্থান এবং সমবায় ভিত্তিতে কাজ করার প্রশিক্ষণ। দুর্যোগ, মহামারী, বন্যা, খরার সময় জরুরী ভিত্তিতে সাহায্য করাও সংস্থাটির আরেকটি লক্ষ্য। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় শাপলা নীড় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে। জাপানে সংস্থার কর্মকান্ডের মধ্যে মূলত বাংলাদেশকে জাপানিদের কাছে তুলে ধরা, বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে বিত্তশালী জাপানি নাগরিককে জ্ঞাত করা, বছরে একাধিক 'স্টাডিট্যুরে'র ব্যবস্থা করা। তাতে করে ২০/৩০ জাপানি ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশ ভ্রমণে যায়। বাংলাদেশ থেকে সংস্থার স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে জাপানে আমন্ত্রণ করে জাপানের বিভিন্ন স্থানে সেমিনারের আয়োজন, বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানের আয়োজন, জাপানের অভ্যন্তরে শিক্ষাসফর ইত্যাদি। শাপলা নীড় ইতিমধ্যে তাদের সুকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ উল্লেখযোগ্য একাধিক পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর মধ্যে "টোকিয়ো আইনজীবী সমিতি পদক" খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি ক্ষুদ্র তরুণ-সমাবেশ কিভাবে আজ এত বড় একটি এনজিও-তে পরিণত হল তা বাস্তবিকই ভেবে দেখার বিষয়। শাপলা নীড় বাঙালি সংগঠকদের জন্য একটি বিশেষ উদাহরণ হতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস। এই যে জাপানের অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তারপরও সংস্থার গতি থেমে নেই। এর পেছনে কর্মীদের ধৈর্য, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনাই মূল কারণ। বাংলাদেশের গণমানুষের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল স্থানীয় এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো কাজ করছে তাঁদের অনেক কিছুই শেখার আছে শাপলা নীড়ের কাছ থেকে। উভয় দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশী সমিতি-সংগঠনগুলো স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে উক্ত সংস্থাটির সঙ্গে যৌথ ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করতে পারে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার বা মানবাধিকার সম্পর্কে তেমন পরিস্কার ধারণা ও অভিজ্ঞতা এখনো অর্জন করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে শাপলা নীড় মানব জাগরণে সাংস্কৃতিক ভূমিকাও রেখে আসছে। শাপলা নীড় পরিচালিত সমিতিগুলোতে সদস্যরা নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই প্রচেষ্টা শাপলা নীড়কে আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। অন্যান্য এনজিও সংস্থাগুলো থেকে আলাদা করে রেখেছে। সংস্থার কর্মীদের সমাজ সংস্কারের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতি শাপলা নীড়কে ক্রমশ গতিময় করে তুলছে বললে ভুল হবে না। ভবিষ্যতেও বর্তমান কর্মপ্রবাহ পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে তা বাঙালির গ্রামীণ সমাজ এবং অর্থনীতিকে উৎসাহিত করবে তাতে আর সন্দেহ কোথায়?

শাপলা নীড়ের মূল কার্যক্রম হচ্ছে, সমিতি। প্রতি বিশ জনকে নিয়ে গঠিত হয় সমিতিগুলো যার সদস্য হচ্ছেন গ্রামের দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর

মানুষ। যাঁরা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। পুরুষ এবং মহিলা পৃথকভাবে সমিতি গঠন করে থাকেন। সমিতির কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রধানত নিয়মিত সভার মাধ্যমে পরস্পরের মত বিনিময় করা। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খোঁজা এবং সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে মুক্তির পথ আবিষ্কার করা। সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রেখে একটি তহবিল তৈরী করে থাকেন। যখন তহবিল বেশ বড় হয় তখন তা সকলের জীবন-জীবিকার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোন সদস্য বা তার পরিবারের কারো অসুখ হলে সেই সদস্য সল্প সুদের বিনিময়ে অর্থ ঋণ করতে পারে। তাছাড়া সমিতির আয় বৃদ্ধির জন্য তহবিলের অর্থ অন্যখাতে বা ব্যবসায় লগ্নীও করা যায়। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সমিতির সংখ্যা ছিল ৮১১টি, বর্তমানে ৭০০ এর বেশি সমিতি কর্মতৎপর রয়েছে। এই ধরনের সমিতিগুলোর প্রবৃদ্ধি সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে।

প্রথমত, প্রবৃদ্ধি ও শিক্ষা

এই প্রকল্পে সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তারা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। শিখিয়ে থাকেন আয়-ব্যয় ও লেনদেনের সাধারণ হিসাব-নিকাশ কিভাবে করতে হয় তার কলাকৌশল। এটাকে শাপলা নীড় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

দ্বিতীয়ত, লিখন-পঠনচর্চা

বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রায় ৫৩% এবং মহিলাদের মধ্যে প্রায় ৭৭% পড়তে ও লিখতে জানে না। গ্রামাঞ্চলে তাঁদের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং লিখতে ও পড়তে না জানলে দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যার পাশাপাশি সমিতির কার্যক্রম ও তার প্রবৃদ্ধি ঘটানোও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে শাপলা নীড় এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত সমিতির সদস্যদেরকে পড়া ও লেখার পদ্ধতি এবং অর্থ সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ শিখিয়ে থাকে। যাঁরা দারিদ্রের কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারেননি তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাঁদেরকে

জানতে শেখানো হয় কেন তাঁরা দরিদ্র? শিশুদের পুষ্টির জন্য কি কি খাদ্য প্রয়োজন? কি করলে পরে আয় বাড়ানো যাবে? ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবন-জিজ্ঞাসা। অক্ষরজ্ঞান লাভ করার জন্য সমিতির সদস্যদের আগ্রহের কমতি নেই তার প্রমাণ মেলে ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার নিরক্ষর মানুষ এখন লিখতে ও পড়তে শিখেছেন। জানেন হিসাব-নিকাশ কিভাবে করতে হয়।

তৃতীয়ত, শিশুশিক্ষা

সমিতির সদস্যদের শিশুসহ গ্রামের যে সকল শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদেরকে বাড়তি কর্মসূচি হিসেবে প্রাথমিক পাঠ দেয়া হয়। প্রতি বছর প্রায় ২০০০ শিশুকে শাপলা নীড় অক্ষরজ্ঞান দিয়ে আসছে।

চতুর্থত, গ্রামাঞ্চলের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ সুবিধা নেই বললে চলে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা সম্পর্কেও ধারণা অত্যন্ত ক্ষীণ। সামান্য অসুখ বিসুখে মানুষের প্রাণহানি ঘটা নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা। বিশেষ করে শিশু ও অন্তঃসত্ত্বাদের ক্ষেত্রে পুষ্টিহীনতা অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে আছে কমপক্ষে গত ১০০ বছর ধরে। এক্ষেত্রে শাপলা নীড় গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজাত খাদ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করে: (১) জলের কূপ তৈরি করে তাতে হস্তচালিত পাম্প মেশিন স্থাপন ও সেনিটারীর ব্যবস্থা। প্রতি বছর প্রায় ১০০টি জলকূপ স্থাপন করে চলেছে শাপলা নীড়। (২) স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে মহিলাদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, পরিবার পরিকল্পনা, মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিয়মিত আলোচনার আয়োজন। (৩) বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সন্তান প্রসবকালীন সময়ে বহু মহিলা মৃত্যুবরণ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে শাপলা নীড় গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে নিরাপদে সন্তান প্রসব করতে পারেন তার জন্য স্বেচ্ছাসেবী মহিলা টিম গঠন করেছে।

পঞ্চমত, বাড়তি আয়ের জন্য তহবিল বৃদ্ধি

সমিতির সদস্যদের গঠিত অর্থতহবিলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সেখান থেকে সদস্যরা বাড়তি আয়ের জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা চালু

করেন। যেমন বাছুর বা ছাগলের বাচ্চা কিনে বড় করে বাজারে বিক্রি করা অথবা গাভী কিনে তার দুধ বিক্রি করা। আবার কয়েকজন মিলে জমি বর্গা নিয়ে শাকসব্জির চাষ করে তা বাজারে বিক্রি করে। এই ধরনের ব্যবসা করতে গিয়ে লাভ-লোকসানের মধ্য দিয়ে ব্যবসার কলা কৌশল ও যৌথ কর্ম পদ্ধতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকেন। ব্যবসায় সফল হলে তহবিলও ধীরে ধীরে স্ফীত হয়। তহবিল যদি বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সেখান থেকে অর্থ ঋণ নিয়ে অনেকে বড় ব্যবসাও করে থাকেন। যেমন পানির পাম্প কেনা, খরার সময় চাষযোগ্য পানি তোলা, রিকশা গাড়ি ক্রয় ইত্যাদি ব্যবসায় অগ্রসর হন। সমিতির কর্মকান্ডের গতি ও তহবিলের অবস্থা বুঝে শাপলা নীড় তহবিলকে একটি পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে আরও অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। সঙ্গে দিয়ে থাকে বিভিন্ন উপদেশ ও কারিগরি শিক্ষা। সমিতির অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যথার্থভাবে চলছে কি না নিয়মিতভাবে শাপলা নীড় তা পরীক্ষা করে দেখে।

শুধু যে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে শাপলা নীড় সাহায্য করছে তা নয়, দুর্যোগ, মহামারী ও বন্যা-জলোচ্ছ্বাসের সময়েও জরুরী ভিত্তিতে অর্থ, খাদ্য, পুনর্বাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। শাপলা নীড়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমানে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীত সদস্য ফুকুজাওয়া ইকিবুন বলেন, দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করাই আমাদের কাজ। মানুষ স্বনির্ভর হলে পরেই সে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে, তার ক্ষমতাকে সে উপলব্ধি করতে শেখে এবং অন্যায়, অপরাধ আর পশ্চাতপদতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করার অদম্য মানসিকতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আমরা মূলত এই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।

সুদীর্ঘকাল শাপলা নীড়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। যখন জাপানি ভাষার ছাত্র ছিলাম প্রায় প্রতি রবিবারে সংস্থার দপ্তরে গিয়ে নানা কাজে সহযোগিতা করেছি। সংস্থা আয়োজিত বিভিন্ন সময় বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বতস্ফূর্তভাবে বন্ধু-বান্ধবসহ অংশগ্রহণ করেছি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে মি. ফুকুজাওয়া রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ বলতে অজ্ঞান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে

কৃষিই এখনো জাপানিদের হৃদয়
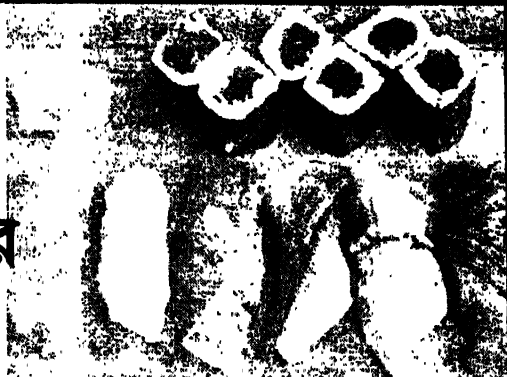
জাপানে দিনের পর দিন যতই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে ততই কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির রসধারা বিস্তৃতিলাভ করছে বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান 'সুশি বার', 'সুশি রেস্তঁরা' তার জ্বলন্ত প্রমাণ
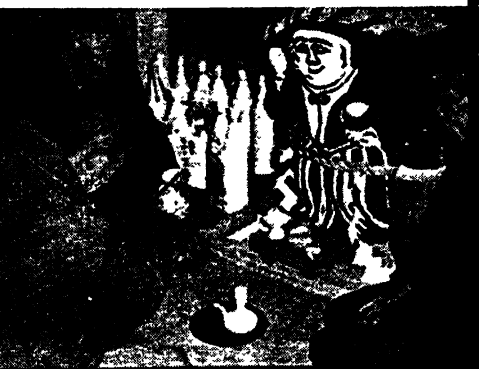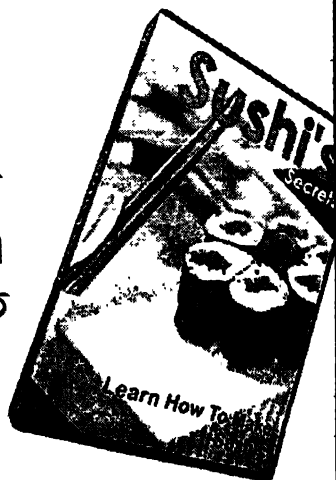
পারেননি সে বিষয়ে কতদিন কতবার আমার কাছে দুঃখ করেছেন! মূলত তিনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল তাঁর ডিজাইন-অফিসের নাম রেখেছেন 'ডিজাইন এফএফ' অর্থাৎ 'ডিজাইন ফ্রীডম ফাইটার্স'!

শাপলা নীড়ের প্রথম নাম ছিল HBC=Help Bangladesh Committee. তখন ম্যাগাজিন আকারে বেশ কয়েকটি বুলেটিনও প্রকাশিত হয়েছিল। যার পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং বিষয়বস্তু তিনি তৈরি করতেন। প্রতিটি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, শামসুর রাহমান না হয় নির্মলেন্দু গুণের কবিতার জাপানি অনুবাদ তুলে ধরতেন। বন্ধুরা অনুবাদ করতেন আর তিনি চিত্র এঁকে দিতেন। তারপর HBC একদিন 'শাপলা নীড়' হল--সে আরেক কাহিনী। বুলেটিনটি আরও বড় আকারে হল পাতাও বাড়ল নাম বদলে হল 'মিনামি নো কাজে' অর্থাৎ 'দক্ষিণা-বাতাস'। এখন দুমাসে একবার প্রকাশিত হয়। নিয়মিত সদস্যদের জন্য রয়েছে 'শাপলা নীড় ংসুশিন' বুলেটিন। বাৎসরিক প্রতিবেদন তো রয়েছেই। শাপলা নীড়ের সকল পোস্টার, প্রচারপত্র, শুভেচ্ছাপত্রসহ প্রকাশনা বিষয়ক প্রায় সব কাজই মি. ফুকুজাওয়াই করে থাকেন। সেখানে থাকে জাপান-বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছাপ। এখনো তাঁর ডিজাইন অফিসে প্রতি মাসে মাসে শাপলা নীড়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সংস্থার সশ্রম কর্মকান্ডের খবর, গ্রামীণ মানুষের প্রাণবন্ত সাক্ষাৎকার, আগামী পরিকল্পনার পাশাপাশি নানা রকম বাংলার গ্রামীণ দৃশ্যের চিত্র এঁকে সৃজন করে চলেছেন হৃদয়ের উষ্ণ 'দক্ষিণা-বাতাস' বুলেটিন--তার পাতায় পাতায় আমি দেখতে পাই বাংলার সহজ সরল মানুষের প্রতি বন্ধু ফুকুজাওয়া সানের বুকভর্তি ভালবাসা--যে ভালবাসা না থাকলে অগ্রসর হওয়া যায় না--হওয়া যায় না অগ্রসর মানুষ।

শাপলা নীড়ের উত্তরণই হচ্ছে প্রান্তিক, গ্রামীণ মানুষের উন্নয়ন। এই আন্দোলন যেন বন্ধ না হয়।

* ১৯৯৮ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত।
* আলোকচিত্র: শাপলা নীড়ের সৌজন্যে।
* জাপানি 'সান' শব্দের অর্থ মিস্টার.শ্রী.বাবু.জনাব ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপান ছিল ধ্বংসস্তূপে সমাহিত। অভাব, অনটন দারিদ্র্য আর যুদ্ধের রক্তাক্ত দগদগে ক্ষত ছিল সর্বত্র। কী রকম দুঃসহময় ছিল মানুষের জীবনযাপন সে সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রে, সভা-সেমিনারে প্রবীণ জাপানিদের কাছে শুনেছি। "ভাত তো দূরের কথা কলা পর্যন্ত খাওয়ার ক্ষমতা ছিল না", এখনো বলেন প্রবীণরা যারা রাজধানী টোকিয়োসহ সংলগ্ন জেলাগুলোতে বাস করেন। যুদ্ধের সময় মার্কিনী বায়ুসেনাদের চিরুণী-বোমা বর্ষণে জ্বলেপুড়ে কয়লায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল গোটা টোকিয়ো মহানগর। হিরোশিমা, নাগাসাকির ধ্বংসজনিত দুর্দশার কথা তো ব্যাখ্যার অতীত! বয়স্কদের বর্ণনা ছাড়াও চলচ্চিত্র, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, আলোকচিত্রের প্রদর্শনী ও অ্যালবাম, অঙ্কনচিত্রের সংকলন, বইপত্র দেখে, পড়ে দারুণ ব্যথিত হয়েছি। আবার বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি ছাইকে কিভাবে জাপানিরা সোনায় পরিণত করেছে তা দেখে! রাজতন্ত্র তথা সমরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং সাধারণ মানুষের কঠোর পরিশ্রমই যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানের ভাগ্য পরিবর্তনে অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছিল।

অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিদ্রোহ, রক্ষণশীলতা ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার অধীনে সাধারণ জাপানিদের মুক্তিবুদ্ধিচর্চা তো দূরের কথা, সন্ত্রাস ও দারিদ্র্য সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছিল তাঁদের জীবন। এদো যুগে দুশো বৎসর তো জাপান নিষিদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্ব থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তি আমেরিকার কাছে পরাজয়ের পর জাপান গণতান্ত্রিক ও নতুন যুগের পথে যাত্রা শুরু করে। সমরবাদী জাপানে গণতন্ত্রের উন্মেষও ঘটে আমেরিকার বদৌলতেই। জাপান-বিজয়ী তৎকালীন মিত্রশক্তি আমেরিকার অধিনায়ক জেনারেল ডগলাস ম্যাক্‌আর্থারের কল্যাণেই যুদ্ধোত্তর জাপানে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় এটা অস্বীকার করার জো নেই। দ্রুত এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি সম্রাটের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব করে একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধান, ঐতিহাসিক ভূমি সংস্কার, রাষ্ট্র পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। যুদ্ধজনিত ধ্বংসস্তূপ থেকে শুরু হয় জাপানের উন্নতির সংগ্রাম। রাষ্ট্রনেতা থেকে শুরু করে জনগণের উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম জাপানকে দ্রুত স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিতে থাকে। এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক এবং

আমেরিকা থেকেও সাহায্য গ্রহণ করে তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করেন তৎকালীন সরকার। আমেরিকার সাহায্যেই গ্রাম ও শহরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দুই দেশের সরকারি সাহায্যের অধীনে বহু মেধাবী ছাত্রকে আমেরিকায় প্রেরণ করা হয় উচ্চতর প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য-বিষয় শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে। যাঁরা পরবর্তীকালে ফিরে এসে জাপানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। তাঁদের উচ্চবিলাসী স্বপ্নের বাস্তব রূপই হচ্ছে আজকের জাপান--বিশ্বের দ্বিতীয় শিল্পোন্নত ধনী রাষ্ট্র।

যুদ্ধোত্তর জাপানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে কাজটি জেনারেল ম্যাক্আর্থার প্রথমেই করেন সেটা হল, 'জাইবাৎসু' (Financial Cliques)গুলোর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে জাপানি প্রশাসনকে উদ্ধার-কল্পে এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা। জাইবাৎসুগুলো হল পনেরটি প্রভাব-শালী পরিবার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। যেমন মিৎসুই, মিৎশুবিশি ও সুমিতোমো এই তিনটি প্রধান ধনাঢ্য পরিবারকে ঘিরে ছিল ইয়াসুদা, ইয়ামাজাকি, নোমুরা, শিবুসাওয়া, আসানো, ওকুরা, ফুরুকাওয়া, নিস্সান, নিক্কু প্রমুখ প্রতিষ্ঠানসমূহ। তারাই জাপানের কৃষি (ভূমি), অর্থনীতি (ব্যবসা, ব্যাংক), রাষ্ট্র (রাজনীতি), কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। নতুন সংবিধান অনুযায়ী তাদের সমস্ত শক্তি খর্ব করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন, ব্যবসা ও ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের অধীনে স্থাপন, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়ন ও ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয় সর্বত্র দেশ পুনর্গঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের।

জাইবাৎসুগুলো ক্ষমতা হারালেও জাতীয় অর্থনীতিকে সুসংহত করতে তারাও বসে থাকেনি। ১৯৫০ সালে সংঘটিত কোরিয়া যুদ্ধের সময় তারা পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমোদন লাভ করে। ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা নির্মাণ, উৎপাদন, দেশ বিদেশে পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নেয়। শিল্পকারখানার কাঁচামাল সস্তায় আমদানি করে দরিদ্র এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো থেকে। উৎপাদিত মালামাল

বিক্রির প্রথম বাজার হিসেবে লক্ষ্যস্থির করে আমেরিকাকে। অবশ্য আজও আমেবিকা জাপানের সবচেয়ে বৃহৎ বাজার এবং বাণিজ্য-অংশীদার।

ষাট ও সত্তর দশকে আমেরিকায় নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বৈদ্যুতিক যন্ত্র-সরঞ্জমাদি একটার পর একটা আবিষ্কার/উদ্ভাবন হতে থাকে। জাপানি কোম্পানিগুলো সেগুলোকে অনুসরণ করে ভিন্নভাবে অদলবদল, টেকসই এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় ডিজাইন সম্বলিত বৈদ্যুতিক পণ্য-সামগ্রীর নিজস্ব বাজার তৈরি করতে সক্ষম হয় আমেরিকা এবং য়োরোপে। এইভাবে শুধু বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামই নয় মোটর গাড়ি ও টেলিভিশন উৎপাদনেও জাপান সর্বশক্তি নিয়োগ করে। নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য বস্তু সামগ্রী তৈরিতে যখন জাপান স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়--বন্ধ করে দেয়া হয় বিদেশী পণ্যসামগ্রীর আমদানি। ক্রমেই বর্হিবিশ্বে দামে সস্তা কিন্তু গুণেমানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাপানি পণ্যের বাজার বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। আশির দশকে জাপান বিশ্বে 'ইলেক্ট্রোনিক্স সাম্রাজ্যবাদী' বলে পরিচিতি লাভ করে। জনসাধারণের মাথাপিছু আয় আমেরিকার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

আজকে অর্থ, সম্পদ এবং দেশী-বিদেশী মালামালে উপচে পড়ছে জাপান। মার্কিনী, য়োরোপীয় সংস্কৃতি আর ফ্যাশনজালে বন্দী এ দেশের প্রতিটি মানুষ। বিলীন হতে চলেছে নিজস্ব জাতীয় মূল্যবোধ, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, অনন্য অজেয় সংস্কৃতি। কিন্তু তারপরেও এখনো একটি ঐতিহ্য রয়ে গেছে অটুট। কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি। বাঙালির মতোই ভেতো জাপানিরা এখনো সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে কৃষিকে। জাপান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ নয়। খাদ্যের সত্তর ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। অত্যন্ত উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারকারী কৃষকদের অবস্থাও সচ্ছল নয়। চালসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্য ক্রমশ পড়তির দিকে। ধানচাষ, কৃষিকাজের প্রতি তরুণ প্রজন্মের চরম অনীহা এক প্রধান সমস্যা। মনুষ্যকর্মীর পরিবর্তে মাঠে-ময়দানে কাজ করবে অদূর ভবিষ্যতে বুদ্ধিমান 'রোবট'--যারা এখন অন্যান্য কলকারখানাতে পেশীবহুল শ্রমিকের বদলে তিনরাত সার্ভিস দিয়ে চলেছে নিরলসভাবে। সাশ্রয় হচ্ছে কোটি কোটি ইয়েন! যেমন মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান--সেখানে রোবটই হচ্ছে

প্রধান কারিগর। রোবট তৈরিতেও জাপান আজ বিশ্বসেরা। অদূর ভবিষ্যতে কলকারখানা এবং গার্হস্থ্য কাজে পারদর্শী বুদ্ধিদীপ্ত রোবট রপ্তানি করবে জাপান নিঃসন্দেহে। সেইসঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে শ্রমসাধ্য, কঠিন কাজকর্ম এবং কৃষিকাজ ও কৃষি-সংস্কৃতি রক্ষা করবে রোবটবাহিনী। তবু ভালো বেঁচে থাকবে অনন্য জাপানি কৃষি-সংস্কৃতি। ভুলে গেলে চলবে না জাপানের সংস্কৃতির মূল ভিত্তিই যে কৃষি! যুদ্ধোত্তর 'দানকাই সেদাই' বা 'শিশু বুম্' এর জাপানি প্রজন্ম যতই মার্কিনী কিংবা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে সাহেব-বিবি হয়ে যান না কেন, বয়স বাড়লে পরে ঠিকই রক্ত ও স্বাদেশিকতার টানে তাঁরা গ্রামীণ কৃষিসংস্কৃতির দিকেই ফিরতে থাকবেন। আর এখন তাঁরা কর্মজীবন থেকে অবসর প্রাপ্তির পর গ্রামের দিকে ফেরা শুরু করেছেনও দল বেঁধে।

জাপানি কৃষিসংস্কৃতির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী 'নিহোন শুউ' বা 'জাপানি মদ' আর অনুপম আঙ্গিকবিশিষ্ট জাতীয় খাবার 'সুশি', আরও আছে ভাতের তৈরি 'অনিগরি' বা 'রাইসবল'। এ সবের বাইরে অবশ্য হরেক রকমের চাল থেকে প্রস্তুত পীঠা, মন্ডা-মিঠাই এবং 'ওছেন্‌বে' বা 'Rice Cracker' রয়েছে। এগুলো জাপানিদের হৃদয়। চাল ছাড়া এসব তৈরি সম্ভব নয়।

এতদূর উন্নতির পরেও জাপান আজও কৃষিকে আগলে রেখেছে। কারণ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একনিষ্ঠ পূজারী হচ্ছেন কৃষিজীবীরা। কৃষিকে সামন্ততন্ত্রের শিকল মুক্ত করে গণতান্ত্রিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে তাঁদেরকে বহু সংগ্রাম, বহু বিদ্রোহ, অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে। তাই জাপানের কৃষিজীবী গ্রামীণ জনসাধারণ ভূমিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। ভূমিকে রক্ষা করা মানে তাঁদের কৃষিজীবী পূর্বপুরুদের স্মৃতিকে সযত্নে লালন করা। হাজার হাজার বছর ধরে আজও জাপানি নববর্ষ বা 'শৌগাৎসু' উৎসবে সাতদিন ধরে জাপানের গৃহ, মন্দির, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সদর দরজার দুপাশে সাজিয়ে রাখা হয় যে 'কাদোমাৎসু' তা তৈরি হয় বাঁশ, খড়ের দড়ি আর মাৎসু (Japanese Pine Tree) বা ঝাউগাছের ডাল ইত্যাদির মাধ্যমে। খড়ের দড়ি বলতে অবশ্যই ধানের পরিত্যক্ত খড়। সুদৃশ্য এই 'কাদোমাৎসু'

সত্যি দেখার বস্তু। সাতদিন সেটা সাজিয়ে রাখা হয়। এটাও কৃষিসভ্যতার প্রতীক।

তাছাড়া নববর্ষের প্রথম দিন 'গান্‌জিৎসু নো হি'কে স্বাগত জানানো হয় জাপানি চাল থেকে প্রস্তুত 'নিহোন শুউ' দিয়ে। সাতদিন ধরে ভগবান বুদ্ধ ও অন্যান্য দেবদেবীর আশীর্বাদ পাওয়ার উপলক্ষ হিসেবে গৃহ, মন্দির, সামাজিক, শিক্ষা, বাণিজ্য, ক্রীড়া এবং রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে 'কাগামিমোচি' নামে প্যাগোডা আকৃতির Rice Cake উপস্থাপন করা হয়। তার সঙ্গে আরও আনুষাঙ্গিক বস্তু থাকে যেমন 'ইসেএবি' বা 'ইসে-চিংড়ি', কমলা, খড়ের বিড়া, সাদা কাগজের মালা ইত্যাদি। 'কাগামি' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আয়না' আর 'মোচি' হচ্ছে এক ধরনের বিশেষ চাল 'মোচিগোমে' থেকে প্রস্তুত ভাতের গোলাকৃতি পিন্ড। এই দুয়ে মিলিয়ে 'কাগামিমোচি'। ১৪ শতাব্দী থেকে এই রীতি চলে আসছে। এই 'কাগামিমোচি'কে আগের দিনের মানুষ দর্পন বলে বিশ্বাস করতেন এই জন্য যে তাতে ঈশ্বরের দর্শন মিলবে এই আশায়। অবশ্য একেক অঞ্চলে একেক রকম আকৃতির 'কাগামিমোচি'র প্রচলন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাপানি প্রতিটি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে 'নিহোন শুউ'এর ব্যবহার অপরিহার্য। জাপানে দিনের পর দিন যতই প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ ঘটছে ততই কৃষি থেকে উদ্ভূত জাপানি ঐতিহ্য, সংস্কৃতির রসধারা বিস্তৃত লাভ করছে বিশ্বব্যাপী। আজকে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালিসহ এশিয়ার কোরিয়া, হংকং, চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি উদীয়মান দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান 'সুশিবার' বা 'Shushi Bar', 'সুশি রেস্টুরেন্ট' তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

জাপানে 'সেকিহান' বা 'লালভাত' নামে একটি খাদ্য আছে। এক মোচিগোমে চাল থেকে এই আঠালো ভাত তৈরি করা হয়। যা কেবল বিশেষ বিশেষ দিবসগুলো এবং আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, জন্ম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রভৃতি উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপনস্বরূপ এই ভাত খাওয়ার আয়োজন করা হয়ে থাকে--যা মূলত প্রাচীন এক সামাজিক রীতি। এই চালটি বাংলাদেশের সিলেট জেলা আমার জন্মস্থানে ছেলে-

বেলাতে খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। স্থানীয় ভাষায় এই চালের নাম 'বিরুনচাল। তবে রংটি সাদা। কিন্তু 'সেকিহানে'র মতোই হুবহু অনুরূপ--আঠালো এবং সুস্বাদু। বিরুনচালের ভাত রাঁধার পদ্ধতিও আলাদা। তার সঙ্গে জমে ভালো ঘি, মাখন, ইলিশ বা বোয়াল মাছের কড়কড়ে ভাজা! সেই স্বাদ আজও ভুলিনি। ভুলিনি বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার চাল থেকে প্রস্তুত হরেক রকমের পীঠা-সংস্কৃতির কথা--মায়ের হাতের সুমধুর স্বাদ। যেমন ভোলা যায় না 'নিহোন শুউ' বা 'সুশি'র ভুবনভোলানো স্বাদ!

জাপানের কৃষি উপহার দিয়েছে অনন্য এক সংস্কৃতি যা বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। যে কারণে কৃষি আজও জাপানিদের হৃদয়।

জাপানে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের চাল উৎপাদিত হয়ে থাকে। যুদ্ধোত্তরকালে যে চালগুলো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেগুলো হচ্ছে পদাঙ্কনুসারে: কোশি হিকারি, ১৯৭৯ সাল জনপ্রিয়তার শীর্ষে এবং প্রথম স্থান দখল করে আছে। মোট উৎপাদন ৩,৩৬১,০০০ টন। দ্বিতীয় স্থানে আছে হিতোমেবোরে, ৯০২,৫০০ টন; তৃতীয় হিনোহিকারি, ৮৩৩,৪০০ টন; চতুর্থ আকিতাকোমাচি, ৭৯৪,৬০০ টন এবং পঞ্চম হচ্ছে হায়েকিনু ২৯৬,৯০০ টন। এসব ছাড়া সাম্প্রতিককালে সুস্বাস্থ্যকর চাল যেমন 'গেমমাই' অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, এই চালটি ক্যান্সাররোধে উপযোগী বলে স্বীকৃত।

স্বদেশের চালসংস্কৃতিকে আরও ব্যাপকারে জানার জন্য সম্প্রতি উন্মুক্ত করা হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী একটি জাদুঘর: 'গোহান মিউজিয়াম', 'গোহান' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'খাবার/খাদ্য' অবশ্য ভাত। এই জাদুঘরের ওয়েভসাইট হচ্ছে: www.gohanmuseum.com এবার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে জাপানি কৃষিসংস্কৃতির বৈচিত্রময় সচিত্র বার্তা।

তথ্যসূত্র:

ক. হেইবোনশা দাইহিয়াক্কা জিতেন।

খ. টেপকো বুলেটিন।

....

* ১৯৯৫ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত।

* আলোকচিত্র: সেকাই বুনকাশা পাবলিশাবের সৌজন্যে।

হাইকু-সম্রাট
মাৎসুও বাশোও ও
একজন
তোশিহারু আসেকো
"আমি তরুণ বয়সে বাশোওর প্রতি মোটেই আকৃষ্ট ছিলাম না। কিন্তু পরিণত বয়সে এসে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি। আমি অনুভব করতে শুরু করলাম, বাশোও তাঁর কবিতায় কি প্রকাশ করতে চেয়েছেন?"
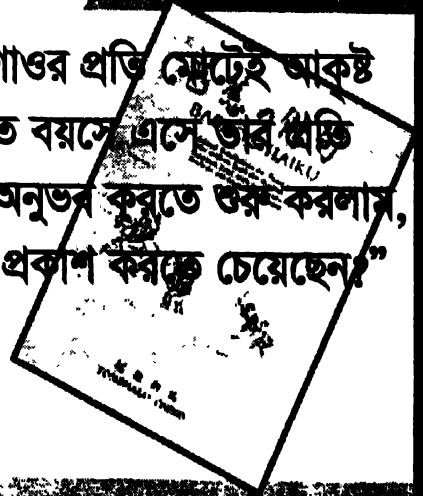
জাপানের সাহিত্য বিষয়ে কথা উঠলেই প্রথমে এসে পড়ে 'হাইকু' কবিতার কথা। কেননা জাপানের অন্যতম পরিচয় হচ্ছে এই হাইকু। সে যেমন ব্যতিক্রম এক আঙ্গিকবিশিষ্ট, তেমনি অসম্ভব জনপ্রিয় কি দেশে কি বিদেশে। হাইকু লিখিয়েকে জাপানি ভাষায় বলা হয়ঃ 'হাইজিন'। হাইকু ১৭ (৫+৭+৫) অক্ষরমাত্রার আঙ্গিকে সৃষ্ট অনুকবিতা বিশেষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আকৃষ্ট করেছিল এই হাইকু। তাঁর কিছু জাপানি হাইকুর অনুবাদ এবং স্বলিখিত হাইকুর কথা আমরা জানি। তাঁর বাইরে আর কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালি হাইকু সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। অন্যান্য দেশের কবি-সাহিত্যিক এমনকি সাধারণ নাগরিকের তুলনায় বাংলা অঞ্চলে হাইকুচর্চার প্রবণতা আজও সৃষ্টি হয়নি। বেশ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক.ঔপন্যাসিক হাসনাত আবদুল হাই জাপানে অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে কয়েক বছর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কিয়োতোতে অবস্থান করেন তখন অনেকগুলো হাইকু রচনা করেন। যেগুলো পরে 'কিয়োতো হাইকু' কাব্যগ্রন্থে পত্রস্থ হয়েছে। বাংলাদেশের আর কোন সাহিত্যিকের খবর পাচ্ছি না যিনি হাইকু বিষয়ক গ্রন্থ লিখেছেন। শুধু বাংলাদেশই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে হাইকুচর্চা হয় না বলাই ভালো। জাপানে শিশু থেকে বুড়ো সকলেই হাইকু লিখতে জানেন। এমনটি বিশ্বের আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই।

পন্ডিতেরা মনে করেন, হাইকু বিশ্বসাহিত্যে একটি অদ্বিতীয় আঙ্গিক। আর এই ক্ষুদ্র চমৎকার কবিতার স্রষ্টা হচ্ছেন মাৎসুও বাশোও (১৬৪৪-১৬৯৪)। তিনি একাধারে জেন্-কবিতা, হাইকুর আদি সম্রাট বলে কথিত। প্রাচীন চীনা 'ইকো-কবিতা' যার সূচনা হয়েছিল তান যুগে (৬১৮-৯০৭) মূলত হাইকুর পিতৃপুরুষ। হাইকু মূলত দুঃখবাদ, সৌন্দর্য এবং বিশ্বরহস্যের প্রতীক বলা যায়। টি.এস.ইলিয়ট এর ভাষায়, "the interception of timeless with time . . ."

কিন্তু হাইকু কবি মাৎসুও বাশোও সম্পর্কে খুব একটা আলোচনা বাংলা সাহিত্যে হয়েছে বলে জানা যায় না। আজ জাপানের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত হওয়ার পর ঐতিহ্যপ্রিয় নাগরিকরা তাঁদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কিংবদন্তী, প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সঙ্গীত-সভ্যতার অন্বেষণে মনো-

যোগ দিয়েছেন। তারই একটি হচ্ছে, প্রাচীন হাইকু সম্রাট মাৎসুও বাশোওর হাইকু সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা; তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জাপানিদের মধ্যে কৌতূহল জাগানোর চেষ্টা। অনুবাদের কারণে আমেরিকা, য়োরোপে বাশোও অনেক আগেই পরিচিতি লাভ করেছেন, কৌতূহল জেগেছে সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে। তাঁরা ছুটে আসছেন জাপানে, খুঁজছেন তাঁর জীবন পরিক্রমা। বিশেষ করে তাঁর জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলভ্রমণ কলাশিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এই ভ্রমণের সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত কিছু হাইকু রচনা করেন। তাঁর এই ভ্রমণ সম্পর্কে জাপানি ও বিদেশী লেখকদের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে 'অকু নো হেসোমিচি' বা 'দূরান্তের সরুপথ' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং টিভি-প্রামাণ্যচিত্র প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়।

বাশোওর উপর রচিত গ্রন্থাদি আছে। কিন্তু তাঁর রচিত হাইকুর ব্যাখ্যাসম্বলিত ইংরেজি অনুবাদকৃত একটি গ্রন্থ লিখেছেন মাৎসুও বাশোওর একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী তোশিহারু আসেকো। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি লেখক বা সাহিত্যিক নন--একজন সাধারণ ট্যুর-গাইড। তিনি তাঁর 'মাৎসুওহাইকু' নামক নতুন গ্রন্থে বাশোও রচিত এক হাজারের বেশি হাইকুর মধ্য থেকে ৩৩০টি হাইকু বেছে নিয়ে অনুবাদ করেছেন। হাইকুর প্রতি তাঁর ভালবাসা কতখানি গভীর তাতে প্রমাণিত হয়। বিদেশী পর্যটকরা যাতে ভ্রমণের সময়টাকে আনন্দময় করে তুলতে পারেন সেই জন্য তাঁর এই অভিনব প্রচেষ্টা। তাছাড়া স্বজাতির চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতি যা হাইকুতে বিধৃত আছে বিদেশীদের কাছে প্রচারও করা গেল।

বাশোওর স্মৃতি বিজড়িত প্রতিটি স্থানে তিনি বিদেশী পর্যটকদেরকে বাশোওর হাইকু আবৃত্তি করে শোনান এবং এসমস্ত কবিতার পেছনে আবর্তিত ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। "বাসস্থান অনুযায়ী কবিতার গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিদেশী অতিথিদেরকে সঙ্গ দেয়ার সময় মাত্র পাঁচ কি দশ মিনিটের বেশি পাওয়া যায় না, এই অল্প সময়ে তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়--এটা আমাকে বারংবার মনোকষ্ট দেয়", আসেকো বলেন।

বাশোওর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ-গ্রন্থের স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন বহুদিন ধরে। এবার তা বাস্তবে পরিণত হল। তিনি তাঁর গ্রন্থে অনূদিত প্রতিটি হাইকুর সঙ্গে সম্পর্কিত জাপানি ভাষার ব্যাকরণ, ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতাকে বোঝার জন্য। তিনি বাশোওর সৃষ্টিকর্ম থেকে কতকগুলো অ-কাব্যিক প্রশ্নের তালিকা তৈরি করেছেন যেগুলোতে বাশোওর জীবন ও কাব্যভাবনা বিষয়ক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। গত ৭ বছর ধরে অত্যধিক পরিশ্রমের সঙ্গে আসেকো গ্রন্থটি রচনা এবং প্রকাশ করা পর্যন্ত আনুষঙ্গিক করণীয় সবকিছু একাই করেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের ইংরেজি শিক্ষাই তাঁকে এই কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। ২০ বছর বয়সে তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে সেনোটরিয়ামে ৮ বছরের জন্য অবস্থান করেন। ওই সময় তিনি ইংরেজি ভাষাটি ভালোভাবে রপ্ত করে নেন। শুধু ইংরেজিই নয়, সেইসব দেয়ালবন্দী নির্জন শান্ত দিনগুলোতে তিনি জার্মান ও ফরাসী ভাষায় রচিত দর্শন, শিল্পকলা, সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থও পাঠ করেন। "আমি সবসময়ই বিশ্বাস করি, সবকিছুর জন্যই নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের প্রয়োজন রয়েছে। আমি কখনো ভাবতেই পারিনি যে, প্রথম জীবনে অসুখে নষ্ট হয়ে যাওয়া দীর্ঘ ৮টি বছর আজকে এমন অর্থময় হয়ে উঠবে", আসেকোর তৃপ্তিকর সহাস্য মন্তব্য।

বাশোওর প্রতি তাঁর ভালবাসা একদিনে জন্মলাভ করেনি, বহু বছরের ফসল সেটা। তিনি বলেন, "আমি তরুণ বয়সে বাশোওর প্রতি মোটেই আকৃষ্ট ছিলাম না। কিন্তু পরবর্তী বয়সে এসে তাঁর প্রতি ক্রমে অনুরক্ত হয়ে পড়তে লাগলাম। আমি কৌতূহলী হয়ে উঠতে লাগলাম--বাশোও তাঁর কবিতায় কি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেটা আবিষ্কার করার জন্য।"

তোশিহারু আসেকো মনে করেন হাইকু হচ্ছে সাহিত্যের সবচেয়ে উঁচুমানের অঙ্গ।

কথিত আছে, বাশোও জীবীতকালে অধিকাংশ সময় জেন্-বৌদ্ধভিক্ষুদের সাহচর্যে থাকতেন। ফলে জেন্‌বৌদ্ধধর্মীয় প্রভাব তাঁর জীবন ও কর্মের উপর প্রচন্ড। কিন্তু আসেকো মনে করেন, বাশোও সরা-

সরি চৈনিক তাও দার্শনিক চুয়াং ৎজু (Chuang Tzu, ৩৯৯-২৯৫ খৃ:পূ:) এর প্রভাবে প্রভাবিত। কারণ বাশোও বারংবার ৎজুর প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর ব্যাখ্যামূলক রচনায়। আসেকো একনিষ্ঠ গবেষকের মতো গভীরভাবে বাশোওর হাইকু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। নিচে উল্লেখিত হাইকুটি স্পষ্টত ৎজুর প্রভাবে রচিত বলে তিনি মনে করেন ঃ

সো আসাগাও
ইকু শিনি-কায়েরু
নোরি নো মাৎসু

কবিতাটির অর্থ হচ্ছেঃ 'পুরোহিত এবং সকালের দীপ্তি, কতো প্রজন্ম পরিবর্তিত হয়েছে, যা পাইনের রীতির সঙ্গে তুল্য'। এই হাইকুটি বাশোও 'ফুতাকামিয়ামা তাইমাদেরা' মন্দির ভ্রমণ করার সময় রচনা করেন। মন্দিরের অঙ্গনে তিনি একটি পাইন গাছ লক্ষ করেন এবং হাইকুটি লিখেন। কবিতাটির নিগূঢ় অর্থ সম্পর্কে আসেকোর অভিমত, উল্লেখিত পাইনের রীতি চুয়াং ৎজুর পোষাজন্তুবিষয়ক মতবাদের অন্যতম একটি অর্থাৎ অনাবশ্যকতার কার্যকারিতা। কোন উপলক্ষ ছাড়াই পাইন বৃক্ষটির বেঁচে থাকা দেখে বাশোও স্বস্তিবোধ করেন।

আসেকো সচেষ্ট থেকেছেন যতখানি সম্ভব সাহিত্যরস বজায় রেখে বাশোওর সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করতে। গ্রন্থটি মূলত অনূদিত হয়েছে যাঁরা জাপানি ভাষা, সংস্কৃতি অথবা বাশোও কিংবা হাইকু সম্বন্ধে পড়ালেখা করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য। তিনি আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করেছেন, ইতিমধ্যে তিনি নতুন নতুন পাঠক সৃষ্টি করে ফেলেছেন। অনেক জাপানি ছাত্র-ছাত্রী চিঠি লিখে গ্রন্থটির প্রশংসা করেছে। বিশেষ করে যাঁরা এখন ইংরেজি শিখছে। আসেকো বলেন, "আমি জানি বাশোও সম্পর্কে প্রচুর গ্রন্থ বাজারে রয়েছে। কিন্তু আমি এখন চেষ্টা করছি একটি বই লিখতে যেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে চাই আসলেই বাশোও নিজে তাঁর প্রতিটি কবিতায় প্রকৃতপক্ষে কী বলতে চেয়েছেন?"

বাশোও-অনুরাগী তোশিহারু আসেকো গ্রন্থে বাশোও তাঁর শিষ্যকে লিখিত একটি চিঠি (সাইমোন্‌নো জি নামে খ্যাত) থেকে বাক্যাংশ উদ্বৃত করেছেন যা বর্তমান যুগেও অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করেঃ 'অন্যের কৃতিত্বের

অনুসারী না হয়ে, অন্যের অন্বেষিত পথের অনুসারী হও'।

মাৎসুও বাশোও এবং হাইকু জাপানে সমার্থক। তাঁর মৃত্যুর ৩১২ বছর পরও সকল স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছেন তাঁর কবিতা আর দর্শনের আলোকে। উৎসাহিত করছেন ভ্রমণপিয়াসী, সাহিত্যপ্রিয়, হাইকুপ্রেমী হাজার হাজার জাপানি নাগরিককে দূরদূরান্তের গভীর গভীর বনপথের রহস্য ভেদ করার জন্য। তোশিহারু আসেকোও তাঁদের একজন। এদোযুগে বাশোওর একদা হাঁটাপথ 'অকু নো হোসোমিচি' আজকে জাপানের অভ্যন্তরীণ পর্যটনশিল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যস্থল। সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মন্দির, উদ্যান, পাহাড়ের পাদদেশ, পর্যটকাবাস, পথনির্দেশক ফলকে তাঁর অবিনশ্বর কবিতা হাইকু খোদিত করা আছে, কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে আছেন 'তাবিবিতো' বা 'পর্যটকে'র বেশে প্রস্তরমূর্তির শরীর নিয়ে। ব্যস্ততর জীবনে সময় তৈরি করে নিয়ে ছুটছেন পর্যটকরা বাশোওকে বারংবার নতুন করে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। কেননা বাশোওকে খোঁজার অর্থ নিজের অজানা-অচেনাকে জগতকে আবিষ্কার করা।

বাশোও-প্রেমী ট্যুর-গাইড তোশিহারুর কথা ভেবে আমার মনে হল: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় কবি, বাঙালি জীবনের দিকনির্দেশক--কিন্তু আমরা ক'জন সর্বস্তরের মানুষ রবীন্দ্র-অন্বেষক? কতজন বাঙালি গিয়েছেন দর্শন করতে রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত 'শিলাইদহ' কিংবা 'জোড়াসাঁকো'? শুনেছি কলকাতা নাকি পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণেও জোঁড়াসাকোকে স্মরণ করে না। মাৎসুও বাশোও শত শত বছর ধরে জাপানে প্রতিটি ঋতুর কবি--আর বাঙালির রবীন্দ্রনাথ এখন শুধুই 'জাতীয় দিবসে'র কবি!

তথ্যসূত্র:
দি জাপান টাইমস্ অবলম্বনে।

....

* ১৯৯৩ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত।
* আলোকচিত্র: দি জাপান টাইমসের সৌজন্যে।

মুখোশের নাটক : নোহ্‌

পৃথিবীর প্রাচীন নাটকগুলোর মধ্যে নোহ্‌ একটি। নোহ্‌ই একমাত্র নাটক যাতে মুখোশ তার বাধ্যকতামূলক অনুষঙ্গ। নোহ্‌ খুবই উন্নত মানের নাটক যা ১৪ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনো সমানভাবে জনপ্রিয়। এর কারণ মূলত: নোহ্‌র অসাধারণ আঙ্গিক, নাট্যশৈলী।

জাপানের প্রাচীন নাট্যকলা সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে যে সকল মঞ্চ নাটকগুলো তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে 'নোহ্' নাটক বা 'নোহ্ থিয়েটার'। যার প্রতিষ্ঠা আজ থেকে কয়েকশ বছর আগে। বিভিন্ন পালা বদলের পর আজও নোহ্ নাটক অত্যাধুনিক জাপানি সমাজে সমাদৃত। বহির্বিশ্বেও আলোচিত।

তবে বিশ্বের বুকে অবশ্যই এক ব্যতিক্রমী আঙ্গিকের নাটক এই নোহ্। স্বল্পবাক-নোহ্ দেখতে গিয়ে অনেকেই হতাশ হন এর উপস্থাপিত কাহিনী বুঝতে গিয়ে। নোহ্ মূলত একটি পরিকল্পিত কলাশৈলী--এটা গড়ে উঠেছে গান, নৃত্য এবং অভিনয়কে কেন্দ্র করে। গান নোহ্ এর প্রতিটি নাটকে বাঁধা আর নৃত্য এবং নাটকীয়তাও সচরাচর সংশ্লিষ্ট। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই তিন উপাদানের কোনটাই নোহ্তে থাকে না। নোহ্ নাটকের মূল কাজই হচ্ছে একটা কাহিনীকে তুলে ধরা এবং তার সঙ্গে রূপক ও প্রতীকী অভিনয়-দক্ষতাগুণে দৃশ্যগুলোকে যতখানি সম্ভব রঙেরসে বৈচিত্র্যময় করে তোলা। তবে মূহুর্তের অঙ্গভঙ্গী, মুদ্রা বা মেজাজকে নাটকের শৈল্পিক মনোরঞ্জনের দিকে নিয়ে যেতে হয়: যদিওবা নোহ্ এর বেশির ভাগ বিষয়বস্তুই উন্নত, নাটকীয় কিন্তু নোহ্ সাধারণত স্পষ্ট, সরাসরি এবং ঘটানার বাস্তবানুগ উপস্থাপনাকে পরিহার করে থাকে। অবশ্য তার বদলে সে গীত ও নৃত্যের যৌথ প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নোহ্ নাটকে নাটকীয় ঘটনার উপস্থিতি খুবই কম এবং নাটকের মূল মেজাজের প্রকাশ ঘটে নৃত্যের মধ্য দিয়ে। নোহ্ নাটক কাবুকির মতো তার ভাব প্রকাশের জন্য নাটকীয়তাকে অতিরঞ্জিত বা ঘটনাকে দীর্ঘায়িত করে না। তবে এই নাটকে সঠিক উপস্থাপনা এবং উচ্চমানের মুদ্রা, অঙ্গভঙ্গী, নাটকীয়তা ঘটনার মতোই গতিশীল। নোহ্ নাটকের মুদ্রা, অঙ্গভঙ্গী এবং প্রতীকতত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে এই নাটক বোঝা বেশ কঠিন।

নোহ্ নাটক বিখ্যাত মূলত তিনটি কারণে। প্রথমত, পৃথিবীর প্রাচীন নাটকগুলোর মধ্যে নোহ্ একটি। দ্বিতীয়ত, নোহ্ই একমাত্র নাটক যাতে মুখোশ তার বাধ্যকতামূলক অনুষঙ্গ। তৃতীয়ত, নোহ্ খুবই উন্নত মানের নাটক যা ১৪ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েও এখনো সমানভাবে দর্শকদের

ধরে রাখতে পারছে। এই নাটকের সাজসজ্জা যেমন বর্ণবহুল তেমনি আর্কষণীয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিন্নআঙ্গিক, ভিন্নধারার নোহ্ নাটক জাপানের নাট্যজগতের একটি জীবন্ত শাখা বলা যেতে পারে। নোহ্ নাটক বিখ্যাত ইংরেজ কবি ইয়েটস্‌কেও প্রভাবিত করেছিল। প্রভাব বিস্তার করেছে আধুনিক নাট্যকলা এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও।

নোহ নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মেইজি সংস্কারের (১৮৬৮) পূর্ব পর্যন্ত জাপানি নাটকগুলো প্রধানত নোহ্, কাবুকি, পাপেট বা বুনরাকু এবং জোরুরি। তার মধ্যে নোহ্ হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন নাটক। ১১ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নোহ্ নাটক মূলত অসৎ পুরোহিত, সন্ন্যাসী/সন্ন্যাসীনী, ভাঁড় কিংবা প্রথম নগরে আসা গেঁয়ো চাষা ইত্যাদি চরিত্রে কেন্দ্রস্থ ছিল। বৌদ্ধ মন্দিরগুলোর বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের সময় নোহ্ অভিনয়কারীদের আহ্বান করা হত। তার ফলে খুব তাড়াতাড়ি নোহ্র সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার নোহ্গুলো ধর্মীয় তাৎপর্য অথবা বৌদ্ধ কিংবদন্তীর কথা নিরক্ষর সমাজে তুলে ধরতো অভিনয়ের মাধ্যমে। ফুলে এটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যধিক জনপ্রিয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক নাটকে রূপান্তরিত হয়। নাটকের এই কৌতূহলী রসধারা আজও বজায় রয়েছে এবং নাম নিয়েছে 'কিয়োগেন'। এখনো 'কিয়োগেন' নোহ্ নাটকের গর্ভাভিনয় হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে।

অতি দ্রুত নোহ্ নাটক শুধু মন্দিরের ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষাদানের মধ্যে সীমিত থাকেনি, নৃত্য, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য কলাও শিক্ষা দিতে শুরু করে এবং এই সময় থেকেই এই নয়া উপাদানগুলো নোহ্ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। নোহ্‌কে আরও উন্নত করে তোলার জন্য প্রাচীন জাপানি নাটক, নৃত্য ও গীত সংযোজন করা শুরু হয়। বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা প্রাচীন জাপানি সাহিত্যে স্থান পেতে শুরু করে; জাপানি প্রাচীন কবিতার পঙক্তি সুরের দ্বারা গীত হয়ে নোহ্ নাটকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত ও নৃত্য অতুলনীয় সুর ও মুদ্রা নিয়ে জন্ম লাভ করে। তবে পুরোপুরি সুসংগঠিত কাঠামো নিয়ে নোহ্ নির্মিত হতে পারেনি তখনো

পর্যন্ত।

১৩৫০ থেকে ১৪৫০ এই একশ বছরের মধ্যে একজন পিতা ও পুত্র যাদের নাম যথাক্রমে 'কানআমি' এবং 'জেআমি' প্রচলিত রসগল্পের মঞ্চাভিনয় 'সারুগাকু'কে প্রথম একটি স্থায়ী আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। এই দুজন শুধু নোহ্ নাটকের ইতিহাসে বিরাট ব্যক্তিত্ব হয়েই থাকেননি, পরবর্তীকালে মহান লেখক, নাট্যকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেন।

নোহ্ নাটকের লোকপ্রিয়তা

প্রত্যেকটি নোহ্ নাটকের মঞ্চই ঐতিহ্যগত রীতি অনুসারে তৈরি। মঞ্চটি সর্বমোট ১৯ ফিট এবং চতুষ্কোণ, চার কোণায় রয়েছে চারটি স্তম্ভ। মঞ্চের বামদিকে রয়েছে একটি স্থান যেখানে সমস্বরে গাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট, মঞ্চের পেছনের সারিতে বসেন বাদ্যযন্ত্রীরা, মঞ্চের পশ্চাৎদিক ও সাজকক্ষের মাঝামাঝি রয়েছে একটি সরু বারান্দা, যাকে বলা হয় হাশি-গাকারি, যার দৈর্ঘ্য বা আকার নির্দিষ্ট নয়।

বসার আসন এখন অবশ্য বেশিরভাগ নোহ্ মিলনায়তনেই পাশ্চাত্য ঢংয়ে সাজানো; একমাত্র নোহ্ গবেষণা মিলনায়তনেই (তেসসেনকাই) রয়েছে জাপানি ঐতিহ্যবাহী বসার আসন-কুশন।

জাপানের জাতীয় কাবুকি নাট্য পরিষদ যেমন কাবুকি নাটককে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে তৎপর, তেমনি জাতীয় নোহ্ নাট্য পরিষদও আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে নোহ্কে আরো লোকপ্রিয় করে তুলতে। এই পরিষদের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে নোহ্ নাটক সম্পর্কে জানার ব্যবস্থা--যেখানে নোহ্ উপস্থাপকেরা একটি নোহ্ নাটক এবং কিয়োগেন উপস্থাপনের মাধ্যমে নোহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। প্রতি বছর জুন মাসে নোহ্ নাটকের উপর পাঁচদিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, শুধু জাপানি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে বটে, তবে বিদেশীদের অংশগ্রহণের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিশেষ করে জাতীয় নোহ্ পরিষদের শনিবারের সেমিনার খুবই জনপ্রিয় এবং সমৃদ্ধ। এছাড়া নোহ্ নাটকের রয়েছে নিজস্ব

পাঠাগার, নোহ্ রেস্তরাঁ যা কাবুকি নাটকের নেই।

নোহ্ নাটক যেমন জাপানিদের আকৃষ্ট করে বিদেশীদের ততো নয়, তাঁরা বেশি পছন্দ করেন 'কাবুকি', অথবা 'জিদাই গেকি'। কিন্তু রাজধানীর বিশিষ্ট নোহ্মঞ্চগুলোতে বসন্তকালীন উপস্থাপনা অনেক বিদেশী উপভোগ করেন। এপ্রিল মাসে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত অপারসৌন্দর্যের সাকুরা বৃক্ষের তলে খোলামঞ্চে মঞ্চায়িত নোহ্ নাটক সত্যি দেখার মতো। বিশেষ করে রঙিন আলোকসজ্জার সঙ্গে হালকা গোলাপী সাকুরাফুল ও পল্লবের মিশ্রপ্লাবনে পরিবেশটি হয়ে ওঠে অতুলনীয় এক মায়াকানন--যার যমজ কোন চিত্ররূপ পৃথিবীর আর কোথাও নয়নগোচর হয় বলে আমার জানা নেই।

....

* ১৯৯১ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত।

* আলোকচিত্র: হেইবোনশা পাবলিশারের সৌজন্যে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রপ্রিয় এক জাপানি নারী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অবস্থা কেমন আমার জানা নেই। বলা হয়ে থাকে যে, বিশ্বে মার্কিন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ এর পরেই ভারতের স্থান। বছর দশেক আগেও ভারতে বছরে ৬০০/৭০০ চলচ্চিত্র নির্মিত হত বলে পত্রপত্রিকার ভাষ্য, যা বিস্ময়করও বটে! এখন একাধিক টিভি চ্যানেল চালু হওয়ার কারণে চলচ্চিত্রের নির্মাণ সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বড়পর্দার চলচ্চিত্রের চেয়ে ছোটপর্দা তথা টিভি-চলচ্চিত্রের বুম্ দেখা দেবে।

সাম্প্রতিককালে জাপানে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে এবং বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে ততো ব্যাপকভাবে না হলেও বিদেশী চলচ্চিত্রপ্রিয় জাপানি দর্শকজগতে পরিচিতি লাভ করেছে ইতিমধ্যে। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের বহু নামী-দামী চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে একমাত্র সত্যাজিৎ রায়ের নামই জাপানিরা মোটামুটি জানেন। এটা সমগ্র ভারত এবং বাঙালি জাতির জন্য গর্বের বিষয়। তিনিই একমাত্র বাঙালি এবং ভারতীয় যিনি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার এবং স্বীকৃতি 'অস্কার' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। ফ্রান্সেরও 'Lègion d'Honneur', পুরস্কার লাভে গর্বিত শৈল্পিক চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাছাড়া ভূষিত হয়েছেন ভারতীয় জাতীয় পুরস্কার 'ভারতরত্নে'।

কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রের গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও জনপ্রিয়তা এখনো আশানুরূপ গড়ে উঠছে না জাপানে। যেমন রয়েছে মার্কিনী চলচ্চিত্রের বাইরে ফ্রান্স, ইতালি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিককালে কোরিয়ান চলচ্চিত্র ও টিভি নাটক জাপানে বুম্ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে ভারতীয় চলচ্চিত্র যদি নিয়মিত জাপানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সর্বপ্রকার চলচ্চিত্রই সাধারণ জাপানিদের আকৃষ্ট করবে সন্দেহ নেই।

জীবনের হাসি-কান্নায় দোল দোলানো চিরতরুণ ভারতীয় চলচ্চিত্রকে ভালবেসে ফেলে আপন মনে কাজ করে চলেছেন একজন জাপানি নারী, মাৎসুওকা তামাকি। যাঁর একান্ত চেষ্টার ফলে আজ জাপানে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুনাম ক্রমশ বিস্তারলাভ করছে। কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছেন তিনি। জাপানে ভারতীয়

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যে কোন অনুষ্ঠান, আলোচনায় তাঁর নাম আজ অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অবশ্য ভারতীয় চলচ্চিত্রাঙ্গনেও তিনি এখন যথেষ্ট পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে মাৎসুওকার প্রথম পরিচয় ১৯৫০ সালে, যখন তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখতে যান মার্কিনী 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' ও 'দি সাউন্ড অব মিউজিক' এই দুটি চলচ্চিত্র। তারপর স্বপ্নাতুর অষ্টাদশী মাৎসুওকা পপ্‌সম্রাট এলভিস প্রেসলীর প্রতি হেলে পড়েন, বিশেষ করে প্রেসলীর 'ব্লু হাওয়াইই' তাঁর মধ্যে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর ভাষায়, "এটা আসলেই একটা শক্‌ যে, 'ব্লু হাওয়াইই'তে সবাই কী চমৎকার গান গাইছে, নৃত্য করছে এবং প্রত্যেকেই তাঁদের মনের ভাব সহজে প্রকাশ করছে!" তারপর থেকেই তিনি চলচ্চিত্রের প্রতি এতই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যে কোন ছবি বাজারে হিট্‌ হলেই তিনি তা দেখতে যেতেন। সে অনেক আগের কথা, এখন বয়স হয়েছে তাই বলে চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর মমত্ব, আগ্রহ মোটেই কমেনি বরং বেড়েই চলেছে।

মাৎসুওকা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন যখন তিনি ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শিক্ষা বিভাগে হিন্দি ভাষা শিখতে শুরু করেন তখন তাঁর শিক্ষক তাঁকে হিন্দি ভাষায় পারদর্শী হতে হলে ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখাটা জরুরী বলে উপদেশ দেন। সেই অনুযায়ী তাঁর প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র ছিল 'টয়জ' নামে একটি বিনোদনমূলক ছবি। যাতে সাধারণ গান বাজনা, নৃত্য, প্রেম, ষড়যন্ত্র এবং শেষে অশুভ শক্তির পরাজয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তৈরি ছিল ছবিটা। যা তাঁকে অভূতপূর্ব আনন্দ দান করে। এই ছবি দেখে তিনি ভারতীয় ছায়াছবির মায়াজালে জড়িয়ে যান।

১৯৭৫ সাল। এই বছর তাঁর জীবনে ঘটে এক অপ্রত্যাশিত দুঃখময় ঘটনা। তাঁর স্বামী পরলোক গমন করেন। শোকে দুঃখে মুহ্যমান মাৎসুওকা মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে ভারত ভ্রমণ করেন। ভারতে থাকাকালে একাধারে তিনি অনেকগুলো ছবি দেখেন শুধু আনন্দ লাভের জন্য। তাঁর ভাষায় "সেখানে দুই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। প্রথমটি আগাগোড়া সিরিয়াস, দ্বিতীয়টি বিনোদনমূলক।" এই ভ্রমণের সময় তাঁর

সেই মানসিকতা ছিল না ভেবে দেখার যে, ভারতীয় শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্রগুলো কেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের কাছে এত আলোচিত, গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁকে ভারতীয় বিনোদনমূলক ছবির যে সরল কাহিনী প্রেম, নৃত্য, গীত, ভীলেনের প্রতি ঘৃণা, সুন্দরী নায়িকার প্রতি সহানুভূতি এবং নায়কের বীরোচিত চরিত্র হরহামেশা রয়েছে সেসব গভীরভাবে আকৃষ্ট করে, যা জাপানি বা আমেরিকা কিংবা য়োরোপের চলচ্চিত্রে এভাবে নেই। অর্থাৎ জটিলতা নয়, নির্জলা আনন্দই তাঁর ভাষায় চলচ্চিত্র!

তিনি তখন ভাবেন সাধারণ জাপানি চলচ্চিত্র দর্শকরা ভারতের এই ধারার ছবিকে গ্রহণ করবে। এবং সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় চলচ্চিত্রকে জাপানে জনপ্রিয় করে তুলবেন। এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি ১৯৭৮ সালে হংকং যান এবং পাঁচটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভিডিও কিনে আনেন। টোকিয়োর আকাবানে শহরে তাঁর ছোট্ট বাসাটিকে একটি ক্ষুদ্র মিলনায়তনে পরিণত করে শুরু করেন তাঁর কাজ। চা-সেবার সঙ্গে মাত্র ৫০০ ইয়েনের বিনিময়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। সেইসঙ্গে প্রকাশ করেন হস্তলিখিত মাসিক 'ইনদোৎসুশিন' বা 'ভারত বার্তা' নামে একটি ছোট্ট তথ্যপত্র। এখন এটি মূলত ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকার সাংস্কৃতিক তথ্যাদিসহ মুদ্রিত আকারে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এর ৩৩৭ নম্বর নভেম্বর '০৬ সংখ্যাটি হাতে এসে পৌঁছেছে। এই প্রকাশনাটির মাধ্যমে তিনি ভারতের চমৎকার চলচ্চিত্র-বিনোদন মাধ্যমকে জাপানি সমাজে পরিচিত করার প্রচেষ্টায় একদিন নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ তিন বছরে মোটামুটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের খবর স্থানীয় জাপানিদের কাছে পৌঁছে যায়।

এর মধ্যে হঠাৎ করে ১৯৮১ সালে 'গ্রুপ গেনদাই' নামে একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা তাঁদের নিজস্ব মিলনায়তনকে ব্যবহার করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানান। এই ঘটনা তাঁকে অপ্রত্যাশিত আনন্দে বিহ্বল করে। তিনি বলেন, "এটা আমার জন্য ছিল বিরাট সুযোগ। যেখানে আমি আমার বাসায় মাত্র পাঁচজন দর্শককে স্থান দিতে পারি না, সেখানে গেনদাই প্রদর্শনীকক্ষে বিশ থেকে তিরিশজন দর্শককে স্থান দেয়া সম্ভব!" তার পরপরই টোকিয়োর শিমোকিতাজাওয়া শহরে অবস্থিত

'আসুন' নামক একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্ট তাঁকে ছবি প্রদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রদর্শনী মূল্য আগেরই মতো ৫০০ ইয়েন। ফলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ক্রমশ মাৎসুওকা। পরবর্তী প্রদর্শনের জন্য প্রচারপত্র তৈরি করা, সাবটাইটেল লেখা এবং ঘরে ঘরে প্রচারপত্র বিলি করার কাজে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনে প্রচারপত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তখন খন্ডকালীন একজন কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাষা বিভাগে। এখানে যা বেতন পেতেন তাই দিয়ে তাঁর সংসার চালানো বাকীটা জমা করতেন ব্যাংকে। আর দর্শনীর প্রাপ্ত আয় দিয়ে প্রচারপত্রের খরচ বহন করতেন। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ভাষায় বলেছিলেন, "আমি অর্থের জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করি না। এটা আমি করতে ভালবাসি।" তাঁর প্রচেষ্টার গুণে ক্রমশ ভারতীয় চলচ্চিত্রের জাপানি ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৮২ সালে তাঁর কর্মপ্রবাহ হঠাৎ করে অন্যদিকে মোড় নেয়। এ বছর জাপান ফাউন্ডেশন ফোরাম এর এশিয়া সেন্টার সংস্থা 'দক্ষিণ এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব'এর আয়োজন করে। তাতে ইন্দোনেশিয়া, থাই, শ্রীলংকা, ফিলিপিনী চলচ্চিত্রের পাশাপাশি তিনটি ভারতীয় চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলোর সাবটাইটেল হিন্দি থেকে জাপানিতে অনুবাদ ও প্রচারের কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমন্ত্রিত হন। এখানে তিনি পরিচিত হন জাপানের প্রতিষ্ঠিত দুজন চলচ্চিত্র সমালোচক তাদাও সাতো এবং য়োশিয়ো শিরাই এর সঙ্গে। তাঁরা সমগ্র এশিয়া খুঁজে এগারোটি চলচ্চিত্র জাপানে আমদানি করে জাপানের অন্যতম বৃহৎ মিলনায়তন 'ইয়াকুল্ট হল' শিনবাশি শহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। মাত্র ৫০০ আসনের সীমাবদ্ধতা ঘোষণা সত্ত্বেও মিলনায়তন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মাৎসুওকার ভাষায়, "এটা ছিল অভূতপূর্ব সাফল্য।" এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজে একটি ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে গেনদাই এর সঙ্গে যৌথভাবে ভারত সরকারের কাছ থেকে তিনটি চলচ্চিত্র ক্রয় করেন। প্রতিটি চলচ্চিত্রের মূল্য পড়েছিল গড়ে ১,০০০ মার্কিন ডলার। ,কিন্তু দুর্ভাগ্য। তার উৎসব ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ২.৫

মিলিয়ন জাপানি ইয়েন গচ্ছা দেন। তারপর দ্রুত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেনা তিনটি প্রিন্ট ভিডিও করে সারা জাপানে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অন্ততঃপক্ষে আগামী পাঁচ বছর আর কোন নতুন উদ্যোগ নেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ১৯৮৫ সালে তাঁর জন্য পুনরায় আরেকটি সুযোগ নিয়ে আসে জাপানের অন্যতম প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'সেইবু ডিপার্টমেন্ট স্টোর'। প্রতিষ্ঠানটি ২০০ আসন বিশিষ্ট একটি স্টুডিওতে মাৎসুওকাকে তাঁর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানায়। এবার তিনি ভারত থেকে ভালো ছবির প্রিন্ট ভাড়া করে আনেন। যাতে আর অর্থ গচ্ছা দিতে না হয়। এবার বেশ ভালো দর্শক পাওয়া যায়। এটাকে তিনি তাঁর প্রথম বিজয় বলে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, "ছোট্ট মিলনায়তন পূর্ণ হয়ে যায়, আগতরা বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে ছবি দেখেন। দরোজা বন্ধ করা হয়ে ওঠে না। ......আমার তখন বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, দেখো এটাই--যা আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম।"

এই ক্ষুদ্র সাফল্যের রেখা ধরে আরও একধাপ সাহসী হয়ে ১৯৮৩ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেন এবং '৮৫ সালে আরেকবার। দুটো উদ্যোগেই আর বিফল হলেন না, ফলে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। ১৯৮৮ সালে জাপানের সুবিখ্যাত মঞ্চ, চলচ্চিত্র এবং বিনোদনজগতের তথ্য প্রচারকারী সাময়িকী 'পিয়া' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে বেশ বড় একটি উৎসবের আয়োজন করেন। ১৯৯০ সালেও অনুরূপ জাপান ফাউন্ডেশন ফোরাম এর এশিয়া সেন্টারের উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসব করতে সক্ষম হন। এই দুটি ঘটনা তাঁর অগ্রগমনের পথকে আরও প্রশস্ত ও গতিময় করে দেয়। পেছনে ফিরে তাকানোর অবসর আর থাকেনি।

১৯৯৪ সালের কথা। তাঁর এই কর্মকান্ডের বয়স এই বছর ১৮ বছরে পড়ে, তখন তিনি এশিয়া চলচ্চিত্রের আদি-অতীত-বর্তমান সম্পর্কে গবেষণায় নিয়োজিত হলেন। পাশাপাশি সীমিত সংখ্যক দর্শকের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করতে লাগলেন। 'সিনেমা এশিয়া নিউজ' নামে একটি পোস্টকার্ড নিয়মিতভাবে প্রেরণ করছেন। থেমে নেই তিনি।

১৯৯৭ সালে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রটি জাপানে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা

লাভ করে তার নাম 'রাজু'। তার পেছনে মাৎসুওকার প্রচেষ্টা ছিল অনন্য। তার পরের বছর ১৯৯৮ সালে 'মুতো ড্যান্সিং মহারাজা' জাপানি ভাষায় 'মুতো ওদোরু মাহারাজা' ৪৩ বছর পর এই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে সরাসরি জাপানের প্রধান সিনেমা-ঘরে প্রদর্শিত হওয়ার গৌরব অর্জন করে। দ্রুত অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে এটি। ধারাবাহিকভাবে 'ইন্দিরা' ছবিটিও জাপানিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এই বছরই জাপান ফাউন্ডেশন ফোরাম এর এশিয়া সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব', তাতে দুটি তামিল এবং দশটি হিন্দিসহ সর্বমোট বারোটি চলচ্চিত্র প্রর্দশনের আয়োজন করা হয় জুলাই ২৯ থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত। ছবিগুলো হচ্ছে: JHANAK JHANAK PAYAL BAAJE, JIS DESH MEN GANGA BEHTI HAI, KAALA PATTHAR, MR. INDIA, 1942 A LOVE STORY, KARAN ARJUN, AAG, BARSAAT, MERA NAAM JOKER, BOBBY, MOUNA RAGAM, THALAPATHI.

২০০০ সালের ডিসেম্বর ৮ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত জাপান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এশিয়া সেন্টার পরিকল্পিত ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী বলে খ্যাতিমান অভিনেতা.পরিচালক গুরু দত্ত স্মরণে একটি উৎসবের (Guru Dutt Retrospective) আয়োজনের নেপথ্যে তাঁর পরিশ্রমী ভূমিকা ছিল সাফল্যের মূল কারণ। এই আয়োজনে নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলো ছিল: BAAZI, JAAL, BAAZ, AAR PAAR, MR. & MRS. 55, PYAASA, KAAGAZ KE PHOOL, CHAUDHVIN KA CHAND, SAHIB, BIBI AUR GHULAM. সেইসঙ্গে গুরু দত্তর উপর নির্মিত স্বনামধন্যা ভারতীয় চলচ্চিত্র গবেষিকা নাসরিন মুন্নি কবীর এর 'Guru Dutt: A Life in Chinema' প্রামাণ্য চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হয়। তিনিও উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। এই রকম ব্যয়বহুল একটি আয়োজন নিঃসন্দেহে বড়মাপের কাজ তা আর না বললেও চলে।

মাৎসুওকার আগ্রহ আর পরিশ্রমের কল্যাণে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জাপান সফরে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ, সাক্ষাৎকার এবং তত্ত্বাবধানের দায়-দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হয়। এখন যে কোন

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ভারতীয় বা এশিয়া চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা, পরামর্শের জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। আলোচনায় তিনি নিজেও অত্যন্ত উৎসাহী। ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুভূতিকে তিনি অভিহিত করেছেন 'আবিষ্কারের আনন্দ' বলে। তাঁর ভাষায়, "হলিউডের চলচ্চিত্র বড্ড নিয়মতান্ত্রিক। কৌতূহল, ঔৎসুক্য বা আনন্দটা বড় সীমিত। তাছাড়া পুরনো অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে সমগ্র চলচ্চিত্র জগতটা ঘুরপাক খাচ্ছে। য়োরোপের শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রগুলো রুচিশীল, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এখন সেই ছবিও তৈরি প্রায় বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিকটা হচ্ছে: গড়পড়তা ভারতীয় ছবিগুলো সাধারণ শিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষকে আকৃষ্ট করে থাকে, এমনকি দর্শক উৎসুক হয়ে থাকে শেষের দৃশ্যটি দেখার জন্য। দর্শনীও সস্তা। ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতারা জানেন যে দর্শককুল নির্মাতার উপর নির্ভর করে থাকেন দৈনন্দিন সমস্যা-জর্জরিত জীবনে কিছুক্ষণের জন্য নির্জলা আনন্দ এবং মানসিক উপশম দেবে এমন একটি ছবির আশায়। ফলে নির্মাতাও এই দিকটি মন দিয়ে বিবেচনা করে থাকেন।"

বর্তমানে চীনবিষয়ক জনৈক গবেষকের গৃহিণী মাৎসুওকা ভাবছেন এখন সময় এসেছে তার কর্মকান্ডকে আরও প্রসারিত করার। তিনি টোকিয়ো ফাউন্ডেশন থেকে সাত মাসের একটি বৃত্তি নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার চলচ্চিত্র সম্পর্কে গবেষণা করে লিখেছেন 'আজিয়া: এইগা নো মিয়াকো' বা 'এশিয়া: চলচ্চিত্রের রাজধানী' বিষয়ে একটি গ্রন্থ। সন্দেহ নেই তাঁর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা জাপানে এশিয়া তথা দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতিকে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। তাঁর ভাষায়, "জাপানের তরুণ সমাজ এখন প্রচন্ড আগ্রহ প্রকাশ করছে এশিয়ার সংস্কৃতি ও জীবনযাপন সম্পর্কে। যা আমাদের প্রজন্মে ছিল না।" এখন তিনি এশিয়ার চলচ্চিত্র সম্পর্কে জাপানের বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্থার সেমিনারে বক্তৃতা, আলোচনার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত এশীয় চলচ্চিত্রের বিচিত্র সুর ও সৌরভ। যাতে করে জাপান এশিয়ার দেশগুলোর সাংস্কৃতিক ভাবধারার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারে।

মাৎসুওকা অবসরে মাঝে মাঝে অতীতকে স্মরণ করেন, যেখানে

তিনি শুরু করেছিলেন মাত্র ৫০০ ইয়েনের বিনিময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী। তাঁর ভাষায়, "উফ্! সেটা ছিল অতুলনীয় এক আনন্দ। কিন্তু এখন সময় এসেছে এই কর্মকান্ডকে অন্যরূপ দেয়ার।" আর সেটা হচ্ছে ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে জাপানি নাগরিকদেরকে আরও বেশি আগ্রহী করে তোলা।

আজকে জাপানি সমাজে শুধুমাত্র ভারতীয় চলচ্চিত্র বিষয়েই নয়; সমগ্র এশিয়ার চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর নাম বিভিন্ন মঞ্চে উচ্চারিত হচ্ছে, ফলে চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক একটি আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কর্মকান্ড জানার জন্যও তরুণ জাপানিদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। অত্যন্ত 'ভারতীয়কারি'প্রিয় মাৎসুওকা নিয়মিত 'কারিপার্টি'র আয়োজন করে থাকেন যেখানে বিভিন্ন বয়সের জাপানি, ভারতীয় এবং অন্যান্য এশীয় দেশের নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন।

আত্মবিশ্বাস আর একনিষ্ঠতা থাকলে শূন্য থেকে উপরে ওঠা যে সম্ভব তার জ্বলন্ত প্রমাণ মাৎসুওকা তামাকি!

তথ্যসূত্রঃ

১. দি জাপান টাইমস্

২. জাপান ফাউন্ডেশন ফোরাম

৩. Art Magazine. htwi

* ১৯৯৫ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' এবং ২০০৬ সালে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত

* আলোকচিত্র: জাপান ফাউন্ডেশন ফোরাম; ইনদোৎসুশিন এর সৌজন্যে

জিদাইগেকি: অনন্য এক সংস্কৃতি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুমুল স্রোতে এখনো যে হারিয়ে যায়নি ঐতিহ্যবাহী নাট্যশিল্প জিদাই-গেকি বা সামুরাই ড্রামা, তার প্রধান কারণ জাপানিদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনাবোধ

জিদাইগেকি ইংরেজিতে যাকে বলা হয়: A period play. জাপানি পুঁথিগত ভাষায় যার অর্থ আসলে ঐতিহাসিক নাটক এবং চলচ্চিত্র। অবশ্য লোকমুখে 'সামুরাই ড্রামা' হিসেবে সর্বাধিক প্রচারিত, প্রচলিত। জাপানে বিদেশী বলতেই চলচ্চিত্র না হোক, অন্ততঃপক্ষে টেলিভিশনের একাধিক চ্যানেলের জিদাইগেকি বা সামুরাই ড্রামার সঙ্গে পরিচিত। এই সামুরাই ড্রামা সম্পর্কে কৌতূহলেরও শেষ নেই। প্রকৃতপক্ষে, জিদাইগেকি সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ জাপানি ভাষায় থাকলেও ইংরেজিতে লিখিত এখনো চোখে পড়েনি। গ্রন্থ, সাময়িকীতে গ্রন্থিত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় এই প্রথম জাপানের জিদাইগেকি কি, তার অতীত ইতিহাস, কুশীলব ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব।

জিদাইগেকি সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে একটি 'সেওয়ামোনো' অন্যটি 'কিজেওয়ামোনো'। সেওয়ামোনো হচ্ছে বাস্তবধর্মী নাটক, যেখানে এদো যুগের (১৬০৩-১৮৬৮) সাধারণ মানুষের জীবনযাপনকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কিজেওয়ামোনা হচ্ছে, সমাজে বসবাসকারী অপরাধী বা ইয়াকুজা (জাপানি মাফিয়া) প্রভৃতির কাহিনী। জিদাইগেকি জাপানের ঐতিহ্যবাহী মঞ্চনাটক কাবুকি, নোহ্ এর বিশেষ প্রভাব গ্রহণ করেছে। অবশ্য অন্যান্য ধ্রুপদী নাট্যকলার প্রভাবও এতে রয়েছে, যেমন বুন্‌রাকু বা পুতুল নাচ্ এবং কৌরান বা এক প্রকার গাঁথা, যেমন 'জিরোকিচি'র উপাখ্যান। জিরোকিচি ছিলেন এদোর (বর্তমান টোকিয়ো) কুখ্যাত দস্যু। ডাক নাম ছিল 'নেজুমি কোজো'।

তাইশো যুগে (১৯১২-২৬) মঞ্চায়িত জনপ্রিয় গল্প এবং আদি অভিনেতা সাওয়াদা শোজিরোর প্রচলিত 'শিন্‌কোকুগেকি' ধারার ব্যবহার লক্ষ করা যায় কিছু ঐতিহাসিক নাটক বিশেষ করে 'চাম্‌বারাগেকি' বা 'চাম্‌বারা থিয়েটারে'। শোজিরো এর মঞ্চায়িত 'কুনিসাদা' ও 'শিমিজু নো জিরোচো' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দুটির প্রধান চরিত্র সমাজ থেকে বহিষ্কৃত অপরাধীদের নিয়ে সৃষ্ট। এই দুটি বিষয়ও জিদাইগেকির উপর প্রভাব রেখেছে। কাজেই বলা যায়, জিদাইগেকি অনেক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আজকের জনপ্রিয় আঙ্গিকে রূপান্তরিত হয়েছে।

কেন জাপানিরা জিদাইগেকির এত ভক্ত? এর উত্তর হচ্ছে, জিদাই-

গেকির 'হিরো' সামুরাইরা অত্যাচারীকে দমন করে দুর্বলকে রক্ষা করে বলে। অর্থাৎ শাশ্বত সত্যের জয়লাভকে জাপানিরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। যা এই বিশিষ্ট আঙ্গিকধর্মী নাটকের অন্যতম প্রধান দিক।

জিদাইগেকির ইতিহাস ও বিবর্তন

জাপানের জিদাইগেকির ইতিহাসে ১৯৯৩ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছর জিদাইগেকির প্রাচীন একটি ছবির প্রিন্ট হিরোশিমা-জেলার পুরনো এক বাড়ির ভাঁড়ার থেকে আবিষ্কৃত হয়। ছবিটির নাম 'শুউজি থাবি নিক্কি' বা 'শুউজির ভ্রমণলিপি'। পরিচালক ইতো দাইসুকে। সংবাদটি ছিল নিঃসন্দেহে জাপানি চলচ্চিত্র জগতে বিস্ময়কর এবং জিদাইগেকি ভক্তদের জন্যে দারুণ আনন্দের সংবাদ! ছবিটি তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল তবে প্রথম পর্বের প্রিন্টটি অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ দিয়ে পুনর্নির্মাণ করে তিনটি পর্বই 'জাপান ন্যাশনাল ফিল্ম সেন্টারে' প্রদর্শিত হয়। ছবিটি দেখে চলচ্চিত্র জগতের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকগণ একে জাপানি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যুগপৎ প্রথম চলচ্চিত্র শিল্প ও মহৎ শিল্পকর্ম বলে আখ্যায়িত করেন। শুধু তাই নয়, শোওয়া ২/৩ সালের (১৯২৭-২৮) দিকে নির্মিত উক্ত ছবিটি জাপানি চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'বেস্ট ওয়ান' বলে পুরস্কৃতও হয়। ছবিটির কাহিনী এদো যুগের কুনিসাদা শুউজি নামে একজন ইয়াকুজার ভ্রমণঘটনা নিয়ে তৈরি--নির্বাক ছবি। এর চরম পরিণতি-পর্বে শুউজি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত, তাঁর সেবাযত্ন করছে তাঁরই অনুসারীরা। তাঁরা যখন দলপতিকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল আইনরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে করতে, সে দৃশ্যটি বাস্তবিকই হৃদয়গ্রাহী। কেননা দলপতির করুণ পরিণতিতে যে করুণরসের প্রকাশ এ দৃশ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা তখনকার দিনের তুলনায় অত্যন্ত মুন্সিয়ানার পরিচায়ক বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উদ্ধারকৃত ছবিটির মাধ্যমে উক্ত ছবির পূর্ববর্তী সময় ও পরের কয়েক বছরে জাপানি চলচ্চিত্র তার প্রথম স্বর্ণযুগ হিসেবে যে পরিচিতি লাভ করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে ছবিটি সাধারণের দেখার জন্যে ভিডিও হিসেবে টোকিয়োর আয়াসে শহরে অবস্থিত চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা মাৎসুদা মুভি কোম্পানিতে রক্ষিত আছে। এছাড়া জাপানের সবচেয়ে

দীর্ঘ জিদাইগেকি হিসেবে পরিচিত এবং মেইজি ১৩ সালে (১৮৮১) নির্মিত খ্যাতনামা অভিনেতা ওওনোওয়ে মাৎসুনোসুকে অভিনীত 'চুশিন্‌গুরা'ও একটি প্রাচীন চলচ্চিত্র। ছবির চেয়েও বলা প্রয়োজন সে সময় বিভিন্ন স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপস্থাপিত জিদাইগেকি নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের ফিল্মবন্দী প্রামাণ্য চিত্রগুলোর একটি সংকলিত রূপ। কিন্তু দৃশ্যগুলোতে ধারণকৃত চাম্‌বারা শৈলীতে (মূলত তলোয়ার যুদ্ধকে প্রাধান্য দিয়ে যে সকল জিদাইগেকি চলচ্চিত্র তৈরি হয় সেগুলো 'চাম্‌বারা' নামে পরিচিত) তলোয়ার ঘুরিয়ে, আগে-পিছে ও চর্তুদিক থেকে পরিবেষ্টিত শত্রুদের খতম করার দৃশ্য (যাকে বলা হয় তাচিমাওয়ারি) এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কৌশল এত চমৎকার যে অভিনয়শিল্পের ইতিহাসে এগুলো অমূল্য আকর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ছবির তলোয়ার লড়াইয়ের প্রভাব পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা চাম্‌বারা চলচ্চিত্রের উপর দারুণভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। তবে প্রাচীন ছবিগুলোতে অভিনয়ের গতিশীলতা তেমন ছিল না বটে কিন্তু মাৎসুনোসুকের তলোয়ার চালানোর কৌশল পরবর্তীকালে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরও সুচারু, আরও গতিশীল হতে দেখা যায় তাইশোও ১২ সালের (১৯২৪) নতুন জিদাইগেকি চলচ্চিত্র ও মঞ্চনাটকে। এ পর্যন্ত জিদাইগেকি সাবেক জিদাইগেকি হিসেবে নামাঙ্কিত হয়।

নতুন জিদাইগেকি-যুগের সৃষ্টি করেন অভিনয় তারকা বানদো সাবুরো। ১৯২৪ সালের দিকে কাবুকি অভিনেতা সাওয়াদা শোজিরো আমেরিকার 'ওয়েস্টার্ন' ছায়াছবি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বপ্রচলিত 'শিন্‌কোকুগেকি' নামক একটি ধারায় 'গিয়াকুরিউ', 'ওরোচি', 'সাকামোতো' প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যেগুলো মাৎসুদা মুভি কোম্পানিতে রয়েছে। একই সময় আরও তিনজন জিদাইগেকি নির্মাতার একটি দলের কথা জানা যায়। পূর্বে উল্লেখিত 'শুউজি থাবি নিক্কি' ছবির পরিচালক ইতো দাইসুকে, স্টার ওওগুচি দেন্‌জিরো ও ক্যামেরাম্যান কারাসাওয়া হিরোমিৎসু—এই তিনজনের দলটি অনেকগুলো ছবি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মাত্র একটি ছবি 'ওআৎসুরায়েজিরো কিচিগোশি' সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা গেছে, যা বর্তমানে উপরোক্ত মুভি

কোম্পানিতে সংরক্ষিত আছে। অন্যান্য ছবিগুলোর মধ্যে স্টার ওওগুচির অভিনয় তখনকার দর্শকদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা বোঝা যায় তাঁর অভিনীত অত্যন্ত সার্থক একটি চরিত্র 'তান্‌গেসাজেন' সিরিজে। সেখানে তিনি একচক্ষু ও একহস্তবিশিষ্ট সুদক্ষ তলোয়ার-লড়াকু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এসময়ের আরেকজন অভিনেতা মাকিনো মাসাহিরার কথাও জানা যায়। তার অভিনীত ছবি 'রোওনিগাই'। এ ছবিতে শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁর অসি চালনা উপভোগ করার মতো।

তাইশো যুগের পর এলো শোওয়া যুগ (১৯২৬-১৯৮৯)। শোওয়া ৩০ সাল (১৯৫৪) পর্যন্ত যে ক'জন অভিনেতা জিদাইগেকি চলচ্চিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁরা হলেন: ইচিকাওয়া উতাইমোন, কাতাওকা চিয়েজো, আরাশি কানজো, হাসেগাওয়া কাজুও প্রমুখ। পরবর্তীকালে অবশ্য ওওগুচি দেন্‌জিরো এবং আরাশি কানজো পার্শ্ব-অভিনেতায় পরিণত হন। কিন্তু অন্যরা তরুণকাল থেকে পরবর্তী ৬০ বছর পর্যন্ত নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁদের জনপ্রিয়তা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। তখনকার জিদাইগেকির ক্ষেত্রে কাহিনী, সংলাপ, নতুন ধারার অসি চালনার কৌশল ইত্যাদির পাশাপাশি অভিনেতাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তি ছবির ব্যবসার প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হত। যেমন ধরা যাক ইচিকাওয়া উতাইমোনকে, যখন শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায় ঝকমকে পোশাকে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের সামনে হা হা হা করে তাচ্ছিল্য ভরা অট্টহাসি দেন, তখন প্রতিপক্ষের লোকেরা বুঝে যেত যে অত সহজে জয়লাভ করা যাবে না। দর্শকও তাঁর হাসিটিকে উপভোগ করতেন। অথবা কাতাওকা চিয়েজো যখন বাহুর কাপড় সরিয়ে পিঠের 'উল্‌কি' প্রতিপক্ষকে দেখান, সেই ভঙ্গিমার জুড়ি মেলা ভার। এভাবে প্রত্যেকেই কোন না কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন বলে ভক্তদের মনে সুদীর্ঘকাল আসন করে নিতে পেরিছিলেন কি অভিনয়ে, কি সংলাপ উচ্চারণে, কি অসি চালনায় অসামান্য ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা। এখানেই ছিল তাঁদের অভিনয়-শিল্পী জীবনের কৃতিত্ব।

অবশ্য তারুণ্যও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিদাইগেকির ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন জাপান আমেরিকার অধীনে ছিল, জিদাইগেকি নির্মাণের উপর বিজয়ী মিত্রশক্তির ছিল প্রচন্ড কড়াকড়ি। এই আশংকায় যে, এসব জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ছায়াছবি, মঞ্চনাটক পুনরায় সামন্ততন্ত্র তথা 'সামুরাই যুগে'র জন্ম দিতে পারে। কিন্তু মার্কিনী দখলত্ব থেকে মুক্তিলাভের পর জিদাইগেকিতে নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগে। আবির্ভূত হয় বিংশ শতকের কতিপয় সুদর্শন, সুপুরুষ তারকা, যেমন নাকামুরা কিন্‌নোসুকে, আওগাওয়া হাশিজো, ইচিকাওয়া রাইজো, কাৎসু শিন্‌তারো প্রমুখ তারকাবৃন্দ। এঁদের আবির্ভাবের পূর্বলগ্ন পর্যন্ত জাপানের ঐতিহ্যবাহী কাবুকি থিয়েটার, ঐতিহাসিক মঞ্চনাটক প্রভৃতিতে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে যে সমান্তরাল শিল্প-বিমূর্ততা বিরাজ করছিল, সেটাতে তুমুল একটা ধাক্কা দেয় উঠতি শিল্পীদের সশব্দ আগমন। বিংশ শতকের এসকল তারকাদের জনপ্রিয়তা যে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল, তার কারণ অবশ্য অগ্রজ শিল্পীদের অধিনায়কত্ব। ইচিকাওয়া উতাইমোন ও কাতাওকা চিয়েজো প্রমুখেরা নতুন শিল্পীদের উপর আসন গ্রহণ করে প্রধান প্রতিপক্ষের চরিত্রে আবির্ভূত হন। এ সুযোগে তাঁরা পুনরুদ্ধার করেন তাঁদের অপহৃত জনপ্রিয়তা।

বাস্তবধর্মী জিদাইগেকির সূচনা

৬০-৭০ দশকে জিদাইগেকির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। আর এই পরিবর্তনের সূচনা করেন বিশ্বখ্যাত অ্যাক্‌শন চলচ্চিত্রের জনক বলে কথিত আকিরা কুরোসাওয়া। ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কাওয়াবাতা ইয়াসুনারির বিখ্যাত উপন্যাস 'রাশোমোন'কে কুরোসাওয়া চলচ্চিত্রে রূপ দেন। অবশ্য এর আগে ১৯৪৩ সালে 'সুগাতা সান শিরো' তৈরি করে কুরোসাওয়া চলচ্চিত্র মহলে সাড়া ফেলতে সক্ষম হন। তারপর রাশোমোন যা এক অসাধারণ কাজ! কিন্তু ওদেরকে ছাড়িয়ে শোওয়া ২৯ সালের (১৯৫৪) দিকে তাঁর নির্মিত 'শিচিনিন্‌ সামুরাই' চলচ্চিত্রটি জাপানসহ বর্হির্বিশ্বে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই চলচ্চিত্রের বদৌলতে জাপানের কুরোসাওয়া পরিণত হলেন 'বিশ্বের কুরোসাওয়া'তে। অসাধারণ প্রতিভাধর এই চলচ্চিত্র নির্মাতা যেমন শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র তৈরিতে সিদ্ধহস্ত, তেমনি বাস্তবধর্মী জিদাইগেকি

চলচ্চিত্র নির্মাণ করে জাপানি চলচ্চিত্র জগতের মানচিত্রটাই পাল্টে দিলেন! উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর 'শিচিনিন্ সামুরাই' অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল অসামান্য জনপ্রিয় আমেরিকার ওয়েস্টার্ন 'ম্যাগ্নিফিসেন্ট সেভেন' ছবিটি। শুধু যে আমেরিকা তা নয়, তাঁর আরেকটি ছবি 'য়োজিনবো' অবলম্বনে ইতালীয় ওয়েস্টার্ন ছবিও তৈরি হয়েছে। 'শিচিনিন্ সামুরাই' এর পর এক নাগাড়ে আরও কয়েকটি বিশাল বাজেটের ছবি তিনি তৈরি করেন, যেমন 'য়োজিনবো', 'ৎসুবাকি সানজুরো', 'আকাহিগে', 'কাগেমুশা', 'রান' প্রভৃতি। এসব জিদাইগেকিগুলোতে তিনি আদর্শ কাবুকি ও নোহ্ নাটকের ভাবভঙ্গি, শৈলী; সনাতন পোশাক পরিচ্ছদ, বাচনভঙ্গি, অভিনয়, সংলাপ উচ্চারণ এবং সাজানো-গোছানো পারিপার্শ্বিকতা বা পরিবেশ; অর্থাৎ এতদিন জিদাইগেকি চলচ্চিত্রে প্রচলিত ধারা বা ঐতিহ্য হিসেবে যা চলে আসছিল, তিনি সবকিছুকে বাদ দিয়ে বাস্তবতা বা বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগচর্চায় আগ্রহী হন। যেমন এদো যুগের দরিদ্র জনগণের ময়লা, ছেঁড়া কাপড় দেখালেন, তেমনি সামুরাইদের পরিপাটি পোশাকও দেখালেন। দৃশ্যের ক্ষেত্রে এদো যুগ ও ছেনগোকু যুগের (গৃহযুদ্ধকাল) বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। অ্যাক্শনের ক্ষেত্রেও নিয়ে আসেন অভূতপূর্ব পরিবর্তন। মারামারির দৃশ্যগুলোতে ভয়ানক রস ও রোমাঞ্চ। বিশেষ করে সামুরাইয়ের তলোয়ারের আঘাতে ফিন্কি দিয়ে -ছুটে বেরিয়ে আসা প্রতিপক্ষের লাল রক্ত দেয়ালে ছড়িয়ে পড়া, তারপর বেয়ে বেয়ে ঝরা, কিংবা রক্তের ফিন্কি এক মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে দর্শক শিউরে শিউরে উঠতেন! এক কথায় বলা যায়, কুরোসাওয়ার তৈরি জিদাইগেকিতে রক্তের তাজা গন্ধ যেন বিরাজ করত! তাঁর মতো সমসাময়িক আরেকজন পরিচালক উচিদা কামু নির্মিত জিদাইগেকি 'মিয়ামোতো মুসাস্শি' ছবিতেও ঘাম ও রক্ত মিশ্রিত অনুরূপ দৃশ্যাদি দর্শকের মনে ভয়ানক রসের জন্ম দেয়!

আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে এতদিন পর্যন্ত জিদাইগেকি বা ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রসমূহ কিয়োতো স্টুডিওতে তৈরি হয়ে আসছিল। কিন্তু কুরোসাওয়াই প্রথম নির্মাতা যিনি রাজধানী টোকিয়োর স্টুডিয়োতে জিদাইগেকি তৈরি করে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর আগে সাধারণত

টোকিয়োর স্টুডিয়োগুলোতে সমকালীন সামাজিক ছায়াছবিই তৈরি হত। কুরোসাওয়ার ছবি আমেরিকা, মধ্য-দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, য়োরোপের চলচ্চিত্রকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। তাঁর ছবির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে হংকং এর 'কংফু' ছবির জন্ম দেন বিখ্যাত চীনা মার্শাল আর্টিস্ট ব্রুস্ লী।

এ সময়ে শক্তিধর তরুণ অভিনেতা কাৎসু শিনতারো অঢেল মেকআপকৃত সুদর্শন চেহারা নিয়ে পর্দায় এলেও, পরবর্তীকালে তাঁর অভিনীত, দেশ-বিদেশে প্রচন্ড খ্যাতি অর্জিত ছবি 'জাতোইচি'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চরিত্রে রূপদান করেন। এ ছবিতে একজন অন্ধ অসিচালক 'জাতোইচি'র নামভূমিকায় অভিনয় করে তিনি রাতারাতি আশ্চর্যরকম জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হন। ফলে অন্ধ, একচক্ষু ও একহস্তবিশিষ্ট সামুরাই, ইয়াকুজা, পেশাদার হন্তারক, আততায়ী প্রভৃতি চরিত্রের চলচ্চিত্র তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। তৈরি হয় কয়েকটি সিরিজ, যেমন 'মোরি নো ইশিমাৎসু,' 'ইয়াগিউ জুউবে', 'দাতে মাসামুনে', 'তানগেসাজেন' প্রভৃতি।

জিদাইগেকি চরিত্রের সার্থক রূপায়নকারী তারকা কাৎসু শিন্তারো অজানা কারণে রাগান্বিত হয়ে আকিরা কুরোসাওয়ার বিখ্যাত ছবি 'কাগেমুশা'র প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের চুক্তি বাতিল করেন। পরবর্তীকালে অবৈধ মাদকদ্রব্য বহন ও ব্যবহারের অপরাধে গ্রেফতার এবং ১৯৯৪ সালে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুতে জিদাইগেকি জগত হারালো এক শক্তিশালী মহান অভিনেতাকে।

৫০-৬০ এর দশকে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে 'জাতোইচি' দরিদ্র মানুষের 'হিরো' হিসেবে অশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে উন্নত দেশের চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকদের বিচারে শোওয়া ৩০ সালে (১৯৫৫) ইচিকাওয়া কোন্ পরিচালিত ও হাসেগাওয়া কাজুও অভিনীত 'ইউকিনো জোহেনগে' জিদাইগেকিটি শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসিত হয়। এ ছবিতে সুন্দরী 'ওন্নাগাতা' অসাধারণ অসি লড়াইয়ে পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। ওন্নাগাতা হচ্ছে কাবুকি নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র যা সাধারণত পুরুষরা নারী সেজে অভিনয় করেন

'নিন্‌জা'ও জিদাইগেকি চলচ্চিত্র ও নাটকের একটি জনপ্রিয় প্রধান চরিত্র যে সম্পূর্ণ কালো কাপড়ে নিজেকে আবৃত করে গুপ্তচরের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। এই দুটি চরিত্রের প্রয়োগ জিদাইগেকিতে অভূতপূর্ব আনন্দদায়ক মাত্রা যুক্ত করেছিল। এভাবে ৬০ দশক পর্যন্ত জিদাইগেকি চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হয়।

তারপর টেলিভিশন এসে পুরনো যুগকে হটিয়ে বিদায় করে দেয় অতি দ্রুত।

টিভিতে জিদাইগেকির স্মরণীয় যুগ

জাপানে টিভির অনুষ্ঠান চালু হয় ১৯৫৩ সালে। সূচনা করে NHK (নিপ্পন হোসো কিয়োকাই=জাপান সম্প্রচার কেন্দ্র)। গত ৫০ বছরে কত যে টিভি জিদাইগেকি এবং প্রভূত জনপ্রিয় গোয়েন্দা নাটক জন্ম নিয়ে মিলিয়ে গেছে তার হিসেব পাওয়া মুশকিল। ৮০র দশকে এসে ট্রেনডি ড্রামা বা হাল-ফ্যাশনের নাটকের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ক্রমে ক্রমে এরা মিলিয়ে যেতে থাকে। যদিও এখনো কিছু ধারাবাহিক টিকে আছে, কিন্তু বর্তমানে দলে দলে আসা অত্যন্ত তরুণ তারকাদের প্রেম, ভালবাসা, মান-অভিমান, বিরহ-বিচ্ছিন্নতা ইত্যকার অনুভূতিপ্রবণ নাটকের জোয়ারে টিভি চ্যানেলগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে। আর সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেমজ নাটক ও চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছে জাপানে। কিন্তু এসব অসম্ভব জনপ্রিয় ড্রামার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজও এবং এখনো ধারাবাহিকভাবে যে ঐতিহ্যটি টিকে আছে সেটি হল 'জিদাইগেকি'। অবশ্য চলচ্চিত্র হিসেবে নয়, টিভি সিরিজ হিসেবে। এর পাশাপাশি প্রতি বছর নববর্ষে বিশেষ জিদাইগেকি ড্রামা প্রচারিত হয় বারো ঘন্টাব্যাপী। এছাড়াও অব্যবসায়িক সরকারি চ্যানেল NHK-টিভিতে ব্যয়বহুল, ধারাবাহিক ইতিহাসভিত্তিক 'তাইগা ড্রামা' বা বিশাল এবং বিশেষ আয়োজনে জিদাইগেকি নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে।

জিদাইগেকির টিভি সিরিজগুলোর মূল চরিত্রের অভিনেতারা নির্ধারিত হয়ে গেছেন বলা চলে। টিভি জিদাইগেকির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১৯৫৫ সালে টিভিতে প্রথম জিদাইগেকি ড্রামা প্রচারিত হয়। ৬ নম্বর চ্যানেল TBS (টোকিয়ো ব্রডকাস্টিং সিস্টেম) কর্তৃক নির্মিত

ড্রামাটির নাম 'এদোনো কাগেবোশি।' এর অভিনেতা নাকামুরা তাকুইয়া টিভির জিদাইগেকির প্রথম তারকা। বস্তুত এই ড্রামাটি নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় মিনি পর্দায়। 'এদোনো কাগেবোশি'র পরে নাকামুরা একই চ্যানেল কর্তৃক নির্মিত নতুন সিরিজ নাটক 'দাইএদো সোসামো'তেও অভিনয় করেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত চলে সিরিজটি।

১৯৬২ সালে TBS-নির্মিত কমেডি জিদাইগেকি 'নান্দোমোইয়াসান দোকাসা'র প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ফুজিতা মাকোতো। তাঁর কিছু সংলাপ জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬৩ সালে NHK প্রথম ব্যয়বহুল গাথাধর্মী তাইগা ড্রামা 'হানানো শোওগাই' টিভিতে নিয়ে আসে। একই বছর এগিয়ে আসে ৮ নম্বর বাণিজ্যিক চ্যানেল Fuji TV এটি প্রচার করে 'সানবিকি নো সামুরাই'। এ ড্রামাতে টিভির জিদাইগেকির ইতিহাসে প্রথম অসির আঘাতে প্রতিপক্ষকে কাটার তাৎক্ষণিক শব্দের বাস্তবধর্মী প্রয়োগ যন্ত্রাদির মাধ্যমে প্রচলন করা হয়। 'সান্‌বিকিনো সামুরাই'তে প্রধান তিন চরিত্রে অভিনয় করেন তান্‌বা তেৎসুরো, তাইরা মিকিজিরো ও নাগাতো ইসামু প্রমুখ অভিনেতারা।

১৯৬৫ সালে NET (বর্তমানে ১০ নম্বর Asahi tv) প্রচার করে 'সুরোনিন গেক্কাকে হেইকো' জিদাইগেকি। তাতে প্রধান চরিত্র ভবঘুরে 'রোনিন' বা 'মুকুটহীন সামুরাই'য়ের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে কোওনোউয়ে জুশিরো রাতারাতি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এভাবে একটার পর একটা জিদাইগেকি ড্রামা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। যেমন কাহিনীর দিক দিয়ে, তেমন প্রযুক্তির প্রয়োগে এবং রোমান্টিকতার দিক দিয়ে। এ সকল ড্রামার সঙ্গে ১৯৬০ সালে Fuji TV-নির্মিত স্বনামধন্য অভিনেতা ওকাওয়া হাশিজো অভিনীত 'জেনিগাতা হেইজি', ১৯৬৯ সালে TBS-নির্মিত তাইগা ড্রামা 'মিতোকোমোন', ১৯৭০ সালে Fuji TV-প্রচারিত নাকামুরা উমেসাওয়া অভিনীত 'তোয়ামা নো কিন্‌সান', কিংবা Asahi tv-র 'সানবিকিগা কিরু' প্রভৃতি ড্রামা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য! এগুলোর উল্লেখযোগ্য দিক হল যে, নাটকের ঘটনাকাল ছেনগোকু যুগ ও বাকুমাৎসু (সামুরাই এর সমাপ্তিকাল) যুগ এবং নাটকগুলোর মধ্যে নৈতিকতা এবং

সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। অন্ততঃপক্ষে 'মিতো কোমোন' ও 'সুরোনিন গেক্‌কাকে হেইকো' নাটক দুটো এই ধারার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

জিদাইগেকির ৮০ দশকের প্রেক্ষাপট

৭০ দশকের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, জিদাইগেকি চলচ্চিত্রের সঙ্গে টিভি জিদাইগেকির সম্পর্ক বরাবরই বজায় ছিল। ৬০-৭০ দশক পর্যন্ত ১৭৪টি জিদাইগেকি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। কিন্তু ৮০ দশকের শুরু থেকেই সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। '৭১ সালে মাত্র চারটি জিদাইগেকি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এর একমাত্র কারণ হঠাৎ করেই টিভি জিদাইগেকি ড্রামার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। অর্থাৎ টিভির জিদাইগেকি জাপানি সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলত জিদাইগেকি চলচ্চিত্র জগতের সূর্য অস্ত যায়। '৭১ এর শেষদিকে টিভি জিদাইগেকি ড্রামা তৈরির দিকে অনেকেই ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হন। অবশ্য এ সকল পরিচালকদের মধ্যে যিনি প্রথম টিভি জিদাইগেকি বা সামুরাই ড্রামা তৈরি করেন তিনি স্বনামধন্য ইচিকাওয়া কোন্। '৬০ সালের দিকেই Fuji TV-র অধীনে তাঁর নির্মিত 'কোওগারাশি মোনজিরো' ড্রামাটি। বালাবাহুল্য, দর্শককূলকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে এবং রাতারাতি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে যায়। এর ফলে প্রধান অভিনেতা নাকামুরা আৎসুও দ্রুত লাভ করেন তারকাখ্যাতি। মোনজিরোর ভূমিকায় লম্বা টুথপিক্ ঠোঁটে কামড়ে ধরে বিশেষ ভঙ্গিমায় তাঁর উচ্চারিত সংলাপ 'আশশিনিওয়া কাওয়ারি গোজাইমাছেন'! বা 'আমাতে কোন পরিবর্তন নেই'! তখন সকলের মুখে মুখে ফিরেছে। একই বছর পরিচালক কোন্ নির্মিত TBS এর বিখ্যাত সামুরাই ড্রামা সিরিজ 'হিসাস্‌ৎসু' বা 'গুপ্তহত্যা'র প্রথম পর্ব 'হিসাস্‌ৎসু শিক্কাকেনিন্' প্রচার আরম্ভ হয়। অপরাধীকে শাস্তিদানকারী হন্তারককে নায়ক করে তখনকার প্রচলিত নীতিধর্মী জিদাইগেকির বিপরীতে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করাই ছিল পরিচালকের লক্ষ্য। তিনি স্বল্প বাজেটে ড্রামা তৈরির প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী গুপ্তহত্যার দৃশ্যগুলোতে আততায়ীর চোখ শুধু বিশেষ কৌশলে ক্যামেরাবন্দী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাতে করে আলোছায়ার পরিস্ফুটন দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইচিকাওয়া কোন্

ছিলেন এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ফলে তাঁর নির্মিত ড্রামা আরও বেশি আকর্ষণীয় ও রহস্যময় হয়ে ওঠে। এভাবে তিনি টিভি জিদাইগেকি ড্রামা তৈরির ক্ষেত্রেও দারুণ সুনাম অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু এর কিছুকাল পর টিভি ড্রামাগুলোতে গুণগতমান ও কাহিনী লেখক বাছাইয়ের প্রবণতা দেখা দেয়। যার ফলে ৬০ সালে নির্মিত জনপ্রিয় ড্রামা 'কোওগারাশি মোনজিরো'কে ছাড়িয়ে আরও জনপ্রিয় ড্রামা 'হিসাস্‌ৎসু' সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব 'হিসাস্‌ৎসু শিওকিনিন্' প্রচারিত হয়। এতে কাহিনীর চমৎকারিত্বের কারণে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উক্ত ড্রামার প্রধান চরিত্র আঞ্চলিক বিচারালয়ের বিচারক নাকামুরা মোনদো দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী। সম্মুখভাগে তিনি বিচারক বটে, কিন্তু কর্মে অনীহ। পশ্চাতে তিনি অসাধারণ অসিচালক ও হন্তারক, কিন্তু দারিদ্র ও অসহায় মানুষের রক্ষক ও পরম বন্ধু এই অসামান্য চরিত্রে রূপদান করেন জনপ্রিয় তারকা ফুজিতা মাকোতো। তাঁর অভিনয়ের গুণে 'হিসাস্‌ৎসু' সিরিজ তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দীর্ঘ ২০ বছর ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হয়।

অভিনয়গুণের কারণেও যে ড্রামা অসম্ভব দর্শকপ্রিয়তা লাভ করতে পারে তার প্রমাণ ১৯৭৩ সালে স্টার য়োরোজুইয়া কিন্‌নোসুকে অভিনীত 'কোজুরে ওওকামি' সিরিজটি ৭৩ থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত ৪ নম্বর NIHON TV চ্যানেলে প্রচারিত হয়। অন্যদিকে ৭২ থেকে ৭৪ সাল পর্যন্ত ১০ নম্বর Asahi tv চ্যানেলে প্রচারিত হয় 'কোইয়ানো সুরোনিন্' যার প্রধান চরিত্রের ভূমিকাটি ছিল মহাতারকা অভিনেতা মিফুনে তোশিরো অভিনীত ও আকিরা কুরোসাওয়া নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'য়োজিনবো' ও 'ৎসুবাকি সানজুরো'র অনুকরণ।

পূর্বেই বলেছি যে, জিদাইগেকি ড্রামা জিদাইগেকি চলচ্চিত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। বলা যায়, চলচ্চিত্রের মত শক্তিময়তা, উত্তেজনা বা রোমাঞ্চ ফুটিয়ে তোলার চেয়ে অনেকটা আবেগধর্মী ড্রামাটিক পোয়েট্রি বা কাব্যনাট্যের কোমলতা ৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত নির্মিত টিভি জিদাইগেকি ড্রামাতে বিরাজিত ছিল। কিন্তু এধারা ভঙ্গ করেন অসম্ভব শক্তিশালী জিদাইগেকি তারকা কাৎসু শিনতারো। চলচ্চিত্রের মতোই

সিনেমাটিক কোয়ালিটি তিনি উপস্থিত করেন '৭৪ সালে Fuji TV-নির্মিত 'জাতোইচি' ড্রামাতে 'জাতোইচি' চরিত্রের মাধ্যমে। অবশ্য 'জাতোইচি' বহুপূর্বে চলচ্চিত্র হিসেবেও নির্মিত হয়েছে। তবে টিভিতে নতুন আঙ্গিকে সিরিজ হিসেবে প্রচারিত হয় '৭৯ সাল পর্যন্ত।

টিভি জিদাইগেকিতে চারিত্রিক দিক দিয়ে জিদাইগেকির পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু তেমনি ধাঁচে তৈরি ড্রামাও রয়েছে। '৭৮ সালে Fuji TV নির্মাণ করে 'ফুউরোগুমো'। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন আয়াতোরি তেৎসুইয়া। সিরিয়াস কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, কেবল চিত্তবিনোদনমূলক নাটক মাত্র। অবশ্য প্রথাগত কাহিনীর বাইরে রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি নিয়ে জিদাইগেকি ড্রামাও তৈরি হয়েছে NHK কর্তৃক যেমন 'তেন্‌কা গোউবেন' ১৯৭১ সালে, যার কাহিনী বর্তমান রাজনৈতিক কেলেঙ্কারির মতোই। এদো যুগে তোনুমা ওকিৎসুগু নামক জনৈক প্রভাবশালী রাজনীতিক কর্মকর্তা রাজ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে দারুণ ফলপ্রসু হয়েছিলেন। কিন্তু এর পেছনে গোপনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ ছিল যেধারা যুগ যুগ ধরে জাপানি রাজনৈতিক জগতে চলে আসছে। এধরনের ব্যতিক্রমধর্মী জিদাইগেকিও তৈরি হয়েছে ৮০র দশকে। অর্থাৎ জিদাইগেকির ঐতিহ্য ভেঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটকও বেশ কিছু তৈরি হয়েছে। জিদাইগেকির চরিত্রে না পড়লেও অনুরূপ শৈলীতে 'ইয়াকুজা' চলচ্চিত্র ও ড্রামা অনেক তৈরি হয়েছে। 'য়োশিওয়ারা' অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী জাপানি পতিতালয় নিয়েও বেশ কিছু ছবি ও ড্রামা আছে, সেগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত তারকা তাকাকুরা কেন্‌, ওওগাতা কেন্‌, কাৎসু শিনতারো প্রমুখ এসব ছবি ও ড্রামাতে নাম-প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে আজও স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

৯০এর দশকে টিভি জিদাইগেকির অবস্থান

'৮০ সনের দিকে Fuji TV নতুন দিকে মোড় নেয়। ক্রমশ জনপ্রিয় অনুষ্ঠানমালা অর্থাৎ হালকা মেজাজের অনুষ্ঠান তৈরির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এব্যাপারে অন্যান্য টিভি চ্যানেলগুলোর চেয়ে Fuji TV অনেক দূর এগিয়ে যায়। যেমন মানজাই (মঞ্চভিত্তিক কৌতুকানুষ্ঠান), কুইজ শো

প্রভৃতি 'ভ্যারাইটি শো'র স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করে, যার ধারা এখনও প্রতিটি টিভি চ্যানেলে বিদ্যমান। এসময় জিদাইগেকি ড্রামা তৈরির দিকে বেশ ভাটা পড়ে যায়। একমাত্র NHK-তে সমসাময়িক কালের ধারাবাহিক আসা নো টিভি শোসেৎসু বা প্রভাতী নাটক এবং ধারাবাহিক টিভি সামুরাই ড্রামা ছাড়া আর সব নাটকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। সত্যি কথা বলতে কি, জিদাইগেকি ড্রামার অবস্থা আরও শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায়। এই অবস্থায় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে পরিণত জিদাইগেকি নাটকের বুঝি এবার অপমৃত্যু ঘটবে চলচ্চিত্রের মতো এমন আশংকা দেখা দেয়। ৯০ দশকের যুগ বলতে তখন পৃথিবীব্যাপী মার্কিন সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। চলচ্চিত্রের কথা বলি, পপ্ ও রক্ মিউজিকের কথা বলি, সর্বত্র হৈ হৈ রৈ রৈ অবস্থা! নতুন নতুন চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে আমেরিকাতে একটার পর একটা যেমন অরডিনারি পিপল্, চ্যারিঅটস অব ফায়ার, গান্ধী, টার্মস অব এন্ডিয়ারমেন্ট, আমাডিউস, আউট অব আফ্রিকা, প্লাটুন, দি লাস্ট এ্যাম্পেরর, রেইন ম্যান, ড্রাইভিং মিস ডেইজি, ড্যান্স অব দি য়োলভ্জ প্রভৃতি। পপ্-রক মিউজিক বলতে মাইকেল জ্যাকসন, প্রিন্স, স্টিভ ওয়ান্ডার, লিওনেল রিচি, ম্যাডোনা, সিন্ডি লৌপার, হুইট্নি হিউসটন, টনি রজার্স প্রমুখ। ফ্যাশন, ব্ল্যাক-স্ট্রীট কালচার, ম্যাক্‌ডোনাল্ডস, ফাস্ট ফুড কালচার ইত্যাদি তখন সদ্য বাবল্ অর্থনীতির বদৌলতে জাপনি সমাজে হু হু করে প্রবেশ করছে। ১৯৮৪ সালে যখন আমি জাপানে আসি তখন জাপানের সর্বত্র জীবনযাপন, কর্মক্ষেত্র, ব্যবসা, মাস মিডিয়া, খেলাধূলা, বিনোদন, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র-টিভিতে সরাসরি আমেরিকার প্রভাব দেখে জাপানকে আমেরিকা ভেবে ভুল করেছিলাম। ছুটির দিনে তরুণদের শহর শিনজুকু, শিবুইয়া, ওয়েনো, বিশেষ করে য়োয়োগি-হারাজুকু শহরে মার্কিন ট্রেনডি কালচার তরুণ সমাজকে আপাতমস্তক কীভাবে গ্রাস করেছে তা দেখে বিস্মিত হয়েছি! এখনও যে তা নেই তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, ৯০ দশকে আমেরিকার ফ্যাশনেবল্ উন্মাদনার স্রোতে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকা কোন রাষ্ট্রের পক্ষে, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ছাড়া সম্ভব ছিল না। পুঁজিবাদী দেশ জাপানের তো নয়ই। বরং বলা যায় আমেরিকার উদ্ভাবিত ট্রেনডি আইডিয়াকে পুঁজি করে জাপানি কোম্পানি-

গুলো জাপান, আমেরিকারসহ সারা বিশ্বে একচেটিয়া ব্যবসা করেছে এবং এখনও করে চলেছে। যাহোক, সর্বত্র বিদেশী সংস্কৃতির জোরালো প্রভাব জিদাইগেকি সংস্কৃতিতে কিছুটা হলেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তথাপি ১৯৮৫ সালে NIHON TV চ্যানেলে নববর্ষের বিশেষ বারো ঘন্টার জিদাইগেকি ড্রামা 'চুশিনগুরা'র আত্মপ্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অনেক আগে এটি চলচ্চিত্র হিসেবে তৈরি হয়েছে এবং বিশেষ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। কিন্তু টিভিতে কাহিনীকে নতুন করে সাজিয়ে নতুন তারকা সমন্বয়ে নির্মিত হয়। দুই সামন্ত প্রভু তথা সামুরাইয়ের জীবনপণ লড়াইয়ের কাহিনী নিয়ে এই ড্রামাটি তৈরি, যা কিনা মাত্ করে দেয় টিভির নবীন-প্রবীণ দর্শকদের। এতে করে একটা কাজ হয়, জিদাইগেকি ড্রামা তৈরির প্রবণতা কিছুটা ফিরে আসে। এরপর তৈরি হতে থাকে ট্রেনডি ড্রামার পাশাপাশি জিদাইগেকি বা সামুরাই ড্রামাও, তবে সংখ্যায় কম। Fuji TV-তে পুরনো জিদাইগেকি ড্রামা সিরিজ 'ওনিহেই হানকাচো' পুনরায় তৈরি হয়ে জিদাইগেকির দিকে সকলের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হয়। 'ওনিহেই হানকোচো' '৬৯ সালে শুরু হয়, তারপর '৭৫, '৮০ সালে এবং '৮৯ সালে বারংবার পুনর্নিমিত হয়ে '৯৪ সাল পর্যন্ত প্রচারিত হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রচন্ড জনপ্রিয়তাই এর একাধিকবার নির্মাণের কারণ। অবশ্য প্রতিটি খন্ডই বিভিন্ন চ্যানেলে এবং বিভিন্ন তারকা দ্বারা অভিনীত হয়েছে। বস্তুত জিদাইগেকি যে মুছে যাওয়ার বিষয় নয়, তা এ ড্রামার অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। 'ওনিহেই হানকোচো' ছিল মূলত জনপ্রিয় ঐতিহাসিক-কাহিনীকার ইকেনামি শোওতারোর লেখা উপন্যাসের নাট্যরূপ।

এ ড্রামাটি ছাড়াও তারকা কিতা ওওগি ফুমিইয়া অভিনীত 'জেনি-গাতা হেইজি' নামের Fuji TV কর্তৃক প্রচারিত ড্রামাটি রহস্যময় আবহের কারণে পুরনো চলচ্চিত্রের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও আধুনিক যুগের আলোকে নির্মিত। প্রাক্তন অভিনেতা ওকাওয়া হাশিজোর চেয়ে নতুন তারকা ফুমিইয়ার সাবলীল, গতিময় অভিনয় পুরনো চলচ্চিত্রের খোলস থেকে বেরিয়ে আসা ঝকঝকে এক জিদাইগেকি!

বর্তমান জিদাইগেকির তারকাবৃন্দ

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুমুল হাওয়ার স্রোতে হারিয়ে গিয়েও যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি ঐতিহ্যবাহী নাট্যশিল্প জিদাইগেকি বা সামুরাই ড্রামা, তার প্রধান কারণ জাপানিদের গভীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনার সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলেই মনে হয়। যদিও জিদাইগেকি চলচ্চিত্রের ধারাটি মিলিয়ে গেছে বহু আগে তারপরও এখনো বিভিন্ন চ্যানেলে যে বারো ঘন্টাব্যাপী বিশেষ পরিকল্পনায় জিদাইগেকি ড্রামা তৈরি করা হয়, সেটাও চলচ্চিত্রের বিশাল বাজেটের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে টিভি ছাড়াও নিয়মিত রাজধানীসহ সারা দেশব্যাপী নিয়মিত মঞ্চায়িত হয়ে থাকে জিদাইগেকি থিয়েটার। টোকিয়োর বিভিন্ন 'কাবুকিজা' বা 'কাবুকি-মঞ্চ'তে নিয়মিত জিদাইগেকি থিয়েটার মঞ্চায়িত হচ্ছে। ফলে বলা চলে, জিদাইগেকি বা সামুরাই ড্রামা এক সময়কার স্বর্ণযুগ সৃষ্টিকারী জিদাইগেকি চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকেই ধরে রেখেছে এবং সেইসঙ্গে যে প্রভাব ও সুনাম রেখে গেছে সারা বিশ্বব্যাপী, কি আমেরিকান কি ইতালীয় ও মেক্সিকান ওয়েস্টার্ন মুভি, কিংবা হংকং ও তাইওয়ানের কুংফু শৈলীর ছবিতে--সত্যি তার তুলনা নেই। পাশাপাশি অ্যাক্‌শন ছবির নির্মাণ কৌশলে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছে জিদাইগেকি, তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে বৈকি! অভিনেতাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত মহাতারকা বানদোৎসুমা সাবুরো, ওওশুচি দেন্‌জিরো, ওজুমা চিয়োনোসুকে, তোশিরো মিফুনে, কাৎসু শিন্‌তারো প্রমুখ আজও প্রবীণ-নবীন মানসে সমধিক উজ্জ্বল। পূর্বের তুলনায় জিদাইগেকির স্বর্ণযুগ এখন নেই। কিন্তু টিভি সিরিজগুলো জিদাইগেকিপ্রেমিক অসংখ্য ভক্ত ছাড়াও ফ্যাশনেবল্‌, ট্রেন্ডি ড্রামার দর্শকের কাছেও যথেষ্ট প্রিয়। পুরনো যুগের তুলনায় বর্তমানে প্রচারিত নাটকগুলোতে আধুনিকতার স্পর্শ থাকায় দৃশ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিবেশ, লোকেশন, খাবার-দাবার সবই বিচিত্র রং আর দৃশ্যমানতার গুণে সমৃদ্ধ, যা প্রাচীন নাটকে বা চলচ্চিত্রে ছিল না। অবশ্য অনেক নাটকই পুরনো চলচ্চিত্রের নয়া নাট্যরূপ বলে তুলনামূলকভাবে নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে আলাদা ফ্যাশন বয়ে এনেছে নিঃসন্দেহে। এবং পূর্বেই বলেছি, চলচ্চিত্র হিসেবে জিদাইগেকির যে শক্তিময়তা, রোমাঞ্চ, গেরুয়া পারিপার্শ্বিকতা ও বীভৎস রস তার অনেকখানি বর্তমান

টিভি জিদাইগেকি ড্রামাতে নেই। বলা ভালো, বর্তমান টিভি জিদাইগেকি ড্রামাকে যেন ট্রেন্ডি সামুরাই ড্রামাতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলছে। অন্ততঃপক্ষে, তারকাদেরকে অনেকটা আইডল্ ক্যারেক্টার হিসেবে যেন প্রতিটি ড্রামাতে উপস্থিত করা হচ্ছে, আর সেটা হচ্ছে যুগের কারণে। কাহিনীর ক্ষেত্রে নতুনত্ব কিছু নেই, অভিনয়-শিল্পীরাও সাবলীল। তারপরও জাপানের হাজার বছরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—শুভ্র বরফে ঢাকা বাড়ি-বাগান, কাঠের দুর্গঘর, উমে ফুলের গোলাপী রং বা সাকুরা ফুলের লালচে আভা এখন পূর্বের চেয়ে প্রযুক্তির গুণে আরও বেশি আলোকিত, রক্তাভ এবং গোলাপী। এধারাটি সমকালীন জিদাইগেকিতে প্রদর্শনের প্রবণতাও লক্ষণীয়। সেই প্রবণতাই তীব্রভাবে প্রতিভাত অন্ততঃপক্ষে বর্তমান ৪/৫ জন সবচেয়ে জনপ্রিয় জিদাইগেকি ড্রামার নির্ধারিত তারকা সাতোমি কোতারো, তাকাহাশি হিদেও, মাৎসুগাতা কোকি, মাৎসুদাইরা কেন্ এবং নাকামুরা কিচিয়েমোন অভিনীত ড্রামাগুলোতে। তাঁদের জনপ্রিয়তার উপরই যেন নির্ভর করছে বর্তমান টিভি জিদাইগেকি ড্রামাগুলোর ধারাবাহিকতা।

তাঁদের মধ্যে সাতোমি কোতারো ও মাৎসুগাতা কোকি দুজনেই মুভি প্রোডাকশন কোম্পানি তোয়েই এইগাশা (তোয়েই চলচ্চিত্র) কোম্পানির আবিষ্কার। সাতোমি ১৯৫৭ এবং মাৎসুগাতা ১৯৬০ সালে উক্ত কোম্পানির নির্মিত চলচ্চিত্রে প্রথম আভির্ভূত হন। তাঁরা দুজনই জিদাইগেকির স্বর্ণযুগের শেষ তারকাও বটেন। তাদের অগ্রজ য়োরোজুইয়া কিন্নোসুকে, আজুমা চিয়োনোসুকে, ওকাওয়া হাশিজো প্রমুখ ছিলেন উক্ত কোম্পানিরও নামীদামী তারকা। পরবর্তীকালে নতুন কিছু করার ইচ্ছেতে সাতোমি ও মাৎসুগাতা দুজনেই তোয়েই এইগাশার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

প্রথমে সাতোমি TBS এর 'মিতোকোমোন' টিভি সামুরাই ড্রামাতে 'সুকেসান' চরিত্রে অভিনয় করে টিভি তারকায় পরিণত হন। জিদাই-গেকির খ্যাতিমান চরিত্র ওওইশিউচি কুরানোসুকে, সাইগো তাকামোরি প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। মাৎসুগাতা '৭৪ সালে NHK এর তাইগা ড্রামা 'কাৎসুকাইশু'তে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে

টিভিতে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ফুজি টিভি-র 'তোয়ামানো কিন্‌সান' জনপ্রিয় টিভি ড্রামাতে অভিনয় করে অতি দ্রুত নিজেও জনপ্রিয় তারকায় রূপান্তরিত হন। বলা যায়, এই দুজন অভিনেতা তোয়েই এইগাশাতে তারকা হতে না পারার সুযোগটি টিভিতে খুঁজে পান। অবশ্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, অভিনয়ের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং জিদাইগেকি ড্রামার উত্তরাধিকার বজায় রেখে ঐতিহ্যকে হৃদয়ে লালনের সদিচ্ছার মধ্যেই জিদাইগেকির জনপ্রিয়তার মূল রহস্য নিহিত আছে বলে বিশ্বাস করি। তারকা তাকাহাশি হিদেকির বেলায় বলা যায়, টিভি এমন এক স্টারের জন্ম দিয়েছে তার নাম তাকাহাশি হিদেকি, অনবদ্য অভিনয় ক্ষমতা তাঁর। প্রথম জীবনে '৬১ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত নিৎকাসু এইগা শার (নিক্কাৎসু চলচ্চিত্র কোম্পানি) নির্মিত চলচ্চিত্রের নায়ক ছিলেন তিনি। জিদাই-গেকিতে স্বেচ্ছায় আগমন করেন ১৯৬৮ সালে। তার অভিনীত 'ওতোকোনো মোনশো' অত্যন্ত জনপ্রিয় ড্রামা। '৭৫ সালে Fuji TV-র 'রোকুওয়ানো কামোমে' এবং '৭৮ সালে Asahi tv-র 'হানকাৎসু' এ দুটি সমকালীন সামাজিক নাটকে অভিনয় করলেও বেশির ভাগ নাটকই জিদাইগেকি। বিশেষ করে '৭৬ থেকে '৮১ সাল পর্যন্ত প্রচারিত NIHON TV-র জিদাইগেকির তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা যদি তাকাহাশি হিদেকিকে বলা হয়, আদৌ মিথ্যে বলা হবে না। ১৮৩ সে. মি.দীর্ঘ, সুদেহী সুদর্শন তাকাহাশি হিদেকির উত্তম অসি চালনা, শত্রুনিধন কায়দা, চমৎকার শারীরিক গতিশীলতা ইত্যাদি শৈল্পিক গুণের কারণে টিভির 'কানজেন চোয়াকু' অর্থাৎ 'শিষ্টের প্রতি সদাচরণ ও অশিষ্টকে দমন' এই নীতিমূলক নাটকের জন্যে যথার্থ অভিনেতা বলে মনে করা কঠিন নয়।

'৭৫ সাল Fuji Tv-র 'জাতোইচি মনোগাতারি'র ভবঘুরে সামুরাই চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেন মাৎসুদাইরা কেন্। তারপর '৭৮ সালে Asahi tv-র 'য়োশিমুনেহেই হানকি' ও 'আকারেনবো শোওগুন' ড্রামাতে সুযোগ্য অভিনেতা হিসেবে কেন্ মহাতারকা হওয়ার গৌরব অর্জনে সমর্থ হন। '৭৯ সালে তাইগা ড্রামা 'কুসা মোয়েরু', '৮২ সালে 'তোগেনো গুনতাই' ড্রামাতে অভিনয় ক্ষদতা প্রদর্শন করেন। টিভি ছাড়াও মঞ্চের

জিদাইগেকি নাটকেরও সার্থক অভিনেতা হিসেবে কেন্ পরিচিত।

তাঁদের ছাড়াও 'হিস্সাৎসু' সিরিজ থেকে গত ২০ বছরে জন্ম নেয়া মুরাকামি হিরোআকি, মিতামুরা কুনহিরো প্রমুখ অভিনেতা, এবং ভবিষ্যতে আরও যাঁরা আসবেন, তাঁরাই জাপানের 'ইউনিক' ঐতিহ্যবাহী নাট্যকলা 'জিদাইগেকি' নির্মাতার দায়িত্বশীল সফল উত্তরাধিকারী হবেন।

....

তথ্যসূত্র:
১. তেনতোমুশি সাময়িকী
২. দৈনিক য়োমিউরিশিম্বুন
৩. দৈনিক আসাহিশিম্বুন
৪. দৈনিক মাইনিচিশিম্বুন
৫. দৈনিক টোকিয়োশিম্বুন
৬. দৈনিক সানকেইশিম্বুন
৭. হেইবোশা বিশ্বকোষ

....

* ১৯৯৮ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত
* আলোকচিত্র: তেনতোমুশি সাময়িকীর সৌজন্যে

সমকালীন বিশ্বের পোশাকি ফ্যাশন-মঞ্চে যে ক'জন ডিজাইনার আন্তর্জাতিকভাবে 'তারকা' খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে জাপানের স্বনামধন্য বেশ কয়েক রয়েছেন। যেমন হানায়ে মোরি, কিজিমা, জুন ইশিদা, য়োজি ইয়ামামোতো, রেই কুবোকাওয়া, জুনইয়া ওয়াতানাবে প্রমুখ উল্লেখ্যযোগ্য। ফ্যাশন জগতে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি থেকে উদ্ভূত সম্পূর্ণ নতুন ধারণার পণ্য সৃষ্টি করাই প্রতিভাবান ডিজাইনারদের কাজ। বিশ্বের সকল প্রবীণ-নবীন ফ্যাশন ডিজাইনারদের মধ্যে যিনি অসাধারণ, ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টিসম্ভারের জন্য চূড়ান্ত খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি ইস্‌সে মিয়াকে---দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানি ডিজাইনারদের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই অদ্বিতীয় একজন প্রতিভাবান ফ্যাশন-শিল্পী। ফ্যাশন ডিজাইনার অনেক রয়েছেন কিন্তু 'ফ্যাশন-আর্টের জনক' তিনি। যিনি ফ্যাশনকে সাধারণ ফ্যাশন হিসেবে দেখেননি। তিনি তাকে "আর্ট" তথা 'শিল্পকর্ম' হিসেবে উ ্থাপন করার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। এক কথায় অপূর্ব, অভিনব এবং বিস্ময়কর তাঁর 'ফ্যাশন-আর্ট' কর্মসমূহ!

১৯৬২ সাল থেকে পরিধেয় পোশাকের ক্ষেত্রে যে গতানুগতিক আঙ্গিক ভেঙ্গে আধুনিক শৈলীর কাজ তিনি শুরু করেছিলেন তাতে গত দীর্ঘ ৪০ বৎসরে বিভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। মিয়াকে আধুনিক 'ফ্যাশন-আর্টে'র পথিকৃৎ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁর বাস্তব-জ্ঞান, দর্শন আর মেধার সমন্বয় ঘটিয়ে। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অশেষ পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতা। সেই মেধাবী কর্মযজ্ঞের ধারাবাহিক উদাহরণ স্থাপন করেছেন 'ইস্‌সে মিয়াকে মেকিং থিঙ্গস্‌' শীর্ষক সম্পূর্ণ নতুন কিছু পোশাকি 'ফ্যাশন-আর্টে'র এক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে (১৯৯৮-৯৯)। সৃষ্টি করেছেন ফ্যাশন জগতে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

হিরোশিমা-জেলায় ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণকারী ইস্‌সে মিয়াকে সর্ব-প্রথম ফ্যাশনজগতে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৬২ সালে তোরেই কর্পোরেশন এর ক্যালেন্ডারের ডিজাইন কাজের মধ্য দিয়ে। তখন তিনি ওকুতামা চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইনের ছাত্র। ভবিষ্যতে কি করবেন তখনো স্থির করে ওঠেননি। কিন্তু পোশাকি ফ্যাশনের প্রতি তাঁর ছিল যথেষ্ট আগ্রহ। তখনকার জনপ্রিয় লেখিকা এবং ডিজাইনার মাসাকো

শিরাসুর প্রতিষ্ঠান 'কৌগেই' পরিদর্শন করতে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেসময় শিল্পজগতে প্রভাবশালী এক বন্ধুর আহ্বানে তোরেই কর্পোরেশন এর ১৯৭৩ সালের বার্ষিক ক্যালেন্ডারের জন্য প্রথম কাপড়ের ফ্যাশন তৈরি করে ফ্যাশন-অভিজ্ঞ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এই সালেই 'নুনো তো ইশি নো শি' অর্থাৎ 'সুতো ও পাথরের কবিতা' নামে প্রথম ফ্যাশন-শো'র আয়োজন করেন। তাতে আবহ সঙ্গীতসহ আনুষঙ্গিক কাজে বন্ধুরা সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন।

১৯৬৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করার পরের বছর ফ্যাশনের সূতিকাগার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পাড়ি দেন। ১৯৬৬-৬৮ সাল পর্যন্ত সেখানকার বিখ্যাত গি. লারোস-গিভেন্সী (Guy Laroche and Givenchy) ফ্যাশন প্রতিষ্ঠানে সহকারী ডিজাইনার হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকলেন না। কেন যেন তাঁর বারবার মনে হতে লাগল তিনি তো সাধারণ মানুষের জন্য সুন্দর পোশাক তৈরি করতে চান। পরের বছর ১৯৬৯ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে প্রবাসী হন এবং ডিজাইনার জেফরি বীন (Geoffrey Beene) এর অফিসে যোগ দেন। কিন্তু মাত্র মাস পাঁচেক কাজ করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন--ফিরে আসেন জাপানে। ফিরে আসার পর তোরেই কর্পোরেশন এর অনুরোধে পোশাক তৈরি করতে সচেষ্ট হন। আরও তিনজন ডিজাইনারসহ মোট চারজন ডিজাইনারের যৌথ একটি ফ্যাশন-শো'র আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি। ইস্‌সে মিয়াকে তাঁদের একজন। নিয়ইয়র্কে ফিরে যাবার জন্য তাঁর টাকার দরকার ছিল বিধায় প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি তাঁর ফ্যাশন-পর্বের নাম দেন 'কন্সট্রাকটিবল ক্লথস' (Constructible Clothes)। এটা ছিল জাপানে তখনকার সময় যুগপৎ ব্যতিক্রমী এবং সাহসী একটি পদক্ষেপ। কেননা মঞ্চে মডেলাররা এক এক করে এগারোটি পোশাক পরে ও খুলে খুলে হেঁটে বেড়িয়েছেন! তাঁদের নগ্ন-বক্ষ দেখে আমন্ত্রিত অতিথিরা হয়েছেন শিহরিত, অভিভূত! তিরিশ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে কোন প্রকার আবহ সঙ্গীত ছিল না। ছিল নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতা। বলাবাহুল্য, দারুণভাবে দর্শক-নন্দিত হয়েছেন তিনি।

এই প্রদর্শনীর পর মিয়াকে ভাবলেন, তিনি তো জাপানি ও এশীয়।

বিলেতবাসীদের মতো পরিপূর্ণ নিখুঁত পোশাক না তৈরি করলেও তো চলে। এত বাধ্যবাধ্যকতার কি প্রয়োজন? ভাবলেন ফিতার মতো চিকন এক টুকরো কাপড়ে শরীর মুড়িয়ে নিলেই তো তা পোশাক হয়ে যায়! বস্তুত পরবর্তীকালে এমন সব ফ্যাশন-আর্টবিশিষ্ট পোশাক তিনি উপস্থাপন করেন যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায়নি আজও বিশ্ব জুড়ে। অভিনব ফ্যাশনের অগ্রদূত হয়ে উঠলেন তিনি দ্রুত। ফ্যাশন মানেই যে হালকা পোশাক হতে হবে এমন ধারণা তিনি পরিহার করলেন। করতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য ফ্যাশন জাতীয় পোশাক--কিন্তু তিনি যা তৈরি করতে লাগলেন একটার একটা সবই অসাধারণ হয়ে উঠল।

নতুন নতুন কাজের নেশায় তাড়িত মিয়াকে ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজস্ব প্রতিষ্ঠান--'মিয়াকে ডিজাইন স্টুডিও'। বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল দিয়ে পরীক্ষামূলক পোশাক তৈরি করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর তৈরি সুবিশাল ভারী পোশাক পরে মডেলাররা মঞ্চে ফ্যাশন-শো'তে অংশগ্রহণ করে দর্শকদেরকে মাতিয়ে দিলেন। কাপড় নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন--কোন্ কাপড়ে কী ধরনের আকর্ষণীয় ফ্যাশন সৃষ্টি করা সম্ভব। সেখান থেকে জন্ম নিয়েছে 'হোচো-কাট্' ডিজাইন বা 'ছুরিকাটা' পোশাক। অর্থাৎ ছুরি দিয়ে কাপড় কেটে তারপর ডিজাইন অনুযায়ী পোশাক তৈরি করা! যা সাধারণ আঙ্গিকের হলেও নীল রঙের কারণে সেটা হয়ে উঠল অসাধারণ। অনেক সময় দেখা গেছে পোশাকের শিরোনাম নিয়ে বিভ্রাটে পড়েছেন তখন যে যা বলেছে সেই নামই স্থির করেছেন। যেমন একবার সকলে মিলে যখন নাম স্থির করতে পারছিলেন না তখন কে যেন বিরক্ত হয়ে বলল 'শিরান্' অর্থাৎ 'জানি না'--তৎক্ষণাৎ ওই নামই রাখা হল।

১৯৭৭ সালের ঘটনা। পূর্ববর্তী চিন্তা থেকে জন্ম দিয়েছেন নতুন এক ধারণা যা বিরল এক ফ্যাশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'ইচি মাই নো নুনো' অর্থাৎ 'এক শীট কাপড়' এর সম্পূর্ণ পোশাক! অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে এই অসম্ভব কাজটি তিনি করেছেন। মূলত ভারতীয় শাড়ি থেকে এর উৎপত্তি তাতে দ্বিমত নেই। 'মুসাসাবি' নামক এই পোশাক ফ্যাশন জগতে তাঁর দর্শনে নতুন মাত্রা দিয়েছে ফলে তাঁর সর্বশেষ প্রদর্শনীতেও

সেই ধারণার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁর ভাষায়, "পাশ্চাত্যে পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে একটি রীতি বা ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে সেখানকার ডিজাইনারা কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ বিলেতীরা প্রথমে পোশাকের আঙ্গিক তৈরি করে সেখানে যেমন শরীরকে ঢুকিয়ে দেন, আমার বেলায় শরীরের আঙ্গিক দিয়ে পোশাকের ফর্ম তৈরি করে নিই।" এই ঘটনার পর পরই ঐ সালেই তিনি মর্যাদাসম্পন্ন 'দৈনিক মাইনিচিশিম্বুন' পত্রিকা থেকে 'মাইনিচি ডিজাইন পুরস্কারে'র জন্য মনোনীত হন। পুরস্কার-প্রাপ্তির ঘটনাটিকে অক্ষয় করে রাখার জন্য বন্ধুদের অনুরোধে আধুনিক ফ্যাশন এবং এ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা-চিন্তা-ভাবনা বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে প্রোথিতযশা প্রকাশনা সংস্থা হেইবোনশা পাবলিশার কোম্পানি থেকে 'ইস্ট মিটস্ ওয়েস্ট' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি একাধিকবার পুনর্প্রকাশিত হয়ে ফ্যাশন সচেতন ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আর্কষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১৯৭৮ সাল। ফ্যাশনের স্বপ্ননগরী প্যারিসে অবিস্মরণীয় একটি কাজ তিনি প্রদর্শন করেন প্যারিস পোশাক শিল্পকলা জাদুঘরে। 'আবহ' নামধারী এই প্রদর্শনীতে 'জাপানি আবহ ও সময়' কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তার পরীক্ষামূলক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। মেঘরঙা আবহ সৃষ্টি করে দেয়ালের দিকে মুখ-ফেরানো একটি দীর্ঘ সরু মঞ্চে দশটি মুন্ডিত ধ্যানমগ্ন জেন্-পুরোহিতের মূর্তি স্থাপন করে তাদের গায়ে তাঁরই তৈরি জমকালো 'হাকামা' পরিধান পরিয়ে দেন। এই প্রদর্শনীর নাম রাখেন 'অভিষেক'। প্রদর্শনীতে সময় এবং পরিবেশ সেই জমকালো মেঘলা আবহে থমকে গিয়েছিল! বাকরুদ্ধ হয়েছেন পশ্চিমা দর্শকবৃন্দ! কেননা তাঁরা এমন নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না কখনো! এই ফ্যাশন-আর্ট কর্মে প্রাচ্যের চিরকালীন আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতার দিকটি তুলে ধরার পেছনে যে মেধা কাজ করেছে তা এক কথায় অনবদ্য। কেননা ধ্যানমগ্ন আবহে পোশাকের রং যে নিস্তব্ধতার ভাষা হতে পারে এটা কল্পনা করা একমাত্র ইস্সে মিয়াকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, জেন্ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা বহিরাঙ্গের পোশাকি সৌন্দর্য

তথা ফ্যাশন-চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে। ইস্‌সে মিয়াকে তাঁর উদ্ভাবিত 'ফ্যাশন-আর্টে'র জরায়ুতে প্রাচীন জাপানি কলাসৌন্দর্যকেই পুনরাবিষ্কারের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

একই সময়ে ১৯৭৮ সাল তাঁর জীবনে আরও একটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। বিশ্ববিখ্যাত ব্যালে নৃত্যশিল্পী মোরিস ব্যাজার জাপান সফরে এলে ইস্‌সে মিয়াকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'ইস্ট মিটস্ ওয়েস্ট' গ্রন্থটি শিল্পীকে উপহার প্রদান করেন। প্যারিসে থাকাকালীন ব্যাজার এর ব্যালেড্যান্স দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। অসাধারণ প্রতিভাধর এই নৃত্যশিল্পী মিয়াকেকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন তাঁর অভূতপূর্ব, শক্তিময় নৃত্যভঙ্গিমা দিয়ে। "মুক্ত মঞ্চে মানুষ কীভাবে এমন নিপুণভাবে নাচতে পারে!"--বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন মিয়াকে। নাচনভঙ্গি তথা মুদ্রার ছান্দিক গতিকে প্রাণবন্ত করেছে পরিহিত পোশাকের দোলা, কম্পমানতা যা উজ্জ্বল তারকারাশির মতো তাঁর দৃষ্টিতে বিঁধেছিল! মনে মনে আশা করেছিলেন যদি ব্যাজারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেতেন!

কী আশ্চর্য ঘটনা! ১৯৮০ সালের দিকে দৈবিক কিনা ব্যাজারের কাছ থেকে সুত্যি সত্যি একটি আমন্ত্রণপত্র পেলেন ডাকযোগে! তাঁর প্রত্যাশা ছিল অস্পর্শনীয় চাঁদ কিন্তু সেটা তাঁর হাতের তালুতে যেন নেমে এলো! উত্তরণের আরেকটি অমূল্য সিঁড়িমঞ্চ তাঁর সামনে খুলে গেল। বিলম্ব না করে বেলজিয়ামে ব্যাজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মিয়াকে। 'কাস্তা দিবা' নামে একটি ব্যালে-নাটক ভুবনমোহিনী অপেরা শিল্পী মারিয়া কেলাস এর সম্মনার্থে রচনা করেছেন ব্যাজার। কিন্তু নাটকটি মঞ্চে তোলার আগেই শিল্পী মৃত্যুমুখে পতিত হন। তথাপি নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্য অটল তিনি। ইস্‌সে মিয়াকের উপর নাটকের পরিচ্ছদ তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করতে আগ্রহী। বিনম্র মস্তকে মিয়াকে এই দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করে নেন। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন কিন্তু এটা যে অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ তাতে কোন সন্দেহ রইল না তাঁর মনে। কেননা অপেরা নিয়ে কখনো কাজ করেননি। পরিচ্ছদের নতুন কোন ধারণা তাঁর মাথায় আসছিল না। সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। অবশেষে শুধু ব্যাজারের একটি ইমেজকে সামনে রেখে নাটকের জন্য এক সেট ঝল্‌মলে, দীঘল মাপের

পরিচ্ছদ তৈরি করে ব্যাজারকে দেখান। সেই পরিচ্ছদ দেখে ব্যাজার বিস্মিত হয়ে পড়েন! স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন মিয়াকে। আরও খ্যাত-অখ্যাত ডিজাইনার, শিল্পী এবং নাট্যকুলাকুশলীরা ভূয়সী প্রশংসা করলেন তাঁর এই কাজের। অভিনন্দিত করেন সেই কালজয়ী মহাকাব্য 'মহাভারত' নির্মাতা খ্যাতিমান বৃটিশ নাট্যকার পিটার ব্রুক। অবশেষে নাটকটিতে অন্যের বদলে ব্যাজার নিজেই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন শুধুমাত্র ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করার আগ্রহে। বলাবাহুল্য, য়োরোপ জুড়ে এই পরিচ্ছদের পরিচিতি ও ডিজাইনার মিয়াকের সুনাম আলোর গতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনার পর কি নিয়ে কাজ করা যায় যখন ভাবছিলেন তখন মাথায় উদয় হয় পরবর্তী ধারণা: 'বডি ওয়ার্কস্ অ্যান্ড প্ল্যানটেশন' অর্থাৎ এমন পোশাক তৈরি করতে চান যা দৈনন্দিন কর্মজীবনে ব্যবহার করা যাবে অথচ ফ্যাশন নয় কিন্তু ব্রান্ডের পোশাক হবে। বিষয়টি কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই ধরনের পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে রঙ বেছে নিলেন খয়েরী। এই রঙের উপর নানা রকম গবেষণা করে উক্ত রঙের অভিনব কিছু পোশাক তৈরি করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কাঁচামাল্ সংগ্রহে জাপান, লন্ডন এমনকি ভারতেও অভিযান চালান। অবশেষে সেই পোশাক তৈরি করে সানফ্রান্সিসকো শহরের একটি ফ্যাশনপ্রিয় তরুণদল 'মাক্সিম'কে জাপানে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এবং বলাবাহুল্য, তাঁর ধারণা সুসম্পাদনার গুণে দারুণ সাফল্য অর্জন করে এই প্রর্দশনী। সেই বিচিত্র বডি ওয়ার্কস্ ফ্যাশন চিন্তাভাবনা (কনসেপ্ট) থেকে কাপড় ছাড়া অন্য কোনও ধাতব পদার্থ, প্লাস্টিক বা প্রাকৃতিক বস্তু যেমন কাঠ, বেত দিয়ে বডি ওয়ার্ক্ তৈরি করা যায় কিনা ভাবতে লাগলেন। সেই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটে ১৯৮৮ সালে অদ্ভুত ভয়ংকর রসবিশিষ্ট কংক্রীট বডি-মডেল তৈরির মধ্য দিয়ে। এই প্রদর্শনীর নাম দেন 'A-UN Show'. তাতে প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু তাঁর মনে একটা অতৃপ্তি ক্রমশ ঘুরপাক খেতে থাকে। এপর্যন্ত যা করে এসেছেন এগুলিই কি তিনি করতে চেয়েছিলেন? একটা হতাশা এসে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এপর্যন্ত যা করেছেন সেগুলোর প্রতি কেমন অনাগ্রহ জমে উঠল। ভাবলেন এক

সপ্তাহের জন্য ভ্রমণে বের হবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। ছোট্ট একটি হাতব্যাগে আন্ডারওয়্যার, মোজা, একটি গ্রন্থ ও দাঁত মাজার ব্রাশ ভরে নিয়ে এন্থেসগামী বিমানে চড়ে বসলেন। কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার পূর্বক্ষণে তাঁর মানসদর্পনে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে গেল ঘন কুচিযুক্ত বা পাট-পাট ভাঁজকৃত 'প্লীট' (Pleat) জাতীয় একটি কাপড়ের ছবি। ফিরে এসে এক টুকরো স্কার্ফ বা বড় রুমাল দিয়ে শুরু করেন প্রথম পরীক্ষামূলক কাজ। রুমালটিকে আটভাগে ভাঁজ করে তিনটি কোণ্‌কে সেলাই দিতেই একটি ব্লাউজে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এটা দেখেই হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দে উল্লসিত হলেন! এটাই তিনি করতে চেয়েছিলেন। এতদিন মনের নিভৃতে সুপ্ত ছিল এই ধারণাটি। তারপর কাগজে বিভিন্নভাবে ঘন ঘন ভাঁজ দিয়ে নানা রকম নমুনা তৈরি করে দেখেন যে কাপড়েও তা করা সম্ভব। তবে খুব সযত্নে আগুনের তাপ ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত জাপানিরা যা ভাবেন তাই করেন--তাঁদের ইচ্ছেশক্তি অত্যন্ত প্রবল। বলাবাহুল্য মিয়াকে সময়সাপেক্ষ সেই দুরূহ কাজটি সাধন করলেন; 'প্লীটে'র নবদিগন্ত সূচীত হল তাঁর হাত দিয়ে নিপুণ কুশলতায়। তিনি তাপ (হিট) এর সাহায্যে এমনভাবে মিহিসুতোয় বোনা কাপড়ের পাট-ভাঁজের কাজ করেছেন যা ধোয়া, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনবোধে পুনরায় পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব। সাধারণত প্লীটযুক্ত কাপড় পুনর্বার সমান্তরাল করা যায় না কিন্তু মিয়াকে এটাকে সম্ভব করেছেন এক ধরনের ক্যামিকেল ব্যবহারের মাধ্যমে।

অবশ্য মূল কাজটি উপস্থাপনের পূর্বে কাগজ দিয়ে তৈরি করেছিলেন অনেকগুলো প্লীটের নমুনা, এগুলো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন. প্যারিসে বিশ্ববিখ্যাত জাপানি ভাস্কর ইসামু নোগুচিকে। নোগুচি তখন জাপানি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প 'ওয়াশি' কাগজ দিয়ে নির্মিত 'আকারি' (আলোক) সিরিজের 'গৃহবাতি' (Lamp) প্রদর্শনীর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি ছেলেবেলা থেকেই ইসসে মিয়াকের মননে ঈশ্বরসম ব্যক্তিত্ব। তাঁর আর্শীবাদ লাভ করেই যখন একদিন ফ্যাশন জগতে প্লীটের আগমন ঘটে তখন অভূতপূর্ব এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। চারদিক থেকে প্রচুর প্রশংসা, সুনাম পেতে থাকেন মিয়াকে। ফ্রান্সের এক বন্ধু বললেন, "তোমার তৈরি

প্লীটের পোশাকে সুন্দরী মডেলাররা যেন নৃত্য করছে!" মন্তব্যটি মিয়াকের মনে বেশ ধরে গেল। যেই ভাবা সেই কাজ। কেউ যদি প্লীটের পোশাক পরে মঞ্চে নাচ্ দেখাতে পারত! কিন্তু কার নৃত্যভঙ্গিমার সঙ্গে প্লীটের খাপ খাবে? ভাবতে ভাবতে য়োরোপীয় ব্যালে শিল্পী উইলিয়াম ফোর্সাইসকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে নিলেন সদ্য তৈরি 'দি লস্ অব স্মল্ ডিটেইল' নামক কাপড়ের প্লীটযুক্ত একটি সেট। ফোর্সাইসকে দিয়ে পোশাকটির পরীক্ষা করলেন মঞ্চে। উপরোক্ত বন্ধুর মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হল নৃত্যশিল্পীর নাচে। মহাখুশী হলেন মিয়াকে। প্লীট্‌কে আরও নিখুঁত করার জন্য এই ঘটনার পর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর থেকে জাপানে আগত একটি ব্যালেড্যান্স দলের সদস্যদের প্লীট্‌স পরিয়ে তিনি আশাতীত ফল লাভ করলেন। প্লীটের পোশাক নিয়ে উক্ত শিল্পীদের মধ্যে দারুণ কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে প্লীট্‌সকে ব্রান্ডের পণ্য হিসেবে ফ্যাশন জগতে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৩ সালে 'প্লীট প্লীজ' ফ্যাশনজগতে আত্মপ্রকাশ করে। এই ধারাবাহিকতা ধরে পর পর 'টুইস্ট', 'ক্র্যাশ', 'রিজম প্লীট্‌স' প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্লীট্ ডিজাইনের পোশাক পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছে। ফ্যাশন সচেতন এবং পোশাকের প্রতি আগ্রহশীল মানুষের প্রশংসা এখনো তিনি শোনেন। ইস্‌সে মিয়াকের ভাষায়, "যদি ফোর্সাইসের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হত তাহলে প্লীট্‌স অত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারত কিনা সন্দেহ ছিল। তথাপি প্লীটের পোশাক সারা বিশ্বের মানুষের গায়ে চড়াতে কিছুটা সময় লেগেছে।" অবশ্য ১৯৯০ সালের দিকে নেদারল্যান্ডের রাজধানী অ্যামস্টার্ডামে আয়োজিত 'এনার্জিস' প্রদর্শনীতে 'রিজম প্লীট্‌স' এর চমক এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যা প্লীট্‌সের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে কম অবদান রাখেনি।

১৯৯৮ সালে প্যারিসে শুরু 'ইস্‌সে মিযাকে মেকিং থিঙ্গস্' শীর্ষক পোশাক প্রদর্শনী তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য মহাকান্ড শুধু নয় বিশ্বের বুকে আধুনিক ফ্যাশন-আর্টের মঞ্চে অবিস্মরণীয় এক ঘটনা। দীর্ঘভ্রমণ অতিক্রম করে ২০০০ সালে টোকিয়ো মঞ্চে এসে সমাপ্ত এই প্রর্দশনীতে তাঁর ধারণাটি ছিল এই: 'এক শীট কাপড়' অথবা 'A-POC (A Piece of

Cloth)'। এই প্রদর্শনী প্যারিস, নিউইয়র্ক এবং টোকিয়োর ফ্যাশনমঞ্চে বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের চিন্তাপ্রসূত ধারণা ও তার সুরূপায়ন কতদূর অপরিমেয়তায় চলে যেতে পারে মিয়াকের এই অসাধারণ উদ্ভাবন তাই প্রমাণ করেছে! আমেরিকার প্রভাবশালী দৈনিক 'নিউইয়র্ক টাইমস্'সহ বিশ্বের বড় বড় কাগজগুলো গুরুত্বের সঙ্গে এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করতে বিলম্ব করেনি। এই 'A -POC' নিয়ে রয়েছে তাঁর নানারকম স্বপ্ন। এক সাক্ষাৎকারে জানান, "এই ধারণায় মাত্র কয়েকটি পদ আত্মপ্রকাশ করেছে আরও কয়েকশ ডিজাইন বাকী রয়ে গেছে।" পরবর্তীকালে কম্পিউটার গ্রাফিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে A-POC থেকে A-POS=A Piece of String, A-POM=A Piece of Machine, A-POE=A Piece of Education প্রভৃতির উত্তরণ ঘটানোর চিন্তায় রয়েছেন। বলেন, "এক সময় যখন আমার আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না, নতুন নতুন ডিজাইনাররা আসবেন তাঁদেরকে এখন থেকেই সে রকমভাবে তৈরি করতে চাই।"

অবিস্মরণীয় সুপার ফ্যাশন শিল্পকর্ম সৃষ্টির জন্য তাঁকে ২০০০ সালে জাপানের ২৩তম জাতীয় শিল্পকলা পুরস্কার তাঁর কর্মসাধনার মূল্যায়ন স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। ২০০১-৬ সাল ইস্‌সে মিয়াকের ফ্যাশন কলেকশন অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অগ্রসরমান। সুশিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর ঘরানার নতুন ডিজাইনার তাকিজাওয়া নাওকি ইতিমধ্যে মিয়াকে ডিজাইন কাজের জন্য ফ্যাশন বোদ্ধাদের নজর কেড়ে নিয়ে ক্রমশ উত্তরণের পথে এগিয়ে চলেছেন।

বর্তমানে ৬৮ বৎসর বয়স্ক ডিজাইনার ইস্‌সে মিয়াকে পোশাকের পাশাপাশি অন্যান্য ডিজাইন নিয়েও কাজ করছেন। তাঁর উদ্ভাবিত মেয়েদের জন্য পারফিউম, হাতঘড়ির জন্য ডিজাইন তাঁর প্রতিভার অন্যদিককেই নির্দেশ করছে। তার প্রমাণ বিশ্বব্যাপী বড় বড় শহরের ফ্যাশন-ললনাদের কাছে মিয়াকে ব্রান্ডগুলোর স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা।

পরিশেষে বলব, বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন-শিল্পী ইস্‌সে মিয়াকের অদ্বিতীয়, বিস্ময়কর যে সৌন্দর্যসৃষ্টি আমরা গত এবং এই শতকেও উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছি তার ধারা যাতে অব্যাহত থাকে এই এশিয়ার জলবায়ু-ঋদ্ধ

জীবনধারা থেকে এই কামনা আমাদের সকলের। তাঁর উদ্ভাবনা, সৃজনশীল চিন্তা-- সর্বোপরি আধুনিক কলা-দর্শন একুশ শতকে আমাদের তরুণ ডিজাইনারদের লক্ষ্যধ্যান হয়ে উঠুক এটাই প্রত্যাশা।

....

তথ্যসূত্রঃ

১. 'ইস্ট মিট্‌স ওয়েস্ট'/ ইস্‌সে মিয়াকে

২. 'আসাহিগ্রাফ' সাময়িকী

৩. দৈনিক মাইনিচিশিম্বুন

....

* ২০০০ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত

* আলোকচিত্রঃ আসাহিগ্রাফ; ইন্টারনেটের সৌজন্যে

এশিয়ায়
আরও
হিরোশিমা
আরও
নাগাসাকি
এশিয়ায় যেভাবে যুদ্ধের দামামা বাজছে, বিশেষ করে
পাক-ভারত সীমান্তে এটাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা
করে হিরোশিমার হৃদয়বিদারক হত্যাযজ্ঞের দৃশ্যাদি
প্রদর্শন করত: স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে
যুদ্ধবিরোধী জনমত গঠন করা উচিত। তবেই না
হিরোশিমা দিবসের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে।
হিরোশিমা দিবস হোক আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস

এশিয়া মহাদেশে আরও হিরোশিমা আরও নাগাসাকি কি আসন্ন? কিংবা একাধিক হিরোশিমা একাধিক নাগাসাকি? এশিয়ার কোন কোন দেশ বা অঞ্চল কি অনাহুত হিরোশিমা.নাগাসাকি সৃষ্টির দিকে ধাবিত হচ্ছে? যদি বলি 'কাশ্মীর' হতে পারে সেই আণবিক বোমায় ছিন্নভিন্ন হিরোশিমা চমকে ওঠার কিছু নেই। আণবিক বোমা বা পারমাণবিক বিস্ফোরণ কখনোই হঠাৎ করে ঘটে না বা ঘটানো হয় না। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অমানবিক কাজটি করা হয়। যেমন করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপানের দুটি শহরে পর পর দুটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে সুকৌশলে--বুঝে শুনে। এই বিশ্বের বুকে প্রথম জঘন্য, বিবেকশূন্য সর্বোপরি মানবসভ্যতাকে পদদলিত করে এমন এক মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম দেয় তৎকালীন মিত্রশক্তি প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা নজিরবিহীন!

হিরোশিমা.নাগাসাকি আজকে বিশ্বশান্তির প্রতীক বটে কিন্তু এমন প্রতীক সৃষ্টির মতন পরিস্থিতি তখন ছিল না বলে এক দল ঐতিহাসিক, বুদ্ধিজীবী এবং গবেষক মনে করেন। বিশ্বাস করেন মনে প্রাণে বহু সচেতন ব্যক্তি যে, দীর্ঘযুদ্ধের মধ্যে ক্রমশ ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে আসা জাপানকে এভাবে আঘাত হানা সমীচীন হয়নি আদৌ। কেউ কেউ এই বিশ্বাসে অটল যে এটা ছিল আমেরিকার স্রেফ পরীক্ষাক্ষেত্র, অন্য আর কিছু নয়। আবার অনেকেরই পাকাপোক্ত ধারণা: পরিকল্পনা করেই জাপানকে চিরতরে কব্জা করার জন্য আমেরিকা এই অপকান্ডটি ঘটায়। যার ফলশ্রুতিতে আজ আমেরিকার এক প্রকার উপনিবেশে পরিণত জাপানকে দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে দুই মহাশক্তি রাশিয়া এবং মহাচীনকে। অনেকেই ধারণা করেছিলেন স্নায়ুযুদ্ধ শেষে বুঝি জাপানকে মুক্তি দেবে আমেরিকা তার পকেট থেকে। উঠিয়ে নেবে সারা জাপানব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি। বস্তুত সে লক্ষণ কোথাও নেই। বরং জাপানকে তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী (পার্টনার?) হিসেবে ধরে রাখতেই সচেষ্ট আমেরিকা। একমাত্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক, ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবী ছাড়া জনগণের একটি বড় অংশ যে চাচ্ছেন মার্কিনী ঘাঁটি এখানে থাকুক তা বলাই বাহুল্য। আর এখানেই বেঁধেছে

স্নায়ুযুদ্ধ মার্কিনপন্থী এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে। যদিও তা প্রকাশ্য রূপ নেয়নি এখনো। কিন্তু অন্তরালে এই সংকট ক্রমশ শক্তিশালী ও বিস্তৃত হচ্ছে না এটাই বা কে হলফ করে বলতে পারে?

সাম্প্রতিককালে হিরোশিমা দিবসকে কেন্দ্র করে জাপানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও অবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যা বাস্তবিকই উদ্বেগের বিষয়। আগের মতন কি হিরোশিমা দিবস জোরালো বক্তব্য নিয়ে উদযাপিত হচ্ছে? প্রশ্নটি শুধুমাত্র সচেতন বিদেশীদের নয়, শান্তিপ্রিয় জাপানিদেরও। প্রকৃতপক্ষে, এতবড় একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা জাপানি জনজীবন থেকে যেন ক্রমেই মুছে যাচ্ছে! য়োকোহামা থাকেন এমন একজন মধ্যবয়স্কা চিত্রশিল্পী বলেন, "সাম্প্রতিককালে হিরোশিমা দিবসকে কেন্দ্র করে তেমন অনুষ্ঠানাদি চোখে পড়ে না। অন্ততঃপক্ষে বছর দশেক আগেও বড় বড় সঙ্গীতানুষ্ঠান, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সেমিনারের সংবাদ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত ফলাও করে এখন নেই বললেই চলে। আমেরিকা ও পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির প্রবল স্রোতে ভেসে চলা জাপানি জনসাধারণ যেন ইচ্ছে করেই আর হিরোশিমা.নাগাসাকির ভয়াবহতা, দুঃখময় স্মৃতিকে স্মরণ করতে চাচ্ছেন না। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়।" এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন, "হ্যাঁ, শান্তিবাদী দেশ হিসেবে জাপানের অবশ্যই উচিত হিরোশিমা দিবসকে জাপানের মধ্যেই শুধু নয়, সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা জরুরী বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা, সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে।" তাঁর অভিমতের সঙ্গে একমত হয়ে আমি বললাম, "আমিও তাই মনে করি। এশিয়ায় যেভাবে যুদ্ধের দামামা বাজছে, বিশেষ করে পাক-ভারত সীমান্তে এটাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে হিরোশিমার হৃদয়বিদারক হত্যাযজ্ঞের দৃশ্যাদি প্রদর্শন করত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী জনমত গঠন করা উচিত। তবেই না হিরোশিমা দিবসের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে।" আমার কথায় তিনি একমত পোষণ করেছিলেন।

সত্যি কথা বলতে গেলে, হিরোশিমা এবং নাগাসাকি এখন জাপানি সমাজে ক্ষয়িষ্ণু ইতিহাস ছাড়া কিছু নয়। আপনি বিদেশী হিসেবে যে

কোন মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্র বা ছাত্রীকে এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন--সন্তোষজনক কোন উত্তরই পাবেন না তাদের কাছ থেকে। এড়িয়ে যাবে তারা। কেননা তারা সেসব ইতিহাস জানে না। যুদ্ধোত্তর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গুরুত্বের সঙ্গে হিরোশিমা.নাগাসাকি কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা, ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে না। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে, ছাত্রছাত্রীরা কেবল জানে চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে জাপানি রাজকীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার কারণে হিরোশিমা.নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপিত হয়েছে--শাস্তিস্বরূপ! এটাই তাদেরকে শেখানো হচ্ছে এবং সচেনতনভাবেই। অথচ চীন এবং কোরিয়ায় জাপান কৃর্তক সংঘটিত গণহত্যা বা উপনিবেশীকরণ এখনো বির্তকের বিষয়, যার কোন প্রকার সমাধান এখনো হয়নি। এখনো চলছে অনুসন্ধান ও গবেষণা। জাপানি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তকে একতরফাভাবে মার্কিনী প্রভাবে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যুদ্ধাপরাধী দেশ হিসেবে আজও উল্লেখিত আছে। প্রকৃতপক্ষে, নিরপেক্ষভাবে জাপানের ইতিহাস রচিত হয়নি। জাপানের বিশ্বযুদ্ধে জড়ানোর পেছনেও যে একাধিক কারণ ও পটভূমি রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। কার্যকারণ বলতেও তো একটা কথা আছে। সুদীর্ঘকালের আঞ্চলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমি, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব এবং ষড়যন্ত্র কাজ করেছে এই যুদ্ধের পেছনে। যখনই জাপানি শিক্ষাবিদ এবং ঐতিহাসিকরা প্রকৃত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন তখনই কোরিয়া এবং চীনের চাপ ও প্রতিবাদে ভেস্তে গেছে সেই পরিকল্পনা। অনেকেই বলেন, আরও ১০০ বছর পরে জাপানের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হবে যখন পুরনো প্রজন্ম মুছে গিয়ে নতুন প্রজন্ম জন্মলাভ করবে। মুছে যাবে সকল তিক্ততা ও দুঃসহ স্মৃতি সংস্কৃতি বিনিময়ের জোয়ারে। প্রকৃতপক্ষে এটাও ভুল ধারণা। প্রজন্ম মুছে গেলেই যদি সমস্যার সমাধান হত তাহলে ইতিহাস বিষয়টি থাকার কোন যৌক্তিকতা থাকত না। মানুষ তো ইতিহাস পড়েই অতীতের ঘটনার কথা জেনে থাকে, উপলব্ধি করতে শেখে, ব্যথিত হয়, অনুপ্রাণিত হয়, সর্বোপরি শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ইতিহাসের চেয়ে বড় শিক্ষক তো

এখনো পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি।

যুদ্ধের ৬০ বছর পরে এখন কোরিয়া ও চীনে চলছে জাতীয়তাবাদী শিক্ষাদান। একতরফাভাবেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোমলমতী ছাত্রছাত্রীদেরকে একদা জাপানের উপনিবেশীকরণ এবং আগ্রাসনকে ফলাও করে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে--জাগিয়ে তোলা হচ্ছে জাপান-বিদ্বেষ এবং সহিংস মনোভাব; করছেন সচেতনভাবেই রাজনীতিকরা ক্ষমতায় থাকার জন্য। অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জাপান-বিদ্বেষকে কাজে লাগানো হচ্ছে--যা কারো না বোঝার কথা নয়। আজ জাপানি প্রধানমন্ত্রীর 'ইয়াসুকুনি মন্দির' পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ প্রতিবেশী দুই দেশের রাজপথ মাতিয়ে তুলছে তা এতদিন ছিল না। ১৯৭২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কট্টোর 'ন্যাশনালিস্ট' বলে কথিত কাকুয়েই তানাকার নেতৃত্বে যখন 'জাপান-চীন মৈত্রী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করা হল তার অন্যতম চুক্তি ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গই চীন কখনো তুলবে না। সেই প্রতীজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই জাপান ৩০ বছরকাল চীনের যাবতীয় উন্নয়নে অর্থ ও প্রযুক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এসেছে। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ODA সাহায্য পেয়েছে চীন। শুধু তাই নয়, আজকে চীনা পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে জাপান। সস্তা চীনা পণ্যসামগ্রীতে সয়লাব এই দেশটির অলিগলি। এই কারণে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক কলকারখানা, দেউলিয়া হয়েছে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। ফলে বহু জাপানি আজ বেকার। জাপানে এখন সবচেয়ে বেশি বিদেশী ছাত্রছাত্রী হিসেবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে চীনারা।

আর উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া? তাদের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের মূল ভিত্তিই ঔপনিবেশিক আমলে। তৎকালীন উপনিবেশ কোরিয়ায় জাপানি কর্তৃক স্থাপিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানাই এখনকার ভিত্ ও পুঁজি। যা জাপান ফিরিয়ে আনেনি স্বদেশে। চীনেও তাই, মাঞ্চুরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আধুনিক কলকারখানা, রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমানবন্দর, সাংহাইয়ের নগরায়ন সবই জাপানি পুঁজিতে হয়েছিল। যা চীনের আধুনিক উন্নয়নের মূলভিত্তি। কিছুই ছিল না চীনের সেই অঞ্চলে জাপানের ক্ষমতা সম্প্রসারণ পর্যন্ত। আজ নতুন নতুন তথ্য উদঘাটিত

হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে গ্রন্থাদি--আর সেসব থেকে জানা সম্ভব হচ্ছে উপরোক্ত অজানা তথ্য, যা গত ৬০ বছর ধরে অপ্রকাশিত ছিল। সাম্প্রতিক জাপান-বিদ্বেষ ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে সচেতন জাপানিদের। কে জানে যুদ্ধপূর্ব উগ্র জাতীয়তাবাদ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে এ জাতির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে এই আশংকা একেবারেই অমূলক নয়। এঁদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, লিখছেন এই বলে যে, জাপানিরা যদি যুদ্ধাপরাধী হবে কোরিয়ান আর চীনারা কি একেবারেই ধোয়া তুলসীপাতা?

আসলেও তাই, ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যুদ্ধ ও নরহত্যার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীনেরও কলঙ্ক আছে। এই দুটি দেশ মোটেই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। ১৯৫৯ সালে চীন আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্ববিবেককে উপেক্ষা করে শান্তিপ্রিয় ক্ষুদ্র দেশ 'তিব্বত'কে গ্রাস করেছে সামরিক অভিযান চালিয়ে। তিব্বতীয় ধর্মীয় নেতা দালাই লামা তৎক্ষণাৎ কয়েক হাজার অনুসারী নিয়ে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও তিনি তাঁর মাতৃভূমি ফেরৎ পাননি। সেখানে আজ চলছে তিব্বতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ, নির্বিবাদে নিরপরাধ মানুষ মারা হচ্ছে। এই সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলো সরব। 'তিব্বত আগ্রাসন' সম্পর্কে চীনের কি ভাষ্য? সে সম্পর্কে আমরা অনেক খবরই জানি না। জাপান সঙ্গত কারণেই কিছু বলছে না। বরং জাপান তার নিজস্ব ODA নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে চীনকে নীরবে এই পর্যন্ত প্রভূত সাহায্য প্রদান করে এসেছে। জাপানি ODA এর নীতিমালায় স্পষ্টত এই হুঁশিয়ারীটি উল্লেখিত আছে যে, কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ, সে দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করলে জাপান আগ্রাসী রাষ্ট্রকে কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে বিরত থাকবে। তার পরও চীন আজ পর্যন্ত জাপানি সাহায্যের কোন মূল্যায়ন করেছে বলে আমাদের জানা নেই!

অনুরূপভাবে দক্ষিণ কোরিয়াও আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে একটি বাক্য উচ্চারণ করেনি। কেন করেনি? তারও সঙ্গত কারণ আছে বৈকি! ভিয়েতনাম যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যরাও সে দেশে মার্কিনী সেনাদের সঙ্গে নিরীহ নাগরিক হত্যা করার কলঙ্ক বহন করছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ

রয়েছে। অন্যদিকে অতীতে চীন একাধিক বার কোরিয়া আক্রমণ করেছে সে সম্পর্কে কোরীয় রাজনীতিক বা নাগরিকরা কিছু বলেছেন কি? বলেননি, বলছেনও না, কেন? তার কোন উত্তর নেই।

কথায় বলে আপনি আচরি ধর্ম। কেউ কারো মুখ আয়নায় দেখতে নারাজ। যে কারণে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, এই তিনটি দেশের যুদ্ধবিষয়ক সমস্যা তাঁদের নিজেদের উদ্যোগেই নিষ্পত্তি করতে হবে। বাইরের কোন রাষ্ট্র কিছু করতে পারবে না, সে অধিকারও নেই। কাজেই আমরা বলতে পারি--১৯৩৭-৪৫ সাল পর্যন্ত চীনে জাপানের রাজকীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত যে 'নানজিং হত্যাকান্ডে'র অভিযোগ নিয়ে চীন সরব তার সঙ্গে হিরোশিমা.নাগাসাকির আণবিক বোমা বর্ষণের উদ্দেশ্যমূলক কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিই 'নানজিং হত্যাকান্ড' ঘটিয়েছিল কিনা জাপানি সামরিক জান্তারা সে সম্পর্কে আজও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। চীনা কর্তৃপক্ষ এই হত্যাকান্ডে তিন লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছেন বলে তথ্য প্রকাশ এবং একটি ঢাউস যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ঐ সময় এত সংখ্যক লোক ঐ অঞ্চলে ছিল না। এখন প্রতি বছর নিহতের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে কোন প্রকার গবেষণা ছাড়াই চীন সরকার এই অভিযোগ করেছেন জাপানি গবেষকরা। তাঁদের মধ্যে স্বনামধন্যা সাংবাদিক.টিভি ভাষ্যকার শ্রীমতি য়োশিকো সাকুরাই ইতিমধ্যে এই বিতর্ক নিয়ে একাধিক তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রখ্যাত লেখক.গবেষক.প্রাক্তন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাসাআকি তানাকা যুদ্ধের পর একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান দলের সদস্য হয়ে ঐ অঞ্চলে যান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন 'নানকিন জিকেন নো সোকাৎসু' (নানজিং ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ) নামে। গ্রন্থে তিনি অনেক প্রমাণ এবং দলিলপত্রাদির সমন্বয়ে এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৯৯ সালে যখন চীনা বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক আইরিস চ্যাং তাঁর 'দি রেপ্ অব নানকিং' গ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন জাপান এবং চীনে এই নিয়ে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাপানি গবেষক এবং বুদ্ধিজীবী মহল এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা ও আলোকচিত্র বানোয়াট, মিথ্যে বলে প্রতিবাদ করেন।

গ্রন্থটি জাপানে বিক্রি এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। প্রতিবাদস্বরূপ দুজন স্বনামধন্য জাপানি জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক.গবেষক শুদো হিগাশিনাকানো এবং নোবুকাৎসু ফুজিওকা যৌথভাবে 'দি রেপ অব নানকিং নো কেন্‌কিউ' বা 'দি রেপ্ অব নানকিং এর গবেষণা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ডানপন্থী কট্টোর জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ বলে পরিচিত টোকিয়ো গভর্ণর শিনতারো ইশিহারা উক্ত গ্রন্থে ভূমিকা লিখে দেন। মাসাআকি তানাকার উপরোক্ত গ্রন্থটিরও তড়িৎগতিতে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া জাপানি পত্রপত্রিকায় বিস্তার লেখালেখি, আইরিস চ্যাং এর গ্রন্থটির কঠোর সমালোচনা দীর্ঘদিন ধরে চলে। চীনা বংশোদ্ভূত আমেরিকান এই ইতিহাস-লেখিকা ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে আত্মহত্যা করেন।

২০০০ সালে ওসাকার ইন্টারন্যাশনাল পীস মিউজিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় জাপানি ডানপন্থীদের একটি সেমিনার: 'দি বিগেস্ট লাই অব দি টুয়েনটিয়েথ্ সেঞ্চুরী: ডোকুমেন্টিং দি নানকিং ম্যাসাকার' শিরোনামে। তাতে ৩০০ বিশিষ্ট জাপানি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে একবাক্যে এই হত্যাকান্ডকে অস্বীকার করেন। অবশ্য একাধিক গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জাপানে নানকিং হত্যাকান্ডের অনর্থক অপপ্রচার ও চীনাদের সাজানো ঘটনা, কারসাজি নিয়ে। টোকিয়ো মিলিটারি ট্রাইবুনালের অন্যতম বিচারপতি ভারতীয় প্রতিনিধি ড. রাধাবিনোদ পালও এই হত্যাকান্ডের উপস্থিতযোগ্য কোন প্রমাণ খুঁজে পাননি। কথিত আছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি সামরিক জান্তারা ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে সাধারণ নাগরিক হত্যা করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেসব দেশের কোন জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিক, গবেষক বা রাষ্ট্রপ্রধান এই বিষয়ে কোন কথা জাপান সরকারকে বলেননি। কেন বলছেন না? এইসব দেশগুলোতে জাপান প্রচুর ODA সাহায্য প্রদান করেছে বলে কি? না, তা কিন্তু নয়। সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউ (Lee Kwan Yew) একবার জাপানের প্রাক্তন.প্রধানমন্ত্রী কিইচি মিয়াজাওয়াকে বলেছিলেন, কেন জাপান বারংবার চীনের কাছে ক্ষমা চায়? জাপান বহুবার কারণে-অকারণে অতীতের কৃতকর্মের জন্য

ক্ষমা চেয়েছে দুই দেশের কাছে--কিন্তু কোন শাসকই সেটা কানে নেয়া দূরে থাক, বরং রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত সর্বত্র জাপানের অপপ্রচারই করে আসছে কয়েক দশক ধরে। বস্তুত এই জাপান-বিদ্বেষ দুই দেশেরই অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন শাসকদের ক্ষমতায় থাকার সস্তা কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। এটা জাপানিরা বোঝেন না তা কিন্তু নয়। এই রকম মানসিকতা যদি দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন ক্রমাগত প্রদর্শন করতে থাকে তাহলে শান্তি স্থাপিত হবে কেমন করে? অতীতের তিক্ততাজনিত দ্বন্দ্ব যদি গবেষণা ও আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান না করা যায় সেটা ক্রমশ আঞ্চলিক অশান্তি থেকে মহাদেশীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হবে। বর্তমানে যে শান্তি এশিয়ায় বিরাজ করছে সেটা হুমকির সম্মুখীন হবে।

আজকাল অনেক চীনাপন্থীকে বলতে শুনছি, চীনের নিরপরাধ জনগণের উপর অত্যাচার করা হয়েছে বলেই আমেরিকা হিরোশিমা. নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এই ঘটনার কারণ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। আণবিক বোমা নিক্ষেপের মূল কারণ অন্যত্র। অনেক জাপানি নাগরিক মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, জাপানের অতিরিক্ত জাতীয়তাবাদী, যুদ্ধাংদেহী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব এবং যুদ্ধোন্মদনার ফলাফলই হচ্ছে বোমা-বিধ্বস্ত হিরোশিমা.নাগাসাকি। তাই যদি হবে তাহলে জার্মানীর নাৎসী এডলফ হিটলার, সোভিয়েত রাশিয়ার যোসেফ স্ট্যালীন, ইতালির বেনিতো মুসোলিনী--তারা কি কম যুদ্ধবাজ এবং সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন? তাহলে রোম, মস্কো এবং বার্লিনে কেন শত্রুশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেনি? এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। জাপান কি আণবিক বোমা দ্বারা জব্দ করার মতন অপরাধ করেছিল? এমন উত্তর তো কেউ দিতে পারছেন না। বিচারপতি ড.রাধাবিনোদ পালও আড়াই বছর গবেষণা করে বোমা ফেলার কোন যুক্তি খুঁজে পাননি। সম্প্রতি আমেরিকার মর্যাদাসম্পন্ন 'পুলিৎজার' পুরস্কারপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক হাবার্ট পি.বিক্স তাঁর 'Hirohito and the Making of Modren Japan' নামক বিশাল গবেষণালব্ধ গ্রন্থে হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপকে 'নিষ্ঠুরতা' বলে

সমালোচনা করেছেন। এই হৃদয়চেরা নিষ্ঠুরতার শিকার হিরোশিমার ৩৫০,০০০ জন নিরপরাধ আবালবৃদ্ধবনিতা যাঁরা বোমার আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫০,০০০ হাজার কোরিয়ান শ্রমিকও অন্তর্ভুক্ত। তিন মাসের মধ্যে ৭০ হাজার মানুষ তেজস্ক্রিয়তাজনিত অমানুষিক দাহ, যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। নাগাসাকিতে মৃতের সংখ্যা ৪০,০০০ হাজার। বর্তমানে জাপানে তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগী, পঙ্গু নাগরিক তথা 'হিবাকুশা'র সংখ্যা ২৭৩,০০০ জন। এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাই হতে পারে জাপানসহ সকল পারমাণবিক শক্তিধারী দেশগুলোর জন্য এক উপযুক্ত শিক্ষা--যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা। শুধু নেতানেত্রীই নয়, সাধারণ মানুষের জন্য হতে পারে এক মহান অনুপ্রেরণা--যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। শান্তিবাদী দেশ হিসেবে জাপানি রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসা উচিত নয় কি আরও জোরালোভাবে?

অধুনা আরেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সংবিধান পরিবর্তনের বিতর্ক। মার্কিনী প্রশাসন কর্তৃক লিখিত সংবিধানের মূল কথা হচ্ছে, জাপান যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী দেশ। জাপান কোন প্রকার অস্ত্র তৈরি করবে না, ব্যবহার করবে না এবং বহির্বিশ্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে না। এই অকেজো সংবিধানের যে কোন মূল্য নেই আজ রাজনীতিক, জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী শুধু নন সাধারণ সচেতন নাগরিকরাও বুঝতে পারছেন। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অবশ্যই জাপান তার সার্বভৌমত্বকে বহির্দেশীয় শত্রুর আক্রমণ থেকে সর্বদা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু জাপান কি স্বাধীন রাষ্ট্র? সংবিধান পরিবর্তন করতে কি সক্ষম? এই প্রশ্ন তুলে ধরছেন কট্টোর জাতীয়তাবাদীরা। জাপানিরা এখন পরিষ্কার দুটি ভাগে বিভক্ত--একদল পরিবর্তনের জন্য এক পায়ে দন্ডায়মান অন্যদল হিরোশিমা.নাগাসাকির দোহাই দিয়ে এই উদ্যোগের বিপক্ষে অবস্থানরত। প্রকৃতপক্ষে, এসব নিরর্থক বাকবিতন্ডা। সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে অবশ্যই জাপানের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকা জরুরী, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বহন করাও আবশ্যক। এসব থাকলেই যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে এমন কোন কারণ দেখি না। পাশ্ববর্তী দেশ উত্তর কোরিয়া এবং চীন যেভাবে সামরিক

শক্তি বৃদ্ধি ও প্রদর্শন করে চলেছে জাপানের শঙ্কিত হওয়ার সমূহ কারণ রয়েছে। বিশেষ করে তিন জাতির মধ্যে বিদ্যমান অতীত সংক্রান্ত তিক্ততাই প্রধান কারণ। তাছাড়া মহাযুদ্ধের সময় পাশ্ববর্তী দেশও শত্রু হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শুরু হলে বর্তমানে মিত্রশক্তি আমেরিকা কতখানি এগিয়ে আসবে সে সম্পর্কে জাপানিরা মোটেই নিশ্চিন্ত নন। জাপানের এখন গুরুত্বসহকারে চিন্তা করা উচিত যে, তার অবস্থানভূমি হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ। বিগত যুদ্ধের সে ছিল একমাত্র ভুক্তভোগী। কাজেই এশিয়াকে যুদ্ধমুক্ত রাখা জাপানের একটি প্রধান দায়িত্ব এশিয়ার একমাত্র শিল্পোন্নত রাষ্ট্র, বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক মহাশক্তি এবং প্রথম আণবিক বোমার শিকার একটি জাতি হিসেবে। আধুনিক প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং অস্ত্র বহন করলেই যে শান্তিবাদী হওয়া যাবে না, শান্তির জন্য লড়াই করা যাবে না তা কিন্তু নয়। সেটা নির্ভর করে জাপানের অতীতের শিক্ষা, আন্তরিকতা এবং সুস্পষ্ট পররাষ্ট্র নীতির উপর। মোটকথা, এশিয়ার সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তিরক্ষায় জাপানকে সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে। মহাএশিয়ার স্বার্থকে সর্বাগ্রে তুলে ধরতে না পারলে জাপানকে এশিয়া থেকে পৃথক হয়ে পড়তে হবে তাতে কোন ভুল নেই।

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয়তাবাদ এবং 'এশিয়া এক' (Asia is One) এই প্রাচ্যাদর্শবাদের বশবর্তী হয়ে কতিপয় জাপানি জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী এশিয়া থেকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়নের জন্য এশিয়ায় ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যা পরে দাইতোয়া ছেনসো বা মহাএশিয়া যুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল বহির্দেশীয় শ্বেতাঙ্গ জাতি কর্তৃক অপহৃত এশিয়ার দেশ ও জাতিসমূহের স্বাধীনতা এবং সার্বিক শান্তির পুনরুদ্ধার। এই যুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটে কিন্তু বিনিময়ে এশিয়ার দেশগুলো শত শত বছর পর স্বাধীনতা লাভ করে। পরবর্তীকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানে সূচনা হয় হিরোশিমাকে কেন্দ্র করে শান্তিবাদী শক্তিশালী এক আন্দোলনের। যা ভিয়েতনাম যুদ্ধ পর্যন্ত বিরাজিত ছিল। সেই ঐতিহ্যের ধারা পুনরায় জাগ্রত করে এশিয়ায় যুদ্ধবিরোধী, সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা জাপানকে ভাবতে হবে--আজকে এই কথা

উঠছে এশিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে। অবশ্য তার জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। কিন্তু কোথায় সে নেতৃত্ব? নেতৃত্বের দিক দিয়ে আজ জাপান সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া। তবুও রয়েছে হিরোশিমা.নাগাসাকির জ্বলন্ত উদাহরণ। তার আলো ও উত্তাপকে ছড়িয়ে দেয়া জরুরী মহাএশিয়ার আনাচেকানাচে। প্রদর্শন করা প্রয়োজন তার ভয়ানক, বীভৎস, অমানবিক দৃশ্যাদি যাতে মানুষ জানতে পারে, দেখতে পারে এবং উপলব্ধি করতে পারে--আণবিক, হাইড্রোজেন এবং পারমাণবিক বোমা কী ভয়ংকর দানব! কি করে সে মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে অমূল্য প্রাণসমূহের কী বিশাল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারে! যা এক কথায় অবিশ্বাস্য কিন্তু নির্মম সত্য! সেই অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর সত্যের শিকার হতে চায় না আর মানবজাতি।

কবে থেকে কে জানে প্রতি বছর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে হিরোশিমা দিবসে সভা, মিছিল ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে ঢাকা ও কলকাতায়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে, খুবই ক্ষুদ্রাকারে। এই শান্তি আন্দোলনকে আরও গতিশীল এবং সম্প্রসারণ করার জন্য স্থানীয় নগর প্রশাসন শুধু নয়--কেন্দ্রীয় সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। আরও ব্যাপক আকারে, আরও গভীর ভেতর থেকে উৎসারিত হওয়া প্রয়োজন হিরোশিমা.নাগাসাকির আহবান। হিরোশিমা.নাগাসাকি স্মৃতিমন্দির চত্বর যেন সপ্তাহব্যাপী, মাসব্যাপী শান্তির উৎসবে আন্দোলিত হতে পারে আগস্ট মাসে এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিবাদী, মানবপ্রেমী সর্ববয়সী মানুষের মহামিলনে তার জন্য এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। তা না হলে মনীষী বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল দ্বিতীয়বার (১৯৫২) জাপান সফরকালে হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি মহাসভায় সভাপতি হিসেবে হিরোশিমা ঘটনাকে মানবজাতির মহাপরাধ বলে অখ্যায়িত করে যেমন বলেছিলেন, "যেন এই ধরনের অপরাধ আর না ঘটে।" তেমনি আরেকবার মহাপরাধ ঘটে যেতে পারে বিস্ফোরোন্মুখ কাশ্মীরে! যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হবে কয়েক গুণ বেশি : প্রাণ বিসর্জন দেবে কোটি কোটি মানুষ। পুনর্বার উঠে দাঁড়ানোর মতন শক্তি ও সামর্থ্য ঐ অঞ্চলের কোন দেশেরই নেই।

আজকে প্রচন্ড মার্কিনী ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে জাপান যে আত্মপরিচয়হীনতার সংকটে ভুগছে তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিচারপতি ড. পালের সেই বিখ্যাত উক্তিটিকে অনুধাবন করা। তিনি হিরোশিমা সফলকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে পাঠ্যগ্রন্থে ভুল ইতিহাস পড়তে দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং ব্যথিত হয়েছিলেন। তখন মন্তব্য করেছিলেন, "ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে প্রকৃত ইতিহাস শিশুদের কাছে তুলে ধরতে হবে।" কাজেই হিরোশিমা.নাগাসাকি ঘটনার অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে প্রকৃত ইতিহাস, শান্তি সৃষ্টির অনন্য আধ্যাত্মিক এক শক্তি। যা জাপান ছড়িয়ে দিতে পারে এখনই এশিয়ার বিপদসঙ্কুল অঞ্চলসহ বিশ্বব্যাপী।

হিরোশিমা.নাগাসাকি আগামী দিনের পথনির্দেশক

বলা হয়ে থাকে যে বারুদের আদি জন্মস্থান হচ্ছে চীনদেশ। সহস্র বছর আগে চীনে বারুদ ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন মানবজাতির ক্ষতি হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নাড নোবেল (১৮৩৩-৯৬) যখন ১৮৬৭ সালে পিতার বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থের গবেষণাগারে কাজ করতে গিয়ে ডিনামাইট আবিষ্কার করে ফেললেন তখন পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ বোধকরি মৃদু নড়েই উঠেছিল। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন তিনি। তাই যুদ্ধ নয়, শান্তির পক্ষে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার 'নোবেল পদক' প্রদানের ইচ্ছে পোষণ করেন। নোবেল পুরস্কারের ১০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বহু জ্ঞানী-গুণীকে শান্তির পক্ষে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এ পর্যন্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে কিন্তু তাঁর সৃষ্ট বিস্ফোরক বিশ্ব থেকে শান্তি হরণ করে নিয়েছে। তাঁরই আবিষ্কৃত পন্থা থেকেই তৈরি আণবিক বোমা তাঁর মৃত্যুর ৪০ বছরের মধ্যেই হিরোশিমা.নাগাসাকিতে নিক্ষেপিত হয়েছে। প্রকম্পিত হয়েছে ভূপৃষ্ঠ, স্তম্ভিত হয়েছে মানবজাতি। স্যার নোবেল জীবিত অবস্থায় যদি এই আণবিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতেন--কি বলতেন বা ভাবতেন আমাদের তা ধারণার বাইরে। তিনি কি সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেন? আমরা জানি না।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein,

১৮৭৯-১৯৫৫) যিনি মার্কিন প্রশাসনকে আণবিক বোমা তৈরির জন্য প্ররোচিত করেছেন বলে প্রকাশ, তিনি হিরোশিমার হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখে বাকশূন্য হয়ে পড়েছিলেন! প্রকৃতি আর মানব নিয়ে যাঁর ছিল সবেচেয়ে বড় বিশ্বাস এবং অহংকার সেই কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকলে কি বলতেন হিরোশিমা.নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও আমরা করতে পারি না। আজ তাঁর জন্মভূমি ভারতের বুকেই বিস্ফোরোন্মুখ অবস্থায় আছে সাংঘাতিক মারণাস্ত্র পারমাণবিক বোমা! কেউ কাউকে আজ থামাতে পারছে না। প্রতিহত করা যাচ্ছে না পারমাণবিক বোমা ও মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতাকে। ইরান কর্তৃক পারমাণবিক বোমা তৈরির সন্দেহ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, য়োরোপ আর ইরানের মধ্যে চলছে বাকযুদ্ধ। একই সংকট উত্তর কোরিয়াকে নিয়েও। পৃথিবী কি তবে ধ্বংসের শেষ সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে? এটাই কি তবে রবিঠাকুরের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা 'সভ্যতার সংকট'? সেই সংকট শুরু হয়েছিল মূলত নোবেলের বিস্ফোরক আবিষ্কারের পর থেকেই।

হাঙ্গেরী দেশে জন্ম ইহুদি পদার্থবিদ লিও শিলার্ড (Leo Szilard) আশংকা করেছিলেন যে, নাৎসী হিটলার সম্ভবত এটম বোম্ বহন করছে। তিনি মার্কিনী প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্টকে এক চিঠিতে অতিরিক্ত শক্তিশালী এক ধরনের নতুন বোমা তৈরির আবেদন জানান। সেই চিঠিতে ইহুদি বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের স্বাক্ষরও ছিল। রুজভেল্ট কালক্ষেপ না করে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে ইউরেনিয়াম উপদেশ কমিটি গঠনে এগিয়ে যান। তখনো কেউ ধারণা করেনি যে, এমট বোম্ তৈরি হতে যাচ্ছে।

১৯৪২ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম বোমা তৈরির প্রকল্প অনুমোদন করেন। এবং এই প্রকল্পের দায়দায়িত্ব তখনকার সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল লেসলি আর. গ্রোভসকে দেন। ১৯৪৩ সালে জেনারেল লেসলি নিউমেক্সিকোতে 'লস্‌আমালস আণবিক গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপন করে বিজ্ঞানী জে. রবার্ট ওপ্পেনহেইমার (J.Robert Oppenheimer, ১৯০৪-৬৭)কে তার পরিচালক নির্বাচিত করেন। এটাই ঐতিহাসিক 'ম্যানহাটেন প্রজেক্ট' বলে

ইতিহাসে পরিচিত।

ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালেই নাৎসী জার্মান আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে ছিল পারমাণবিক গবেষণায় কিন্তু হঠাৎ করে সে আণবিক বোমা তৈরির পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। আমেরিকা এই সংবাদ জানা সত্ত্বেও তার পরিকল্পনা সংশোধন করেনি বরং বোমা তৈরির প্রকল্পকে সফল করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই প্রকল্পের পেছনে ব্যয় হয় তৎকালীন দুই বিলিয়ন ডলার। বোমা প্রকল্পে কেমিক্যাল, মেটাল, ইলেকট্রিক, অটোমোটিভ, জ্বালানী এবং গৃহনির্মাণ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণ করে। কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন ১২০,০০০ জন। এই প্রকল্পে তৈরি আণবিক বোমা যথাক্রমে 'লিটল্ বয়' ও 'ফেট ম্যান' হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা হয় ১৯৪৫ সালের ৬ এবং ৯ই আগস্ট। এই বোমাদ্বয় ব্যবহার না করার জন্য বহু বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও তাঁদেরকে সজ্ঞানে উপেক্ষা করেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং তাঁর সমর্থকরা। 'এনোলা গে' নামক বোমারু বিমান থেকে হিরোশিমাতে বোমা নিক্ষেপ করেন পাইলট পল টিবেটস। সম্প্রতি তিনি পরলোকে গমন করেছেন।

সেই যে শুরু হল আণবিক ধ্বংসযজ্ঞের মহাপরিকল্পনা আজও তা সমানভাবে চলছে। তারপরও আমেরিকা একাধিক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, পাল্লা দিয়েছে রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন এবং সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তান। সন্দেহ করা হচ্ছে ইসরায়েল, ইরান, ইরাক এবং উত্তর কোরিয়ায় রয়েছে পারমাণবিক, রাসায়নিক বোমা ও অস্ত্র তৈরির গুপ্ত কারখানা। সম্প্রতি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে প্রকাশ।

পাক-ভারত পারমাণবিক সংকট বিষয়ে জাপান নীরব কেন?

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর সারা পৃথিবীর সচেতন মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল! অনেকেই আশংকা করেছেন যে, এই আণবিক-পারমাণবিক বোমা এবং সমরাস্ত্র ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী রূপ ধারণ করবে। তাঁদের আশংকাকে দূরীভূত করতে ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমাণবিক প্রযুক্তিসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে এই বিষয়ে সমঝোতা আনার

জন্য এক সম্মেলনের আয়োজন করে। কিন্তু তৎকালীন স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিপক্ষ দুই মহাশক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মতানৈক্যের কারণে সমঝোতা ভেঙ্গে যায়। তারপর ক্রমাগত পামাণবিক গবেষণাও এগিয়ে চলতে থাকে। রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন সফলভাবে তাদের পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়।

১৯৬০ সালের দিকে যখন উন্নত প্রযুক্তির কারণে পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হল তখন এই শক্তিকে সামরিক ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা সহজতর হয়ে যাবে ভেবে মহাশক্তিদ্বয় সচেতন হয়ে ওঠে। যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়া অসম্ভব কিছু হবে না মনে করে পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পুনরালোচনায় আগ্রহী হওয়ার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

১৯৬৯ সালে জাতিসংঘের মাধ্যমে যৌথভাবে নন্‌-প্রোলিফিরেশন ট্রিটি (NPT) চুক্তিতে মিলিত হয় আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া। এটাই প্রথম পারমাণবিক বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তি। তাতে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ১৮৭টি দেশের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর প্রদান করেন। কিন্তু স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকে তিনটি দেশ ভারত, পাকিস্তান এবং ইসরায়েল। পাশাপাশি পারমাণবিক মুক্তাঞ্চল (Partial Test-Ban Treaty=PTBT, Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty=CTBT) প্রভৃতি চুক্তির মাধ্যমেও পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ অব্যাহত রয়েছে। এই অঞ্চল সাধারণত দুই রকম : একটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফ্রী জোন্: এই অঞ্চলসমূহে সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তেজস্ক্রিয় দ্রব্য ও বর্জ্য প্রেরণ নিষিদ্ধ। অন্যটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ওয়েপনস্ জোন্: এখানে একমাত্র শান্তির লক্ষ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ অনুমোদিত। এতদসত্ত্বেও পারমাণবিক গবেষণা ও মারণাস্ত্র তৈরির প্রবাহ ফেরানো যাচ্ছে না। অন্ততঃপক্ষে, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারত সিটিবিটিতে স্বাক্ষর না করবে এশিয়ায় শান্তি আসবে না বলাই বাহুল্য। জাপান পাক-ভারত পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। কেননা উন্নয়নকামী এই দুটি দেশই বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ODA, অর্থনৈতিক সাহায্য এবং সহযোগিতা তো রয়েছেই, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সম্পর্ক ক্রমশ

ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। কিন্তু এই সংকট নিরসনে জাপান আদৌ উদ্যোগী নয় বলে সাধারণ জাপানিদের ধারণা। কিন্তু কেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

শিশুকন্যা সাদাকোর কথা

হিরোশিমায় পতিত আণবিক বোমা কেড়ে নিয়েছে অনেক শিশুর নিষ্পাপ অমূল্য প্রাণ। তাদের মধ্যে একজন সাদাকো সাসাকি। যখন বোমা বিস্ফোরিত হয় তখন সাদাকো মাত্র দুই বছরের এক শিশু। হাইপো সেন্টারের মাত্র ১.৫ কিলোমিটার দূরত্বে থেকেও সে ছিল অলৌকিকভাবে অক্ষত। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সাদাকো ক্রমশ বেড়ে উঠছিল। যখন সে দশ গ্রেডের ছাত্রী তখন সে অসুস্থতা অনুভব করতে শুরু করে। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাদাকোকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় লিকুমিয়ার কারণে।

একদিন সে জানতে পারে যে, এক হাজারটি কাগজের সারস তৈরি করতে পারলে তার অসুখ ভালো হয়ে যাবে। তারপর সে তার ওষুধের বাক্সো এবং যখন যেখানে কাগজ পেয়েছে তা দিয়ে সারস তৈরি করেছে। কিন্তু আট মাস অসুখের সঙ্গে লড়াই করার পর ঐ বছরের অক্টোবর মাসের ২৫ তারিখে সাদাকো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

তার মৃত্যুর পর সতীর্থ বন্ধুরা প্রতীজ্ঞা করে চাঁদা সংগ্রহ করে তারা সাদাকোর জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করবে। তাদের আহবানে সারা দেশ থেকে একের পর এক চাঁদার অর্থ আসতে শুরু করে। ১৯৫৮ সালের ৫ই মে তারিখে সাদাকোর স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয় হিরোশিমা জাদুঘর চত্বরে।

সাদাকো সর্বমোট ১,৩০০টি কাগজের সারস তৈরি করেছিল। কিন্তু দশ বছর পর আণবিক বোমা তার বাঁচার আশা হরণ করে নেয়। সাদাকো গোপনে তার রক্ত পরীক্ষা এবং শারীরিক অবস্থার কথা লিখে রেখেছিল যা তার মৃত্যুর পর জাপানি ভাষাসহ পৃথিবীর অনেক ভাষায় প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি তাকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একাধিক সচিত্র গ্রন্থ। আজও শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন ধ্বনিত হয় নিষ্পাপ ফুলের মতো সুন্দর শিশুকন্যা সাদাকোর বাঁচার আকুতি।

পরিশেষে বলব, পৃথিবীর কোথাও যেন আর হিরোশিমা.নাগাসাকির সৃষ্টি না হয়। যেন আর খালি করে না নেয় কোন মায়ের কোল তাঁর একমাত্র অমূল্য ধন শিশুসন্তানকে কেড়ে নিয়ে আণবিক বোমার মতো নিষ্ঠুর দানব!

....

* ২০০২ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত

* আলোকচিত্রঃ হিরোশিমা স্মৃতি যাদুঘরের সৌজন্যে

সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী বহু কোম্পানী,
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দোওয়াচিকুতে জন্ম এমন
ছাত্র-ছাত্রী বা নাগরিককে যোগ্যতা থাকা
সত্ত্বেও চাকুরিতে নিয়োগ করে না। অনেক
কোম্পানী নবীন কর্মচারীদেরকে জানিয়েও
দেয়, দোওয়াচিকুর বংশধর হলে
কোম্পানীতে স্থান নেই!

১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে দৈনিক জাপান টাইমস্ পত্রিকায় 'জাপানে মানবাধিকার পরিস্থিতি' সম্পর্কে একটি বেশ বড় সংবাদ পড়েছিলাম। জেনেভাস্থ জাতিসংঘ মানবাধিকার দপ্তরে বেশ কয়েকটি জাপানি নাগরিক সংস্থা এবং NGO জাপানের মানবাধিকার বিষয়ক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনটি উপস্থিত করেছে। আবার জাপান সরকারও অনুরূপ প্রতিবেদন উক্ত দপ্তরে তুলে ধরেছে। অবশ্য দুপক্ষেরই প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য ও কার্যক্রমের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল।

বেসরকারি সংস্থাগুলোর জরিপকৃত ক্ষেত্রগুলো ছিল প্রধানত সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়, নারী ও মৃত্যুদন্ড। অবশ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে কোরীয়, চীনাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। প্রায় ছয় লক্ষ কোরীয়কে নাগরিকত্ব, স্থানীয় প্রশাসন, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ, জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা ও কর্মকান্ড থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত করা হচ্ছে। জাপানি নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত কর পরিশোধ করা সত্ত্বেও কোরীয়, চীনা অনুরূপ বিদেশীরা বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে প্রতারিত হচ্ছে। অবশ্য এই অভিযোগসমূহ অস্বীকার করারও উপায় নেই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। জাপান সরকারের এই মনোভাব এক কথায় বৈষম্যমূলক নীতির বহিঃপ্রকাশ এবং মানবাধিকার লংঘনের শামিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রকৃতপক্ষে, শ্রেণী এবং জাতিগত বৈষম্য বলাই বাহুল্য জাপানের প্রাচীন এক সমস্যা। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, হোক্কাইদো প্রদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু আদিবাসী বলে পরিচিত 'আইনু' সম্প্রদায়। যারা জাপানিদের আদিপুরুষ 'জমন' গোষ্ঠীর বংশধর বলে অনেক পন্ডিতই মনে করেন। জমনরা পরবর্তীকালে কোরিয়া-উপদ্বীপ থেকে আগত অপেক্ষাকৃত উন্নত অভিযাত্রী 'ইয়ায়োই' আগন্তুকদের হাতে পরাজিত হয়ে দক্ষিণাঞ্চল থেকে সরে আসতে আসতে হোক্কাইদো অঞ্চলের পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। জমনরা ছিল কিছুটা অনুজ্জ্বল; ইয়ায়োইরা উজ্জ্বল বর্ণের অধিকারী। আজকের জাপানিদের মধ্যে সাধারণত এ দুটি বর্ণ ও রক্তের লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। অবশ্য দুয়ের সংমিশ্রিত বংশধরও কম নয়। আইনুরাই হচ্ছে জাপানের একমাত্র স্থানীয় আদিবাসী যারা বহুকাল ধরে

আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে দমন, শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। হারিয়েছেন বসতি, স্থিতি, ভাষা ও সংস্কৃতি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইয়াসুহিরো নাকাসোনে তো আইনুদেরকে অস্বীকারই করে বসেছিলেন! জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, আইনু বলতে কোন সংখ্যালঘু জাপানে নেই সুতরাং জাতিগত বৈষম্যের প্রশ্নই আসে না! পরে অবশ্য ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিলেন। এই যে দায়িত্বহীনতা, অবহেলা, শোষণ এবং একই জাতিগোষ্ঠীর জ্ঞাতিভাই হওয়া সত্ত্বেও অর্থ ও রাজনৈতিক বৈষম্য, তাঁদের স্বাভাবিক অধিকারসমূহ অস্বীকার বিশ্বের অন্যান্য সমাজের মতো জাপানি সমাজেও নতুন কিছু নয়। জাপানে এই বৈষম্য এক হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন বলে মনে হয়। যে বৈষম্য ভারতীয় বর্ণশ্রেণী বৈষম্যের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। যদি বলা হয় যে, জাপানেও ভারতীয় জাতির কলঙ্ক বলে পরিচিত বর্ণশ্রেণী প্রথা এক সময় ছিল হয়তবা অবিশ্বাস্যই শোনাবে আজকের প্রাচুর্যশালী তরুণ সমাজের কাছে অথবা বিদেশীদের কাছে। কেননা এই বিষয়ে তথ্য ও সংবাদ সচরাচর গণমাধ্যমে আসে না, পাঠ্যবিষয় হিসেবেও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় না একমাত্র ভুক্তভোগীদের প্রতিষ্ঠান ছাড়া। অবশ্য মেইজি সংস্কারের (১৮৬৮) পর দ্রুত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে সমাজে কর্মানুসারে বিভক্ত শ্রেণীপ্রথার বিলুপ্তি ঘটতে থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে আজও তা বিদ্যমান এবং সরাসরি সরকারি দলিলপত্র থেকেই তা জানা যাচ্ছে। গবেষক, পন্ডিত কিংবা ভুক্তভোগীর বর্ণিত প্রসঙ্গ তো আছেই। এই সমস্যা সম্পর্কে রয়েছে বিস্তর গবেষণালব্ধ প্রকাশনা।

জাপানকে অনেকেই এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে ধারণা করে থাকেন। অবশ্য বাহ্যত সে দৃষ্টিতে তাই। এ দেশে একজন ধনী ব্যক্তি যা ক্রয় করতে পারছেন সেটা একজন সাধারণ শ্রমিকও ক্রয় করতে সক্ষম। জাপানি সমাজ 'বিয়োদোশুগি' বা 'সাম্যবাদে' বিশ্বাসী অর্থাৎ আইনানুযায়ী সকলে সমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অন্দরমহলে রয়েছে নানা রকম জটিলতর বৈষম্য, মানবাধিকার লংঘনের বংশক্রমিক ঘটনা। আন্তর্জাতিকতার যুগে জাপানে অবস্থিত দরিদ্র দেশসমূহ থেকে আগত বিদেশী শ্রমিকদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে অমানবিক আচরণও এসেছে মূলত

উত্তরাধিকার সূত্রে। বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ জাপানি সমাজে বিদ্যমান বটে তবে সবচেয়ে জটিল এবং নীরব সমস্যা হচ্ছে স্বজাতির প্রতি বৈষম্য। একই গোষ্ঠীভুক্ত জাতি বলে কথিত সত্ত্বেও স্বজাতি-বৈষম্য জাপানের একটি কলঙ্কময় অধ্যায় তাদের জাতিগত ইতিহাসে। এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সেই কলঙ্কময় অধ্যায় বা সমস্যাই হচ্ছে আজকের দিনে যা জাপানিরা বলেন 'দোওয়াচিকু মোনদাই'। অবশ্য নিকট অতীত পর্যন্ত এই সমস্যা 'এতা', 'ছেনমিন', 'হিনিন', 'হিসাবেৎসু বুরাকুমিন' (Discriminated Communities) নামে পরিচিত ছিল। শোওয়া যুগের (১৯২৬-১৯৮৯) প্রারম্ভলগ্নে বুরাকুমিন পরিবর্তিত হয়ে 'দোওয়াচিকু' নামে অভিহিত করার আইনানুগ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে বিদেশীদের কাছে 'বুরাকুমিন' (Hamlet People) নামেই বেশি পরিচিত জাপানের অস্পৃশ্য বা দলিত শ্রেণীর লোকজনরা। ১৯৯৯ সালের এক জরিপ থেকে জানা যাচ্ছে, সারা জাপানব্যাপী কমপক্ষে ৫০০০ দোওয়াচিকু বসতিতে ২,০০০,০০০ জন বুরাকুর বসবাসের কথা। অন্যদিকে বুরাকু মুক্তি এবং মানবাধিকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Buraku Liberation and Human Rights Rcsearch Institute, Japan) এর তথ্য অনুযায়ী ৬০০০ বসতিতে ৩,০০০,০০০ জন কুরাকুমিন এখন বসবাস করছেন। যা মূল জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ। যাঁদের পেশা ছিল যুদ্ধপূর্ব পর্যন্ত নিম্নমানের কাজকর্ম। যেমন মুচিগিরি, চামড়ার কারবার, চুলকাটা, মানুষ-পশু-পাখীর মরদেহ সৎকার (ডোম), ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি। অবশ্য মধ্যযুগে বা তারও আগে অন্যান্য পেশাও ছিল। মহাত্মা গান্ধী যাঁদেরকে বলেছিলেন 'হরিজন'। অবশ্য এই হরিজনদের একজন আর.কে. নারায়ান্ণ আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। জাপানে রাষ্ট্রপ্রধান না হলেও বুরাকু মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মাৎসুমোতো জিইচিরো (১৮৮৭-১৯৬৬) সাম্যবাদী দল থেকে ডায়েটের উচ্চাসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন, আরেকবার সম্মানীত স্পীকারের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর পরে অনেক বছরের ব্যবধানে ১৯৯৪ সালে 'আইনু' সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে 'উচ্চকক্ষে'র সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন কায়ানো শিগেরু। ১৯৯৭ সালে

'আইনু আইন' নামে একটি বিধি সংসদে গৃহীত হয়েছে আইনু ঐতিহ্য-সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে। যাদের সংখ্যা বর্তমানে ২৪,০০০। যদিওবা জাতিচ্যুত রীতিনীতি বা 'আউটকাস্ট সিস্টেম'কে বিলুপ্ত করা হয়েছে মেইজি যুগে ১৮৭১ সালে আইনের মাধ্যমে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি। তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, শতাধিক বছর পর আইনু-অস্তিত্বকে স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনা। এশিয়ার প্রাচীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে কথিত জাপান কতখানি গণতান্ত্রিক ছিল বা এখন কতখানি আদৌ প্রশ্নাতীত নয়।

মানবাধিকার বিষয়ে কেন্দ্রিয় সরকার বরাবরই সচেতন, সজাগ। কাজেই সরকার, রাজধানী টোকিয়ো মহানগর প্রশাসন এবং আঞ্চলিক সরকারগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে বিদ্যমান বুরাকুমিন গোষ্ঠীগুলোকে 'দোওয়াচিকু'র অধীনে এনে সমঅধিকার দেয়ার। শিক্ষিত করে তোলার বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব সময়ে ওসাকা মহানগরের একটি স্থান ছিল দোওয়াচি-কু যেখানে বুরাকুমিন তথা অস্পৃশ্যরা বসবাস করতেন। এখান থেকেই পরবর্তীকালে 'দোওয়াচিকু' নামটি গৃহীত হয়েছে 'বুরাকুমিনে'র পরিবর্তে। জাপানের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে ওসাকা, কোবে, কিয়োতো, হিরোশিমা, কিউশু প্রভৃতি অঞ্চলেই অধিকাংশ বুরাকু জনগোষ্ঠীর বসবাস।

এই দোওয়াচিকু তথা বুরাকুমিন গোষ্ঠীর ইতিহাস একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এক হাজার কিংবা তারও বহু আগে রাজকীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বুরাকুমিন গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ 'এতা' অথবা 'ছেনমিন' শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছে 'কর্মানুসারে'। সমাজে কর্ম অনুযায়ী ভারতীয় বর্ণাশ্রম বা জাতিপ্রথার মতো অনুরূপ চারটি শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রাচীন জাপানি সমাজেও। কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন ভারত থেকেই তার আমদানি হয়েছে জাপানে। অবশ্য তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তবে ভারতের মতোই ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে বুরাকুমিন সৃষ্টির পেছনে। দুটি প্রধান ধর্ম শিন্তো ও বৌদ্ধধর্ম এবং চীনা কুনফুশিয়ান মতবাদ ভিত্তিক ঈশ্বরিক ছুঁৎমার্গ, ধর্মীয় পবিত্রতা ইত্যাদির ধোঁয়া তুলে নিম্নস্তরের অথচ জরুরী কর্ম সম্পাদনকারী মানুষদেরকে সমাজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

প্রবীণ জাপানি এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বা গবেষক ছাড়া জাপানি

বর্ণশ্রেণী প্রথার ইতিহাস অধিকাংশ নাগরিকই জানেন না। কেননা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই সমস্যাটি পড়ানো হয় না। তাই বলে দোওয়াচিকু সমস্যা সমাজ থেকে মিলিয়ে যায়নি, আগে যেমন ছিল এখনো আছে তবে গভীর স্তরে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখন সকলে সমান হয়ে গেছে। কে যে বুরাকুমিন বা দোয়াচিকুর লোক বোঝা মুশকিল। আপাতদৃষ্টিতে সকলেই কলকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মাঠে ঘাটে, বন্দরে-জাহাজে কাজ করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত এবং বুরাকুমিনের মধ্যে দূরত্ব দূর করে দিলেও তা ছিল সাময়িক। তার প্রমাণ এখনো মিলে। অর্থাৎ সাধারণ জাপানিদের মনে সুপ্ত অবস্থায় সেটা ছিল, এখনো আছে আর ঘটনাজনিত কারণে সেটা মাথা চাড়া দেয়। রক্তে জাত্যাভিমান বা কুলগর্ব ফুঁসে স্ফীত আকার ধারণ করে। অদৃশ্য এই বৈষম্যের মূল উৎস কোথায় তার একটি সংক্ষিপ্ত রেখা খুঁজে দেখা যেতে পারে।

আগেই বলেছি জাপানি সমাজের অন্দরমহলে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা যে শীতল সর্পিল বৈষম্যবাদ তার ইতিহাস অনেক অনেক প্রাচীন এবং জটিল। সম্ভবত জাপানি ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। যে কয়টি গ্রন্থ, জার্নাল ও প্রতিবেদন পড়ার সুযোগ হয়েছে এবং যতখানি বুঝেছি তাতে অতীতকালের জাপান যে কতখানি অসভ্য ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন অসভ্য জাতিগুলোর সঙ্গে জাপানি জাতির কথাও উল্লেখ করেছিলেন। পঠিত গ্রন্থাদির মধ্যে লেখক, সমালোচক কাওয়ামোতো য়োশিকাজুর 'বুরাকু মোনদাই তো ওয়া নানি কা'? অর্থাৎ 'বুরাকু সমস্যা আসলে কি'? এই ছোট্ট গ্রন্থটিকে আমি জাপানের সর্বকালের সকল বুরাকুমিন সমস্যা এবং অন্যান্য বৈষম্য সম্পর্কে অতি সহজে জানার জন্য চমৎকার একটি আকর গ্রন্থ বলে মনে করি। কেননা খুব সহজ ভাষায়, সুস্পষ্ট উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তিনি জাপানি সমাজের প্রকৃত 'চেহারা'টি-কে তুলে ধরেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, তিনি নিজে এক বুরাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে। ওয়াকায়ামা-জেলার এক বুরাকুমিন গ্রামে লালিত-পালিত হয়েছেন। বড় হয়ে মেইজি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তাঁর বিস্তর অভিজ্ঞতার কথাই তিনি কয়েকটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। বুরাকুমিন জনমানুষের সংস্কৃতিই যে জাপানের প্রকৃত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি যা হারিয়েছে অতীতে, হারিয়ে যাচ্ছে বর্তমানকালে সে সম্পর্কে কাওয়ামোতো মহাশয়ের বিশ্লেষণও অপূর্ব। তাঁর গ্রন্থ পাঠ করেই প্রথম জানতে পেলাম অনেক তথ্য জাপানের বর্ণশ্রেণী বৈষম্য সম্পর্কে।

জাপানের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রথম দিকে কর্মানুসারে তিনটি শ্রেণী ছিল। কিজোকু বা অভিজাত, হেইমিন বা কৃষিজীবী এবং ছেনমিন বা পদবীহীন মানুষ। 'কিজোকু' বলতে সম্রাটসহ তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং রাজকীয় কর্মকর্তাবৃন্দ; হেইমিন হচ্ছে মূলত যাঁরা জমির মালিক ও কৃষি যাঁদের পেশা। আর এই দুই শ্রেণীকে যাঁরা সেবা প্রদান করতেন বংশানুক্রমে তাঁরাই ছেনমিন অর্থাৎ আধুনিককালে তাঁদের পরিচিতি হচ্ছে, 'বুরাকু মিনজোকু' (বুরাকু জনগোষ্ঠী) বা 'দোওয়াচিকু মিনজোকু'। যেমন চামড়াজীবী, কামার, কুমোর, তাঁতী, শীল, লোকসংস্কৃতিজীবী, জেলে, ধাড়ঙ্গ, প্রহরী, হরিজন প্রমুখ। সমাজে তাঁরা ছিলেন একঘরে হয়ে। আশ্চর্যের বিষয় যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কেও তখন 'ছেনমিন'দের পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। ভারতবর্ষে ব্যবসায়ীরা ছিল সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর লোক, যারা 'বৈশ্য' নামে পরিচিত।

কর্ম বা পেশা ছাড়াও 'হেইমিন' বা 'সাধারণ মধ্যবিত্ত নাগরিক' কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী 'হিতইচাকুশা' বা 'হিনিন' অর্থাৎ চিরস্থায়ী সমাজবিচ্ছিন্ন অস্পৃশ্য শ্রেণীতে পরিণত হয় তারও ইতিহাস কাওয়ামোতো মহাশয় ব্যক্ত করেছেন। যেমন কৃষিক্ষেত্র। বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে অনেকাংশে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কিছু নয় জাপানের প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজে। প্রাচীনকালে জাপানে যাঁরা ভূমিচাষযোগ্য জমির মালিক ছিলেন সেই সকল কৃষিজীবীরা যখন 'নেন্‌গু' বা 'বার্ষিক কর' পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতেন তাঁরা জমিজমা, বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিয়ে সমাজচ্যুত হতে বাধ্য হতেন। কেননা এটা ছিল তখনকার সর্বমান্য প্রশাসনিক বিধান। বার্ষিক কর দিতে না পারার কারণে সহায় সম্পত্তি সবই প্রশাসনের হস্তগত হত। রাজকীয় শাসনব্যবস্থায় প্রাচীন জাপানে

মর্তের ধূলোবালি থেকে শুরু করে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 'কামিসামা' বা 'ঈশ্বর' বলে কথিত 'তেন্‌নো' বা 'সম্রাটে'র সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। সুতরাং সর্বহারা হেইমিন আর যাবে কোথায়? যাবার তাঁর জায়গা কোথাও ছিল না। সর্বত্র সম্রাটের অনুগামীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে তাঁরা আশ্রয় নিতেন 'ছেনমিন মুরা' বা 'অস্পৃশ্যদের গ্রামে'। অনুরূপ, হেইমিন পরিবার থেকে পরিবার প্রধান--পিতা বা অবর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কোন অসুখে, দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন এবং প্রশাসনিক চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন সেই অবস্থায়ও তাঁকে 'হিনিন'-এ পরিণত হতে হত।

হেইয়ান যুগে (৭৯৪-১১৮৫) রাষ্ট্রের 'রিৎসুরিয়োসেইদো' অর্থাৎ 'প্রশাসনিক বৈধ্য পদ্ধতি' ভেঙ্গে পড়েছিল। কৃষকসমাজ অপ্রতুল ফলনের কারণে বাৎসরিক খাজনা দিতে ব্যর্থ হয়। এর ধারানুসারে কামাকুরা যুগ (১১৮৫-১৩৩২) থেকে শুরু করে মুরোমাচি জিদাই (১৩৯২-১৫৬৮) হয়ে ছেনগোকু জিদাই (১৪৬৭-১৫৭৩) পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রের অর্ধেক কৃষিজীবী 'হিনিনে' পতিত হন বলে অনেক পন্ডিত মনে করেন।

মধ্যযুগে 'হিনিন', 'ছেনগিয়োশা' (অপরিষ্কার, বিপদজনক এবং কঠিন কর্ম সম্পাদনকারী) মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। এ সকল কাজ ছাড়াও অনেকে নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং নানাবিধ খেলাধূলা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনেকে হস্তশিল্প তৈরির কাজ গ্রহণ করেছিলেন। আনন্দ-বিনোদন পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গও সমাজে 'ছেনমিন' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সমকালীন জাপানে এবং বিশ্বব্যাপী সুবিখ্যাত যে অভিনব 'কাবুকি' থিয়েটারের কথা আমরা জানি তাও ছিল এক সময় অস্পৃশ্যদের সংস্কৃতি। হেইমিন বা মধ্যবর্তী শ্রেণীর লোক হিসেবে যাঁরা বার্ষিক কর পরিশোধে অপারগ হতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে মাথার চুল কামিয়ে মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে 'ওবোসান' তথা বৌদ্ধভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করতেন।

মধ্যযুগ ছিল মূলত শোওগুন-যোদ্ধা বা সামুরাইদের শাসনামল। এ

সময় সমাজের শ্রেণীগত বিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। বিশেষ করে 'ছেনমিন' শ্রেণীভুক্ত হস্তচালিত কলকারখানার দক্ষ কারিগর, পাথর-কাটুরে, বাঁশ থেকে কাঁচামাল তৈরির কারিগর, কামার প্রমুখ ব্যক্তিরা সামাজিক পদোন্নতি লাভ করে 'হেইমিন' হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

প্রাচীনকালের সামাজিক বৈষম্য প্রথা যে এখনো জাপানি সমাজে রয়েছে সে সম্পর্কে লেখক কাওয়ামোতো মহাশয় বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে সাবধান করে দিয়েছেন। কেননা আইনগতভাবে সকল বৈষম্য দূর করা হলেও কখন যে তা ঘটনাচক্রে প্রকাশ পাবে বলা মুশকিল। কাজেই বুরাকুমিন সাবেৎসু বা বুরাকু বৈষম্য জেনে রাখা ভালো। এতে বুরাকুদের লজ্জার কিছু নেই। তিনি কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন তাঁর গ্রন্থে যা আধুনিককালে ঘটিত।

যেমন 'কেগারে', শিন্তো ধর্ম থেকে উদ্ভূত এই শব্দের অর্থ হচ্ছে অপরিষ্কার, অশুচি, অপবিত্র। এই বৈষম্যমূলক ধারণার শিকারই হয়েছে শত শত বছর ধরে 'ছেনমিন'রা। অর্থাৎ যাঁরা দরিদ্র এবং সমাজের তথাকথিত নোংরা, অসুন্দর, অপরিষ্কার ও বিপদজনক কর্ম সম্পাদনকারী মানুষজন। তাঁরা ছিলেন এক কথায় অস্পৃশ্য, যে কারণে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা, খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক বন্ধন, বিবাহ-সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল 'কিজোকু' ও 'হেইমিন'দের জন্য। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এটাই যে, অনেক ক্ষেত্রে নারীও সরাসরি 'কেগারে'র শিকার হয়েছেন! নারীকে মনে করা হত এবং এখনো মনে করা হয় 'কেগারে' অর্থাৎ 'অশুচি', 'অপবিত্র'। এই ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে ভারতীয় বর্ণপ্রথা ও কুসংস্কারের চেয়ে জাপানিরা আরও এক ধাপ উপরে। এই সম্পর্কে কাওয়ামোতো মহাশয় দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে, জাপানের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া 'সুমো' সম্পর্কে। সুমোতোরি বা সুমো খেলোয়াড় যখন 'য়োকোজুনা' বা 'ওজেকি' ইত্যাদি সম্মানীত খেতাবে ভূষিত হন তখন মঞ্চে ঐতিহ্যগত আচারানুষ্ঠান করা হয়, তখন সেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ! কেননা মেয়েরা হচ্ছে 'কেগারে' অর্থাৎ 'অপবিত্র'! কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস সে মঞ্চে উঠলে সুমোর ঐতিহ্যটাই অপবিত্র, নোংরা হয়ে যাবে! সুমো খেলোয়াড় সেই খেতাব গ্রহণকালে

বলেন, "এই খেতাব যাতে অপবিত্র না হয় তার জন্য যত্নবান হব।" যুগের পর যুগ ধরে মেয়েদের বিরুদ্ধে এই বৈষম্য জাপানি সমাজে চলে আসছে। এবং এখনো তা বিদ্যমান। "বিদেশী মেয়েদেরকে তাহলে জাপানিরা কী মনে করেন কে জানে?"---মন্তব্য করেছিলেন জনৈক থাই নাগরিক। নাকি শুধু জাপানি মেয়েরাই অপবিত্র? বলাবাহুল্য, অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় জাপানে নারীসমাজের অধিকার ও অবস্থান আদৌ সন্তোষজনক নয়।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছে ১৯৯১ সালের দিকে, লেখকের ভাষ্য। হিরোশিমার এক মর্যাদাসম্পন্ন বৌদ্ধ মন্দির। সেখানে মঞ্চ বেঁধে উৎসব পালিত হচ্ছিল। অনেক পুরুষ ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে একজন নারী ক্যামেরাম্যানও মঞ্চে ওঠে ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ রব ওঠে যে, মঞ্চে মেয়ে উঠেছে ওকে নামিয়ে দাও! উৎসবীরা তাঁকে নামিয়ে দিলেন! কেউ কোন প্রতিবাদ করলেন না! আর ভদ্রমহিলা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না, কেন তাকে নামিয়ে দেয়া হল? কী তাঁর অপরাধ? কেননা সে তো সেভাবে মানুষ হয়নি, তাঁকে কেউ কোনদিন বলে দেয়নি যে মেয়েরা 'কেগারে'!

সমাজে ছেনমিন ও উঁচুশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এখনো কোন কোন পরিবারে তা ঘটে থাকে। ভারতীয়দের মতো জাপানেও 'বংশ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবাহের ক্ষেত্রে। দুটি পরিবারের কথা লেখক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। একটি পরিবারের মেয়ে বিয়ের আগেই তার ছেলে বন্ধু দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। মেয়ের মা জানতে পারে ছেলেটি বুরাকু মহল্লার ছেলে। তারপর থেকে প্রতিদিন মেয়েকে চাপ সৃষ্টি করা হত গর্ভপাত ঘটাতে। দীর্ঘদিন প্রচন্ড মানসিক চাপের মুখে পড়ে মেয়েটি সন্তান নষ্ট করতে বাধ্য হয়।

আরেকটি পরিবারের ঘটনা: মেয়েটি বুরাকু পরিবারের ছেলেকে বিয়ে করে। পিতা একটি বড় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ ম্যানেজার। মান-সম্মানের ভয়ে শেষ পর্যন্ত পিতা আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন। আরও একটি বৈষম্যমূলক ঘটনার কথা কাওয়ামোতো উল্লেখ করেছেন খ্যাতিমান পন্ডিত সুগিতা গেনপাকু সম্পর্কে। যিনি ১৭৭৪

সালে জাপানি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচিত 'শবব্যবচ্ছেদ' বিষয়ক ওলন্দাজ গ্রন্থের অনুবাদ করেন 'কাইতাই শিন্‌শো' নামে। এ ধরনের গ্রন্থ জাপানি ভাষায় প্রথম বিধায় সেই সময় এবং আধুনিককালেও স্মরণীয়। কিন্তু সেখানে জড়িত রয়েছে অনুবাদকের চরম অকৃতজ্ঞতা ও বুরাকুজনের প্রতি বৈষম্য। সুগিতা যখন মূল গ্রন্থটির অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেন তখন মানুষের শারীরিক গঠন প্রকৃতি নিজ চোখে দেখার সংকল্প করেন। স্বহস্তে শবব্যবচ্ছেদ করার মতো একজন চিকিৎসকও তৎকালে জাপানে ছিলেন না, তা তাঁর অনূদিত গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। তিনিও যে স্বহস্তে সেই কাজটি করেননি সে সম্পর্কে অনেকের মতো কাওয়ামোতো মহাশয়ও নিঃসংশয়। প্রকৃতপক্ষে, লাশ কাটা ঘরে তাঁকে ৭০ বছর বয়স্ক জনৈক বৃদ্ধ এক বয়স্ক মৃত মহিলার শব কেঁটে শিখিয়ে দেন মানব দেহের কোন্‌টা কি অস্থি, কি নাম, কোন জায়গায় অবস্থান ইত্যাদি খুঁটিনাটি সবকিছু। সুগিতা নিজের অনূদিত রচনার সঙ্গে সেগুলোর যথার্থতা যাচাই করে নেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সেই বৃদ্ধের নাম গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেননি, ধন্যবাদ দেয়া তো দূরে থাক। কারণ একটাই যে বৃদ্ধার পেশা ছিল মানুষের মৃতদেহ সৎকার সংক্রান্ত! আর এই কর্মটি যাঁরা সম্পাদন করতেন তাঁদের বলা হত 'এতা' আর 'এতা' মানেই বুরাকুমিনের কাজ। এইভাবে জাপানি সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সচেতনভাবেই স্বজাতির মানুষদের প্রতি অন্যায় করেছেন, প্রদর্শন করেছেন বৈষম্যমূলক আচরণ--লেখকের অভিমত।

রাজধানী টোকিয়োতে বুরাকু তথা দোওয়া-মোনদাই

এদো যুগের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শোওগুন-যোদ্ধা তোকুগাওয়া ইয়েয়াসু (১৫৪৩-১৫৫৬)। সুদীর্ঘ ২৬০ বছরব্যাপী বাকুফু বা সামুরাই রাজত্বের সূচনা করেন ১৬০৩ সালে 'এদো' বর্তমান টোকিয়োতে। এবং তার সময় থেকেই সামন্তবাদের সূচনা হয় জাপানের সমাজে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত আঞ্চলিক ১০,০০০ 'কোকু' তথা 'রাজ্য'কে তিনি একই শাসন ব্যবস্থার আওতায় সংগঠিত করে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। সুপ্রাচীন কাল থেকে রাষ্ট্রের শাসক সম্রাটের ক্ষমতা খর্ব করে যোদ্ধারা সামরিক শাসন

প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্বে কোন সম্রাট বা শোওগুনের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে শাসিত জাপানকে একত্রিত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। উক্ত দশ হাজার রাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলোর নাম দেয়া হয় 'হান্'। আর সরকারিভাবে 'এদো'র শাসনব্যবস্থার নামাকরণ করা হয় 'বাকুহান্'। তোকুগাওয়া ইয়েয়াসু প্রাচীন তিনটি শ্রেণীকে ভেঙ্গে নতুন করে চারটি শ্রেণী সৃষ্টি করেন। সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে শি-নো-কো-শো অর্থাৎ যোদ্ধা-কৃষক-কারিগর-বণিক। বণিক বা ব্যবসায়ী ছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক। এই শ্রেণীর পরে যাঁরা তাঁরাই 'এতা' ও 'হিনিন' শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ বুরাকুমিন। তাঁর শাসনামলেই প্রায় ২০০ বছরের জন্য জাপানকে নিষিদ্ধ-রাজ্যে পরিণত এবং খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

এদো যুগ (১৬০৩-১৮৬৮) জাপানি ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই যুগে অভ্যন্তরীণ কৃষিজাত ফলন এবং মৎস্য আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসায়ীরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং অর্থের যোগানও বৃদ্ধি পায়। সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও উন্নতির শিখরে আরোহণ করে এদো যুগ। বিশেষ করে ১৭ ও ১৮ শতাব্দীর দিকে 'গেনরোকু যুগ' নামে যে সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঘটে তার সূচনা এই সময় থেকে। শহরবাসীকে উৎসাহিত করা হয় নৃত্য-গীত-বাদ্য ও বিভিন্ন ক্রীড়া, বিনোদনমূলক কার্যক্রমে। 'কাবুকি'র সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। 'বুন্‌রাকু' নামক পুতুল নাচ্ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সুবিখ্যাত 'হাইজিন' বা 'হাইকু-কবি' মাৎসুও বাশোও তাঁর শ্রেষ্ঠ কিছু হাইকু এ সময়ে রচনা করেন। সুবিখ্যাত ছাপচিত্র কলা 'উকিয়োএ' এই সময়ের সৃষ্টি। তখনকার নামকরা শিল্পীরা ছিলেন ওতামারো, হোকুসাই এবং হিরোশিগে, শারাকু প্রমুখ। বলা যেতে পারে যে, বুরাকুদের সংস্কৃতিকে সামাজিকভাবে গ্রহণীয় করে তোলার পদক্ষেপ সামুরাইরা নিয়েছিলেন। এই সংস্কৃতিই হচ্ছে জাপানের প্রকৃত সংস্কৃতি। যা বর্তমানে বিলীয়মান মার্কিনী-য়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রবল প্রতাপের জোয়ারে।

এবার দেখা যেতে পারে এদো যুগে বুরাকুদের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল। তখন সারা দেশে ৫ হাজার ৩০০ এর বেশি বুরাকু আবাস-

স্থলের যে খবর পাওয়া যায় তা শুধুমাত্র 'এতা' সম্পর্কিত সংখ্যা বলেই মনে করা হয়ে থাকে। হিনিন বা অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের সংখ্যা জানা যায় না। তবে এদো যুগের মাঝামাঝি সময় থেকে বুরাকুমিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এই যুগে 'এতা' নামক বুরাকুমিনরা নিজভূমি ও বাসস্থান অধিগ্রহণের অধিকার পেয়েছিলেন এবং প্রাক-আধুনিক যুগেও তাঁদের অধিকার বলবৎ ছিল কিন্তু অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর কর্মজীবী 'হিনিন' নাগরিকদের সেসব মালিকানার অধিকার আইন দ্বারা রহিত করা হয়েছিল।

এদো যুগের 'এদো' শহর ছিল বর্তমান জাপান রেলওয়ে (JR) 'ইয়ামানোতে' লাইনের অভ্যন্তরভাগের সমান বিস্তৃত এবং পূর্বদিকে বর্ধিত। তখন শিনাগাওয়া, শিনজুকু ও ইকেবুকুরো শহরগুলো এদো বর্হিভূত ছিল। আসাকুসা, ফুকাগাওয়া প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে ছিল এদোর মূল আয়তন। এদো যুগের অষ্টম শোওগুন য়োশিমুনের সময়ে যে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় তাতে এদোর লোকসংখ্যা ১,০০০,০০০ জন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে শহরের অভিজাত বংশাদি, তাঁদের চাকরবাকর ও জরিপ চলাকালে ভূমিষ্ট শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নোহ্-অভিনেতা, সামুরাই কর্তৃক বেতনভুক্ত কর্মচারী, অনুগামী এবং ভিক্ষু, মঠবাসিনী, পর্বতবাসী তপস্বী, মন্দিরবাসী, অন্ধ, ভিক্ষুক, 'য়োশিওয়ারা' বা পতিতালয়ের কাউকেই জরিপের আওতায় আনা হয়নি। এছাড়াও এদোতে আগত হান্ বা আঞ্চলিক সামুরাইদের সহযোগী, প্রতিনিধি, কর্মচারী পাশাপাশি বুরাকুমিনদের এতা, হিনিন শ্রেণী প্রভৃতিকে গণনায় ধরা হয়নি। যদি ধরা হত তাহলে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার কথা। ফলে এদো তৎকালীন বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ শহরই হত বলে অনেকে মনে করেন।

অন্যান্য স্থানের মতো এদোতেও বুরাকুমিনকে একটি মহল্লায় আবদ্ধ করে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একে বলা হত 'তানজায়েমোননোনাই' (তানজায়েমোন তথা তানজায়ে তোরণ এর অভ্যন্তরীণ বৃত্তাবাস)। এদো তথা 'কানতো' অর্থাৎ 'দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে' আটটি 'তানজায়েমোননোনাই' ছিল। সেখানে ছেনমিন, হিনিন ও অন্যান্য

নিম্নবৃত্তের লোকজন অর্থাৎ বুরাকুমিন বসবাস করতেন এবং পেশা ছিল প্রধানত চামড়া, লৌহজাত যন্ত্রপাতি, পণ্য, বস্তুসামগ্রী, চোউচিন (কাগজের বাতি) তৈরি ও বিক্রি করা। অন্যান্য পেশার লোকজনও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর পাশাপাশি শহরের পরিবেশ ও শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করতে হত তাঁদের। তানজায়েমোনের অধীনে এদোর 'গেইজিন' 'গেইনোজিন' অর্থাৎ 'চিত্তমনোরঞ্জনকারী'ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে বানর দিয়ে খেলা প্রদর্শনকারী, কাবুকি অভিনেতা, এদো মানজাই বা কৌতুকশিল্পী, জোরুরি বা পুতুল নাচ্ প্রভৃতি পেশার লোক। এই সকল নিবাসগুলোকে একজন তানজায়েমোন 'তোও' বা 'প্রধান' নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর অধীনে একজন সহযোগী থাকতেন। এদো প্রশাসন তানজায়েমোনদেরকে বুরাকুদের নিয়ন্ত্রণ, শাসন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। শহরের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবেও দায়িত্ব গ্রহণের অধিকারী হতে পেরেছিলেন তাঁরা। ত্রয়োদশতম তানজায়েমোন ছিলেন শেষ ব্যক্তি।

এদো যুগের শেষ দিকে রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রায়শ বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। এই বিক্ষোভের মধ্যে 'বুশুহানা ওসোদো', 'শিবুজোমেইক্কি' অন্যতম। বুরাকুমিনদের কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত। 'বুশুহানা ওসোদো' বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৪৩ সালে মুসাস্শিকুনি অঞ্চলে একজন বুরাকুমিন কাঠের খড়ম 'হানাও' বিক্রি করতে গেলে বাজারের খুচরা বিক্রেতা ও অন্যান্য ক্রেতাদের মধ্যে কে কত সস্তায় তা ক্রয় করতে পারে এই নিয়ে বাদানুবাদের সূচনা হয়। মূলত 'হানাও' তদাঞ্চলের কৃষিজীবীরা অতিরিক্ত বাণিজ্যপণ্য হিসেবে তৈরি করতেন। সেগুলো বুরাকুমিনরা কিনে বাজারে 'তোনইয়া' বা 'পাইকারী ব্যবসায়ী'-দের কাছে বিক্রি করে অর্থ আয়ের অবলম্বন হিসেবে নিয়েছিলেন। পরে জনসাধারণ ও বুরাকুদের প্রতিবাদে বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনিশ্চয়তা অনুভব করে গ্রামের নেতৃবৃন্দ ও তোনইয়ারা শোওগুনের কাছে আবেদন করেন। ফলে বুরাকুমিন ও কৃষকদের মধ্যে লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়। সমাধানের লক্ষণ না দেখে গ্রামের মানুষ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। এ সমস্যা আপাতত সমাধান করা হলেও পরে সরকার এই

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মূল হোতাদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। অপরাধীরা কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

'শিবুজোমেইক্কি' আন্দোলন ১৮৫৬ সালের ঘটনা। ওকাইয়ামা-হান্ সামন্ত অঞ্চলে সামাজিক বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বুরাকুমিনরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ওকাইয়ামা-হান্ প্রশাসন সমাজে পদমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকদের মর্যাদার উন্নতিকল্পে ২৯টি প্রস্তাব কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। তার মধ্যে পাঁচটি ছিল বুরাকুমিনদের প্রতিকূলে। যেমন রুক্ষ ও উগ্র পোশাক না পরা, ক্রেস্ট না ব্যবহার করা, ছাতা ও খড়ম ব্যবহার না করা, কৃষকদের সঙ্গে দেখা হলে খালি পায়ে সম্ভাষণ করা ইত্যাদি। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি এই হস্তক্ষেপের কারণে হানের কার্যালয়ে ৫৩ জন বুরাকুমিন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মিলিত হন এবং হান-প্রশাসনের আপত্তিকর প্রস্তাবগুলো গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন। আবেদনপত্র লিখে হান্-প্রশাসনের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের কাছে এ প্রস্তাব-গুলো বাস্তবায়ন না করার জন্য জোর আবেদন রাখেন। ফলস্বরূপ আপত্তিকর প্রস্তাবসমূহ বাতিল এবং দুপক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

১৯৬৮ সালে যখন মেইজি যুগের সূচনা হয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সামুরাইদের হাত থেকে সম্রাট মেইজির হাতে চলে আসে তাঁর সরকার দেশকে দ্রুত সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরণে উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যের মুক্তচিন্তা, পুঁজিবাদের উদ্বোধন এবং মানবাধিকার উন্নয়নকল্পে নতুন বিপ্লবের দিগন্ত উন্মোচন করা হয়। এটাই 'মেইজিইশিন' বা 'মেইজি সংস্কার' নামে ইতিহাসে খ্যাত। দেশকে সভ্যতার পথে প্রতিযোগী করে তোলার লক্ষ্যে সামন্তপ্রথা বিলুপ্ত করা হয়। ফলে কর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে চাকরী, পেশার পরিবর্তন, যত্রতত্র বসবাসের অধিকার আইনানুগ স্বীকৃতি লাভ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি জোর গুরুত্ব আরোপ করে সরকার। ১৮৬৯ সালে সরকার রাষ্ট্র থেকে সকল প্রকার শ্রেণীগত বৈষম্য, বিদ্বেষ, সামন্তবাদী শাসন, নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত করার সংকল্পে একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে। সেটাই দুবছর পরে ১৮৭১ সালে 'কাইহোরেই' অর্থাৎ 'মুক্তিসনদ' নামে ঘোষণা করা হয়। যার ফলে সকল

প্রকার বৈষম্য দূর হয় আইনের মাধ্যমে। নারী ও পুরুষ সমানভাবে কর্ম, ব্যবসা ও শিক্ষাগ্রহণকল্পে এই প্রথম স্বাধীনতা লাভ করেন। তবে বলাবহুল্য তা বাহ্যত। বৈধভাবে সামাজিক বৈষম্য নিরোধ হলেও সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই তার বীজ থেকে যায়। সেই বীজ উৎপাটনের লক্ষ্যে শুরু হয় বিভিন্ন বৈষম্য দূরীকরণ আন্দোলন।

১৮৭৪ অর্থাৎ মেইজি ৭ সাল থেকে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন। সকল নাগরিকের সাথে বুরাকুমিনরাও নতুন উদ্যমে এই আন্দোলনের শরীক হন। আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। টোকিয়ো, কানাগাওয়া, ওকুতামা অঞ্চলে খ্রীস্টান ধর্মের অনুপ্রবেশ আন্দোলনকে আরও গতিশীল করে তুলে। ১৯০২ বা মেইজি ৩৫ সালে ওকাইয়ামা-জেলায় 'বিসাকু হেইমিন কাই' সংগঠন উদ্বোধনের পরের বছর সারাদেশব্যাপী 'দাইনিপ্পন দোহোফুওয়া কাই' সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বুরাকুমিন দলগুলো বৈষম্যের মূল কারণ বুরাকুমিনের জীবনজীবিকার মধ্যে রয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। সেই সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন সাধন করার জন্যেই মূলত দাইনিপ্পন দোহোফুওয়া কাই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বরাকুউন্নয়ন আন্দোলনকারীরা বৈষম্যের মূল উপাদান নিজেদের মধ্যে নিহিত রয়েছে বলে স্বীকার করার ফলে বৈষম্য সম্পর্কে জনসাধারণের 'অজ্ঞানতা'কে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে তুলে ধরার ইচ্ছে এতদিন বুরাকুমিন আন্দোলনের ছিল না এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ আন্দোলনটা চালিয়ে যাওয়াটা নিজেদের ওপরই আরোপিত হয়।

মেইজি যুগের পরে আসে তাইশো যুগ (১৯১২-১৯২৬)। ক্ষণকালীন সময়ের এই যুগটা ছিল জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন আর সামাজিক আলোড়নের যুগ। মেইজি যুগের স্বাধিকার আন্দোলন তাইশো যুগে এসে 'তাইশো ডেমোক্রেসী' আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের পেছনে একাধিক ঘটনার প্রভাব কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অভাব, অনটন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বমুখী গতি, সোভিয়েত বিপ্লব (১৯১৭) এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। ফলে জাপানের অভ্যন্তরে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সমাজ বদলের

একাধিক বিচ্ছিন্ন আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উস্‌কে দেয়। ১৯১৮ সালে সারা দেশব্যাপী পালিত হয় 'চাউল আন্দোলন'। এসব আন্দোলনে বুরাকুমিনরাও অংশগ্রহণ করেন। এই সকল আন্দোলনের মুখে সরকারি কর্তৃত্ব আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ১৯২০ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমাজ বিষয়ক একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধিকরণ, গণসম্মিলন কর্মসূচীকে জোরদার করার লক্ষ্যে মুক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। এই উত্তরণ বুরাকুমিন মুক্তি আন্দোলনকেও প্রভাবিত করে।

১৯২২ অর্থাৎ তাইশো ৩ সালের ৩ তারিখে 'জেন্‌কোকু সুইহেইশা' অর্থাৎ 'নিখিল সাম্যসমাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নেতৃত্ব দেন মাৎসুমোতো জিইচিরো। সারা দেশ থেকে আগত ৩,০০০ বুরাকুমিন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। 'সুইহেইশা ছেনগেন' (Levelers Declaration) বা 'সাম্যবাদী সমাজের ঘোষণাপত্রে'র প্রথমেই সারা দেশব্যাপী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য বুরাকুমিনকে মূল জনসংখ্যার সঙ্গে মিলে একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। 'ভাই' হিসেবে সম্বোধন করে অতীতের সংঘটিত অপরাধ, অত্যাচার এবং ভুলভ্রান্তির কথাও অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে নেয়া হয়। বলা হয়ে থাকে যে, এই 'সুইহেইশা ছেনগেন' জাপানে ঘোষিত সর্বপ্রথম মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা। ঐতিহাসিক ঘোষণাটি নিম্নরূপ ঃ

Declaration

Tokushu Burakumin throughout the country: Unite!

Long-suffering brothers! Over the past half century, the movements on our behalf by so many people and in such varied ways have yielded no appreciable results. This failure is the punishment we have incurred for permitting ourselves as well as others to debase our own human dignity. Previous movements, though seemingly motivated by compassion, actually corrupted many of our brothers. Thus, it is imperative

that we now organize a new collective movement to emancipate ourselves by promoting respect for human dignity.

Brothers! Our ancestors pursued and practiced freedom and equality. They were the victims of base, contemptible class policies and they were the manly martyrs of industry. As a reward for skinning animals, they were stripped of their own living flesh; in return for tearing out the hearts of animals, their own warm human hearts were ripped apart. They were even spat upon with ridicule. Yet, all through these cursed nightmares, their human pride ran deep in their blood. Now, the time has come when we human beings, pulsing with this blood, are soon to regain our divine dignity.The time has come for the victims to throw off their stigma. The time has come for the blessing of the martyrs' crown of thorns.

The time has come when we can be proud of being Eta.

We must never again shame our ancestors and profane humanity through servile words and cowardly deeds. We, who know just how cold human society can be, who know what it is to be pitied, do fervently seek and adore the warmth and light of human life from deep within our hearts.

Thus is the Suiheisha born.

Let there be warmth in human society, let there be light in all human beings.

March 3, 1922 The Suiheisha

রাজধানী টোকিয়োতে বুরাকুর অবস্থান

রাজধানী মহানগর টোকিয়ো প্রাক্তন এদো, যেখানে প্রাক-আধুনিক-কাল অর্থাৎ মেইজি যুগে (১৮৬৮-১৯১২) রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই

মানুষ রাজধানীতে আসা শুরু করে। আগেই বলেছি টোকিয়োতেও অতীতকাল থেকেই বুরাকুদের অবস্থান ছিল। ১৮৭১ সালের প্রশাসনিক সংস্কারের পর বুরাকুমিনরা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ করার অনুমতি লাভ করেন। এই মুক্তিদশা এবং ১৯২৩ সালের 'কানতো দাইজিশিন' বা 'দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মহাভূমিকম্পে'র পরে সামাজিক বৈষম্য ভেদাভেদ বিলুপ্ত হয়ে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং রাষ্ট্রীয় নীতিতে বৈষম্য এখনো বিদ্যমান বলে শিক্ষিত, সচেতন জাপানিরাই বলাবলি করে থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্যই পূর্বের মতো কার্যকরী নয় ঠিকই, কিন্তু নতুন নতুন বৈষম্য, মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা নীরবে অদৃশ্যভাবে ঘটছে।

'শিন্‌জিন্‌রুই' তথা 'নতুন বংশধর' বলে পরিচিত বর্তমান তরুণ প্রজন্ম 'দেওয়া-মোনদাই' সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞাত। উল্লেখ্য যে, তাইশো যুগের পরে ১৯২৬ সালে শোওয়া সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের আনুষ্ঠানিক দিবস থেকে 'বুরাকুমিন সমস্যা'র নাম বদলে রাখা হয় 'দোওয়া মোনদাই'। সাধারণ মানুষ ঘুণাক্ষরেও এ নিয়ে আলোচনা করতে রাজি নন। এ যেন ঘুমন্ত শিশু তাকে জাগালে পরে ঝামেলা পোহাতে হবে, বরং তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দাও। এই নীতি গ্রহণ করেছেন যুগপৎ সরকার এবং জনগণ। কিন্তু প্রতি বছর সরকারি ঘোষণাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, বুরাকুমিন সমস্যা ওরফে দোওয়া-মোনদাই মিলিয়ে যায়নি। এই শ্রেণী বৈষম্য এখনো চাকরী, বিবাহ, বংশ পরিচয়, জাপানকে আন্তর্জাতিকরণ ক্ষেত্রে দাঁত বের করে হাসছে বলে এক দল বুদ্ধিজীবী মনে করেন। মনে করেন কোন কোন রাজনীতিবিদও। সরকারি এক জরিপ থেকে জানা যায় যে, ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বুরাকু অঞ্চল, তাঁদের নাম, ঠিকানা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত নয় প্রকারের 'বুরাকু তথ্যপঞ্জিকা' সরকারের হস্তগত হয়। এবং এই তথ্যপঞ্জিকাগুলো সারা দেশের ২০০টি কোম্পানি ক্রয় করে বুরাকুমিনদের কর্মনিয়োগ থেকে বিরত রাখার জন্য। টোকিয়োতে ৫০টি কোম্পানিকে সরকার চিহ্নিত করে যারা এই প্রকাশনাগুলো সংগ্রহ করেছে। যা মানবাধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং

জাতীয় অপরাধ। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী বহু কোম্পানি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দোওয়াচিকুতে জন্ম গ্রহণকারী এমন ছাত্র-ছাত্রী বা নাগরিককে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরীতে নিয়োগ করে না। অনেক কোম্পানি নবীন কর্মচারীদেরকে জানিয়েও দেয়, দোওয়াচিকুর বংশধর হলে কোম্পানিতে স্থান নেই!

আরও অনেক কোম্পানি আছে যেখানে প্রার্থীর সাক্ষাৎগ্রহণকালে তার জন্মস্থান, পিতা-মাতার পরিচয়-তাদের জন্ম, পেশা ইত্যাদি অহেতুক জিজ্ঞেস করে থাকে। এমনকি স্বামী প্রার্থী হলে স্ত্রীর জন্মস্থান, পেশা; আর স্ত্রী চাকরী প্রার্থী হলে স্বামীর জন্মস্থান, পেশা, বংশ পরিচয় ইত্যাদি অনাবশ্যক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে যাচাই করে নেয় প্রার্থী দোওয়াচিকুর নাগরিকের 'রক্ত' বহনকারী কিনা!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বাঙালির ভাষ্য, "জাপানিরা ভয় পান রক্তের ধারাকে। দোওয়াচিকুর অধিবাসী বলি, বুরাকুমিন বলি বা বিদেশী বলি জাপানিরা তাঁদের রক্তকে ভয় পান বলে মনে হয়। যদি সেই তথাকথিত দূষিত রক্ত তাঁদের রক্তে মিশে যায় তাহলে তো তাঁরা 'কেগারে' অর্থাৎ 'অশুচি', 'অপবিত্র' হয়ে যাবেন!" তিনি আরও বললেন, "তবে সকলে একরকম নন, যুগের পরিবর্তনে প্রাচীন পন্থী জাপানিরাও বদলাচ্ছেন। এ প্রজন্মের জাপান প্রবাসী বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি শ্রমিক জাপানি মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্বশুর-শাশুড়ির অন্তরে প্রবেশ করতে পারছেন না বহু বছর ধরে। কারণ ঐ দূষিত রক্তের ভয়। যদিওবা খারাপ মানুষের ক্ষেত্রে রক্তের ধারা দায়ী নয়, দায়ী পরিবেশ, অনৈতিক শোষণ-শাসন, কান্ডজ্ঞানহীনতা। এই ক্ষেত্রে শিক্ষিত জাপানিদের সচেতনতার অভাব রয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। যতই আধুনিক বা ধনী হোক না কেন জাপান যে এখনো অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন কুসংস্কার বহন করছে তাতে বিস্মিত না হয়ে পারি না!"

পরিশেষে বলব, জাপানের তথাকথিত 'বুরাকুমিন' তথা 'দোওয়া মোনদাই' জাপানি ধর্মীয় পবিত্রতা বা রীতিনীতির ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট এক মনোবৈকল্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যার সঙ্গে গোষ্ঠীবাদী সংকীর্ণমনা অহংবোধ এবং অর্থনৈতিক শোষণ-চিন্তাও বিজড়িত। যার কোন প্রকার

চিকিৎসা নেই কোন গ্রন্থে। ভারতের অচ্ছ্যুৎ, অস্পৃশ্য বা তথাকথিত 'দলিত'ও একই সূত্রে বাঁধা। যতই তাঁদেরকে শিক্ষায়-দীক্ষায় আধুনিক করা হোক না কেন সমাজের বৃহত্তর প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর ব্যধি তো মানসিক এবং বংশগত। সেখানে প্রবেশের অধিকার দেখালেই দৈহিক বা স্নায়ুসংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবেই।

....

তথ্যসূত্রঃ
প্রবন্ধঃ
১. কাওয়ামোতো যোশিকাজু
২. তাকায়ানাগি কনেয়োশি
৩. হোনদা যুতাকা
৪. অ্যাডউইন অ রাইশাওয়ার
৫. সুতো ইসাও।
৬. পত্রিকাঃ ডেইলি য়োমিউরি; জাপান টাইমস; টাইম
৭. সাময়িকীঃ আসাহি হিয়াক্কা (বিলুপ্ত)
৮. সরকারী প্রচারপত্র ও সেমিনাব

....

* ১৯৯৯ সালে মাসিক 'মানচিত্রে' প্রকাশিত
* আলোকচিত্রঃ টোকিয়ো মেট্রোপলিটান দপ্তর; ফুকাগাওয়া জাদুঘরের সৌজন্যে

জাপান:
ভিন্ন চোখে
দেখা
জাপান সরকার একদিকে এইসব বিদেশী
শ্রমিকদের 'মানবাধিকারকে' ীকার করবে
অন্যদিকে তথাকথিত 'আন্ত কতাবাদে
জন্য কোটি কোটি ইয়েন ব্য
তো কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে
হলে কি এই শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক সমাজের
বাইরের মানুষ?

জাপানঃ ভিন্ন চোখে দেখা

জা জাপানকে বলা হয়ে থাকে এশিয়ার আমেরিকা! কিন্তু জাপানিরা কি আমেরিকান? অবশ্যই না। তবে সাধারণ জাপানিরা বাহ্যিক চাল, চলন, ফ্যাশন, যান্ত্রিক আর স্থূল জীবনযাত্রার দিক দিয়ে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গেছেন। বড় বড় ব্যবসায়ীরা আমেরিকা বলতে বিগলিত তবে মানসিকভাবে তাঁরা রক্ষণশীল, অনেকে আবার কড়া 'ন্যাশনালিস্ট'! রাজনীতিকদের একটি দল যুদ্ধোত্তর সময় থেকেই মার্কিনপন্থী, আরেক দল গোঁড়া জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আমেরিকাকে তাঁরা প্রতিপক্ষ হিসেবেই মনে মনে ভেবে থাকেন তবে সহজে প্রকাশ করেন না। তবে মাঝেমাঝে কেউ কেউ বেফাঁস উক্তি ছুঁড়ে দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দেন সজ্ঞানেই। ধুরন্ধর লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (LDP)-র সদস্য অধিকাংশই কট্টোর 'ন্যাশনালিস্ট' বলে কথিত। কিন্তু তাঁদের 'ন্যাশনালিজমটা' বোঝা মুশকিল। শুধু ন্যাশনালিজমই নয়, তাঁদের জাতীয় সত্ত্বাটাই অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন, অবোধ্য।

আমেরিকা অথবা য়োরোপের চরিত্র অতি স্পষ্ট এবং আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু জাপানের চরিত্রটা যে কী সেটা সত্যিই বুঝে ওঠা কঠিন। জাপানিদের চিন্তা এবং কর্মকান্ডই তাঁদের চারিত্রিক জটিলতার মূল কারণ। যেমন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কোইজুমির কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়। তিনি একজন খ্যাতিমান 'ন্যাশনালিস্ট' তাতে কারও মনে সন্দেহ থাকার কথা নয়। বহু চিন্তা-ভাবনা এবং কালক্ষেপণের পর কোইজুমি মনোস্থির করেছেন এসডিএফ (সেলফ ডিফেন্স ফোর্স, আসলে জাপানি সেনাবাহিনী)কে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাক পুনর্গঠনের কাজে পাঠানোর বিষয়ে। কিন্তু তিনিই যখন স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন (১৯৮৮, ১৯৯৬-৯৭) বিদেশে সেনাবাহিনী পাঠানোর বিরুদ্ধে একপায়ে খাঁড়া ছিলেন। তবে এখন কেন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন? এর একটি উত্তর হতে পারে এই যে, সন্ত্রাসবাদ দূরীকরণে আন্তর্জাতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে জাপানকে একাত্ম করা। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সহযোগী হওয়া। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যিই কি জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী মনোভাবাপন্ন দেশ? না ছিল কোনকালে? তার অতীত এবং বর্তমান কর্মকান্ড তো তা প্রমাণ করে না। বহু জ্ঞানীগুণী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন জাপানির 'চিন্তাধারা' বলে,

জাপান এশিয়ার কোন 'দেশ' নয়! তাহলে কোন্ মহাদেশের? তাঁরা জাপানকে য়োরোপীয় ভূখন্ডভুক্ত একটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান! কেননা ধনী রাষ্ট্রের লক্ষণানুসারে জাপান 'দরিদ্র এশিয়া'র সদস্য-রাষ্ট্র হয় কিভাবে? তাঁরা মূলত ইউকিচি ফুকুজাওয়ার (১৮৩৫-১৯০১) অনুসারী। তিনি ছিলেন আধুনিক জাপানের অন্যতম প্রধান স্বপ্নদ্রষ্টা, শিল্পোদ্যোগী, পাশ্চাত্যবাদী শিক্ষাবিদ এবং সুবিখ্যাত কেইয়ো গিজুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মনে করতেন ভবিষ্যৎ জাপানের উচিত হবে এশিয়ার আদর্শকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের আদর্শ ও কর্মপন্থাকে অনুসরণ করা। সে কারণে নাহলেও জাপান আধুনিক য়োরোপের বিদ্যা ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ ও যথার্থভাবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে 'সাম্রাজ্যবাদী' হয়ে উঠেছিল। একশ-দেড়শ বছর আগেই জাপান এশিয়ার প্রথম সামরিক শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রে উন্নীত হয়। এবং সেই থেকেই জাপানিরা চালচলনে, ফ্যাশনে, প্যাশনে ক্রমে ক্রমে য়োরোপীয় বনে যেতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে এই উপসর্গের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দিক দিয়েও শ্বেতাঙ্গ য়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্ধ অনুসারী হিসেবে তাঁদের সঙ্গেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের পর ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত মার্কিনী উঠতি প্রযুক্তিকে আত্মসাৎ করে ক্রমাগত বিদেশী পণ্যের কপি, অদলবদল, পরিশোধন এবং সংযোজনের মাধ্যমে তথাকথিত 'ইলেক-ট্রোনিক্স ইম্পেরিয়ালিস্ট' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একতরফাভাবে মার্কিনী ও য়োরোপীয় সংস্কৃতি আমদানি করার মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে জাপান এশিয়া থেকে। সুদীর্ঘকাল এশিয়াকে হতে হয়েছে জাপানি বড় বড় শিল্পকারখানাগুলোর কাঁচামালের যোগানদার।

অবশ্য যখনই জাপান আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে তখন এশিয়ার দিকে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর আধ্যাত্মিক ও শিক্ষামূলক সমৃদ্ধি অর্জন করার জন্য হাত বাড়িয়েছিল ভারতের দিকে। ভারতীয় আদর্শ হয়ে উঠেছিল তার একমাত্র আরাধ্য বিষয়। কিন্তু যেই জাপান সত্তর দশকের দিকে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করা শুরু করল ছুটল আমেরিকা ও য়োরোপের পেছনে এশিয়াকে

ফেলে। আবার গত দেড় দশক ধরে ঘাড় ফেরাতে শুরু করেছে এশিয়ার দিকে। অর্থবিনিয়োগ, কলকারখানা স্থানান্তর এবং মালামাল বিক্রির বিষয়ে নতুন নতুন চুক্তি সম্পাদন করছে। কেননা জাপানি পণ্যসামগ্রী এখন মার্কিনী ও য়োরোপীয় বাজার দখলে রাখতে পারছে না। স্বদেশের অভ্যন্তরে শ্রমমূল্য অত্যধিক বিধায় এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সস্তা শ্রমবাজারকে লক্ষ্য করেছে। এখানে যে স্বার্থপরতার কোন লক্ষণ নেই একথা বলা যাবে না। বস্তুত জাপান নিজের স্বার্থ সম্পর্কে বরাবরই সজাগ, সচেতন এবং একগুঁয়ে। এর জন্য সংবিধানকে অস্বীকার কিংবা হিরোশিমা এবং নাগাসাকির মতো দুটি বৃহৎ ঘটনাকে বিস্মৃত হতে দ্বিধান্বিত হয়নি, অতীতেও নয়।

জাপান কি শান্তিবাদী রাষ্ট্র?

বলা হয়ে থাকে জাপানের সংবিধান হচ্ছে যুদ্ধবিরোধী, শান্তিবাদী। অর্থাৎ জাপান কোন প্রকার মারণাস্ত্র তৈরি করবে না, কোন যুদ্ধেই জড়াবে না, সেনাবাহিনীও দেশের বাইরে পাঠাবে না। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধে জাপান প্রচুর অর্থ যুগিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাকের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানে সমর্থন দিয়ে। জাপান যতই আমেরিকার মিত্র হোক না কেন এই প্রকাশ্য সমর্থন সাংবিধানিক বিধিবিধানকেই লংঘন করেছে। আন্তর্জাতিক মহলেও সমালোচিত হতে হয়েছে তার জন্য। এই ঘটনা নিয়ে জাপানের অভ্যন্তরে খুব একটা প্রতিবাদ বা উচ্চবাক্য ওঠেনি জনগণ কিংবা গণমাধ্যম থেকে।

এবারও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ইরাকে সেনা বাহিনী প্রেরণ নিয়ে তেমন কোন জোরালো বাদ-প্রতিবাদ ওঠেনি। বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আহুত মিছিল এবং বিক্ষোভে বৃদ্ধ নাগরিকদেরকেই অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। বৃহত্তর সচল কর্মজীবী জনগোষ্ঠী প্রতিবাদহীন ছিল বললেই চলে। বরং গণমাধ্যমগুলো ছিল কিছুটা সরব সমর্থক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদর্শন এবং সন্ত্রাসবাদ দূরীকরণে জাপানের এই ভূমিকায়। দুজন কূটনীতিককে ইরাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছিল। হুমকি প্রদান করা হয়েছিল যদি জাপান সেনাবাহিনী ইরাকে প্রেরণ করে তাহলে

টোকিয়ো আক্রমণের শিকার হবে! এটা যে জাপান বোঝেনি তা নয়, কিন্তু 'সানফ্রান্সিসকো মৈত্রীচুক্তি' (১৯৫২) অনুসারে আমেরিকাকে সমর্থন না করে উপায় কি? তাহলে দেখা যাচ্ছে পবিত্র সংবিধানের চেয়ে আমেরিকাই বড়! মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সংবিধান কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশেই তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। কাজেই ধরে নিতে হচ্ছে যে "আসলে জাপান যখন-তখন মার্কিনীদের সুবিধেমতো ব্যবহৃত হচ্ছে"--জনৈক বিদেশীর মন্তব্য। অর্থাৎ আমেরিকার কথা শুনতে বাধ্য হচ্ছে।

অবশ্য এটা বলা অন্যায় হবে না যে, শতভাগ জাপানিরাই প্রতিবাদ-হীন কিংবা মার্কিনপন্থী। এদেশেও রাজনীতি সচেতন, আন্তর্জাতিকতা-বাদে বিশ্বাসী, বিশ্বজনীনতায় আত্মত্যাগী, এশিয়ার প্রতি দরদী জাপানি নাগরিক ছিলেন এবং আছেন। তবে সংখ্যায় তাঁরা নগন্য। অতীতেও তাঁরা সেই ভূমিকা রেখেছেন। যেমন ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় জাপানেও নাগরিক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের আরোপিত 'এপার্টহেইট' নীতির বিরুদ্ধে সক্রীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন একাংশ নাগরিক। কিন্তু জনসাধারণের অধিংকাংশই ছিলেন নীরব, আর সরকার পালন করেছে দ্বৈত ভূমিকা। এবারও ইরাকে মার্কিনী হামলার বিরুদ্ধে সেই একাংশ নাগরিকই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আর জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 'শিগোতো' (চাকরী) নিয়েই ব্যস্ত। তরুণ সমাজ 'মোবাইল ফোন', 'ফ্যাশন-কুশন' আর 'মানগা' (কমিকস) নিয়ে এ্যাতই উন্মত্ত যে বিশ্বকে নিয়ে ভাবার সময় কোথায় তাদের? বস্তুত জাপানিরা নিজেদের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকেই যেন একটু বেশি বড় করে দেখতে ভালবাসেন। যে কারণে 'স্বার্থপর' বলেও অনেকে সমালোচনা করে থাকেন। বিশেষ করে সরকারি উন্নয়ন সাহায্য (ODA) প্রদানের ক্ষেত্রে তো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কে কি বলল এতে তাঁদের কিছু যায় আসে বলে মনে হয় না।

অনেকেই বলে থাকেন, সাধারণ মানুষের কোন দোষ নেই। ধুরন্ধর, ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিক আর ব্যবসায়ীদের আরোপিত নানান 'সিস্টেম' এবং নানাবিধ 'ট্যাক্স' এর পিঞ্জরে বন্দী এই দেশের মানুষ। অন্ততঃপক্ষে

মেইজি যুগ (১৮৬৮-১৯১২) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনীতিকরা রাজদণ্ডের অধিকারী। জাপানকে গণতান্ত্রিক বা বাহ্যত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে মনে হলেও সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত তাঁদের হাতেই। তাঁরা ভীষণ সুযোগসন্ধানী এবং হিসেবী। সেই মেইজি যুগ থেকে তাঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আসছেন। একতরফাভাবে নিয়েছেন বিদেশী সভ্যতা থেকে ধর্ম, বিদ্যা, কারিগরি এবং সংস্কৃতি। ফলে যতখানি আন্তর্জাতিক এবং শান্তিবাদী হওয়ার কথা ছিল তাঁদের তা তাঁরা অর্জন করতে পারেননি, বলা যায় সেই চেষ্টাই করেননি আর করার ইচ্ছে আছে বলেও মনে হয় না। তাঁরাই জাপানকে অর্থশালী করেছেন মূলত ছলে-বলে-কৌশলে। যুদ্ধে পরাজিত শান্তিকামী, প্রগতিবাদী, শান্তিবাদী ছদ্মবেশের আড়ালে জাপান বারংবার সংবিধান লংঘন করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে প্রভূতভাবে, পাশাপাশি কলঙ্কিত করেছে পবিত্র সংবিধান। ইতিহাস এই কলঙ্কের সাক্ষী হয়ে আছে। বর্ণবৈষম্য, জাতিবিদ্বেষ, বিদেশীবিদ্বেষ এমনকি আপন জাতিবিদ্বেষ এবং নানান অমানবিক অসঙ্গতির কারণে জাপান কম সমালোচিত নয় বিশ্বব্যাপী। যার অনেক কিছুই আমরা জানি না।

আমরা অনেকেই জানি না যে, জাপান ধনী হয়েছে কিভাবে? তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের অন্তরালে রয়েছে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের গুপ্ত ব্যবসা, অর্থের কারণে সজ্ঞানে মানবতাবাদকে পদদলিত করার ঘটনা এবং দুর্বল বিদেশী শ্রমিকদের শ্রমের অবমূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য।

অনেক বছর ধরে বিদেশীরা অভিযোগ করে আসছেন যে জাপানিরা জাতিবিদ্বেষী, বর্ণবিদ্বেষী এবং স্বার্থপর। বাস্তবে এই অভিযোগ তেমন গুরুতর না হলেও একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা যাবে না। সংক্ষিপ্তাকারে যে বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে তা পড়ে পাঠকবৃন্দ 'জাপান' নামক দেশটি সম্পর্কে প্রচলিত প্রতিকৃতির বাইরে ভিন্ন এক জাপান সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন বলে মনে করি। অবশ্য প্রাচ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এবং এশিয়ার প্রথম শিল্পোন্নত দেশটি সম্পর্কে জানার যেমন শেষ নেই তেমনি বিস্ময়েরও সীমা-পরিসীমা নেই।

জাপান ধনী হল কিভাবে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ আর ছাইভস্ম থেকে জাপান বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ, নানা ঘটনা। যুদ্ধ পরবর্তী মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বিজয়ী মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক নিষিদ্ধ জাপানের জাইবাৎসু (Financial Qliques) যেমন মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো এবং তাদের ঘিরে ইয়াসুদা, ওকুরা, ফুরুকাওয়া, কুহারা, সুজুকি, ফুজিতা, আসানো প্রভৃতি প্রভাবশালী পুঁজিবাদী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো নড়ে চড়ে ওঠে।

১৯৫০ সালে সংঘটিত হয় কোরিয়া যুদ্ধ, চলে '৫৩ সাল পর্যন্ত। এই যুদ্ধ জাপানের জন্য অপ্রত্যাশিত সুযোগ বয়ে আনে। বৃহৎ ও ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যুদ্ধাস্ত্র, মেশিনপত্র তৈরির ফরমায়েশ লাভ করে মার্কিন প্রশাসন থেকে বলে কথিত আছে (Also Japanesc economic growth received a strong boost from the Korean war as it produced munitions for the US war effort.)। অস্ত্র বিক্রির প্রচুর পরিমাণ ডলার এসে ঢোকে শূন্যপ্রায় জাপানি কোষাগারে। শুধুমাত্র গুণমানসম্পন্ন দৈনন্দিন পণ্যসামগ্রী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বা মোটর গাড়ি বিক্রি করেই জাপান ধনী হয়নি। এই সমস্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে আর সেটা অর্জনের জন্য সংবিধানবিরোধী নীতি গ্রহণ করতে হয় সুযোগ বুঝে এটা জাপান প্রমাণিত করেছে। অবশ্য বড় বড় শিল্পকারখানাগুলোতেও অঢেল ডলার বিনিয়োগ করেছেন যুদ্ধের পর মার্কিনী ব্যবসায়ীরা। উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল আমেরিকায় জাপানি পণ্যের বাজার। ফলে বিপুল বাণিজ্যিক ঘাটতি ছিল আমেরিকার সঙ্গে বহু বছর ধরে জাপানের। আমেরিকায় একতরফা রপ্তানির কারণে জাপানের অভ্যন্তরীণ বাজারও ক্রমশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। যা জন্ম দিয়েছিল 'দ্রুততর অর্থনৈতিক উন্নতি'র যুগকে যাকে অর্থনীতিবিদরা নামাকরণ করেছেন 'বাবল্ ইকোনোমি' বলে।

জাপানি অর্থনীতির 'বাবল্ যুগ' (১৯৬৫-১৯৮০) ছিল ইয়াকুজা বা জাপানি মাফিয়াদের পুনরুত্থানের যুগ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে উগ্র জাতীয়তাবাদী ইয়াকুজাদের ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। দেশ-বিদেশ

জুড়ে অস্ত্র, মাদক দ্রব্যের কালোবাজারি, ধোঁকাবাজি, জমি উন্নয়ন ও বিক্রি বা রিয়েল এস্টেট ব্যবসা প্রভৃতির মাধ্যমে অঢেল অর্থ সরকারি-বেসরকারি খাতে সংযুক্ত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে একাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনীতিক এবং সরকারের মন্ত্রীদের ছিল ঘনিষ্ঠ সংশ্রব। এখনো তার পরিবর্তন ঘটেনি। তবে কমবেশি সব দেশেই এমন ধারা আছে। উন্নয়নকামী দেশগুলোতে বরং আরও বেশি।

জাপানি মোটরগাড়ি ও বৈদ্যুতিক পণ্যসামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান-গুলোর গুপ্ত কারসাজি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গোপন সমঝোতা যাকে বলে 'কেইরেৎসু' বহির্বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সাধারণ পাঠক সেসব ইতিহাস জানেন না বললেই চলে। জাপানি পণ্যের সবচেয়ে বৃহৎ বাজার হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রশাসনকে ছলে-বলে-কৌশলে, বিপুল উৎকোচের বদৌলতে হাত করার নানা পন্থার কথা একাধিক বিদেশী লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। ৮০/৯০ এর দশকে জাপানবিরোধী সমালোচনামূলক (Japan Bashing) প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বিদেশী এবং জাপানি লেখক.গবেষকদের। অবশ্য তার মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যেমন জাপানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কুখ্যাত 'এপার্টহেইট' বা 'বর্ণবাদী বৈষম্য'। কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত আফ্রিকা থেকে কী পরিমাণ অর্থ ও খনিজ শক্তি লাভ করেছে দেশটি সে সম্পর্কে কোথাও লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এখানে মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে এটাও একটি। এবং এই বিষয়টি থেকেও জাপানি ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনীতিক এবং সরকারের প্রকৃত চরিত্র কী তা পাঠক চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

জাপান এবং এপার্টহেইট সম্পর্কে আলোচনা করার আগে সংক্ষিপ্ত অকারে 'এপার্টহেইট' সম্পর্কিত ঐতিহাসিক পটভূমিকা তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

এপার্টহেইট কী?

'এপার্টহেইট' শব্দটি আফ্রিকান্স্ (ওলন্দার্জ ভাষাজাত) ভাষার অন্ত-

র্গত একটি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে, বিচ্ছিন্নকরণ (Separation)। এই ভাষা হচ্ছে 'আফ্রিকানারস'দের। তাঁদের মূল পরিচিতি হচ্ছে, তাঁরা 'বোয়ার' গোত্রভুক্ত শ্বেতাঙ্গ। যাঁরা জাতিভেদ-বর্ণবাদকে বৃটিশদের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী করে 'এপার্টহেইট' পদ্ধতিতে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন। যে কারণে জাতিসংঘের বিশেষ পরিষদ ১৯৬২ সালের ৬ নভেম্বর তারিখে এই আইনকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য এবং ১৯৬৩ সালের ২রা এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় বোয়ার নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর অর্থনৈতিক এবং অস্ত্র সরবরাহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও জাতিকে এই জঘন্য অমানবিক আইনের বিরুদ্ধে ঐক্যমত প্রকাশের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্জন করার আহ্বান জানায়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গদের এপার্টহেইট বা জাতি-বিদ্বেষী শাসনকাল ৪৬ বছর বজায় ছিল (১৯৪৮-৯৪)। কিন্তু তার সূচনা হয়েছিল আরও বহু আগে।

মূলত দক্ষিণ আফ্রিকা দুটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি ভূখন্ড। একটি 'সান' (বুশম্যান), যারা বন্য শিকারি। অন্য দলটি 'খইখই', যাঁদের পেশা গবাদি পশুপালন এবং নিরন্তর স্থানপরিবর্তনশীল অর্থাৎ যাযাবর। প্রথম থেকে দশম খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর দিক থেকে আগত 'বানটু' কৃষিজীবী মানুষরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রমে ক্রমে সরে আসেন এবং উপরোক্ত গোষ্ঠী দুটির সঙ্গে যৌথভাবে বসবাস করতে থাকেন শান্তি-পূর্ণভাবে। ১৭ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করেই দক্ষিণ আফ্রিকার স্বচ্ছ নীল আকাশে কিছু লালমুখো আগন্তুক মেঘের চিহ্ন লক্ষ করেন স্থানীয়রা। এরা হচ্ছেন ওলন্দাজ বণিক। ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকপ্রধান জান ভ্যান রিবেক (Jan van Riebeeck) এর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম কেপ্ (W. Cape) শহরে প্রথম য়োরোপীয় তথা শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সংখ্যায় তারা তখন ছিলেন একশ জনেরও কম। তাদের সঙ্গে এসে আরও দুশো লালমুখো যোগ দেন এবং ক্রমে ক্রমে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে আত্মীয়তা স্থাপন করেন। তারা হলেন য়ুগুনো (Huguenot), ১৬-১৭ শতাব্দীর ফরাসী প্রোটেস্টান্ট। অধিকাংশই হচ্ছেন ফরাসী প্রোটেস্টান্ট ধর্মতাত্ত্বিক সংস্কারক জন্ ক্যাল্‌ভিন্ (১৫০৯-৬৪) এর

অনুসারী ক্যাল্‌ভিনিস্ট। যাঁরা ১৫৭২ সালে ক্যাথলিকপন্থী রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত 'সাধু বার্থোলোমিয়ু' গণহত্যাযজ্ঞের চরম শিকার। রাজনৈতিক ভগ্নাংশ হিসেবে তাঁরা ফরাসী ধর্মযুদ্ধের প্রধান প্রতিপক্ষ ক্যাথলিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। প্রলম্বিত এই দ্বন্দ্ব ১৫৯৮ সালের দিকে সাময়িকভাবে 'এডিক্ট অব নান্টিস্' সন্ধির মাধ্যমে রহিত হলে পরে যুগুনোরা উপাসনার স্বাধীনতা লাভ করেন। কিন্তু ফ্রান্সে পুনরায় ১৬২০ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তাঁদের রাজনৈতিক ভিত্ এবং সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেয় কার্ডিনাল রিশ্যুলুর সরকার। ১৬৮৫ সালে চর্তুদশ লুইস কর্তৃক 'এডিক্ট অব নান্টিস্' বাতিল এবং প্রোটেস্টান্টিজমকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এই ধারা চলতে থাকে মহান ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত। এর মধ্যে উপায়ন্তর না দেখে বহু য়ুগুনো মাতৃভূমি ফ্রান্স ত্যাগ করে বর্হিবিশ্বের আশ্রয়ে অভিযান চালান। তাঁদের একটি দল দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলবর্তী পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ 'কেপ্'-এ এসে বসতি গাড়েন। তাঁরা এখানে প্রথমে কৃষিজীবী হিসেবে বসতি স্থাপন করেন। পরে ওলন্দাজদের সঙ্গে যৌথভাবে ক্রমশ দেশটির মূলভূমির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে। পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা এবং ভারতীয় মালয় উপত্যকা থেকে নিয়ে আসেন সহস্রাধিক দাস-শ্রমিক কৃষি খামারে নিয়োগ করার জন্য। ধীরে ধীরে এই বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকরাই 'বোয়ার' গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় মূল অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গরাও তাঁদের দাসত্বের শিকার হয়ে পড়েন।

উনিশ শতকের দিকে বৃটিশ অভিবাসীরা এই অঞ্চলে এসে পৌঁছুতে শুরু করেন এবং আবিষ্কার করতে থাকেন একটার পর একটা স্বর্ণ, হীরা ও বিভিন্ন মূল্যবান ধাতব পদার্থের খনি। ক্রমশ এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের কর্তৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব বাঁধে বোয়ারদের সঙ্গে নতুন অভিবাসীদের। সংঘটিত হয় রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ যা 'এঙ্গলো-বোয়ার যুদ্ধ' (১৮৯৯-১৯০২) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে বৃটিশদের বিজয় সূচিত হলে পরে তাঁরা ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা'। তাঁরাই প্রথম বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণকারী অর্থাৎ ঘৃণ্য 'এপার্টহেইট ল'র প্রবর্তক।

এপার্টহেইটের শুরু

১৯৪৮ সালে বৃটিশদেরকে হটিয়ে দিয়ে বোয়াররা পুনরায় ক্ষমতা দখল এবং সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে একাধিক বৈষম্যমূলক আইন চালু করেন যা 'এপার্টহেইট ল' নামে পরিচিত। যা দিয়ে ধ্বংস করতে উদ্যত হন স্থানীয় আফ্রিকানদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা এবং স্বাভাবিক অধিকারসমূহ। কিন্তু বহিরাগত শ্বেতাঙ্গদের অবৈধ আইন প্রণয়ন, অত্যাচার, নির্যাতন ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠলে নিজেদের জন্মভূমি ও স্বাধিকার রক্ষায় তাঁরাও প্রতিবাদী, যুদ্ধাংদেহী এবং মারমুখী ভূমিকা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এই উত্থানে মৃত্যুবরণ করেন অসংখ্য নিরীহ মানুষ। মার খেতে খেতে তারপর তাঁরা সংগটিত হতে থাকেন। দল, সমিতি, সংস্থা গঠন করে বিশ্বব্যাপী সচেতন মুক্তিকামী মানুষের সহযোগিতা কামনা করে দূত পাঠাতে শুরু করেন বিভিন্ন দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেনে অবস্থানরত আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত নাগরিকদের লড়াইয়ের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

অবশ্য তার আগেই ১৯৫০ সালে তিনজন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী পাদ্রী মিখায়েল স্কট্, জন্ কলিন্স এবং ট্রেভর হাডেলস্টন জাতিবিদ্বেষী 'এপার্টহেইট ল'র বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা শুরু করেন। তাঁদের মাধ্যমেই এপার্টহেইটের সংবাদ য়োরোপের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়। বৃটেনের লেবার পার্টি এই অমানবিক আইনের বিরুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। মানবতা, গণতন্ত্র, সুসভ্যতায় বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতির মানুষরা ক্রমশ প্রতিবাদে ফেটে পড়তে থাকে নিজ নিজ রাষ্ট্রে। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশসমূহের সরকার প্রশাসন এপার্টহেইট সরকারকেই সমর্থন করতে থাকে। যেমন মার্কিনী জনসাধারণ অ্যান্টি-এপার্টহেইট আন্দোলনকে (AAM) ক্রমশ শক্তিশালী করলেও প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের প্রশাসন পর্যন্ত আমেরিকার প্রতিটি সরকার এপার্টহেইট সরকারকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সমর্থন করে গেছে। রিগ্যান প্রশাসনের গঠনমূলক সংশ্লিষ্টতা নীতি (Constrauctive Engagement Policy) এপার্টহেইট সরকারকে সশস্ত্রশক্তি যুগিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার

প্রিটোরিয়া সরকারের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারী ছিল আমেরিকা। কিন্তু ১৯৮৬ সালে রিগ্যানের বাধা দান সত্ত্বেও মার্কিন কংগ্রেসে সমন্বিত অ্যান্টি-এপার্টহেইট নীতি (The Comprehensive Anti-Apartheid Act) গৃহীত হলে পরে এই আন্দোলন প্রভূত শক্তি অর্জন করে। এএএম-এর উত্তাল ঢেউ এসে লাগে জাপানেও। যদিওবা সরকার এপার্টহেইট-শাসকদেরকেই সমর্থন করে আসছিল প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক কারণে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত। এবছর এই আইন বিলুপ্ত ঘোষিত হয়। এপার্টহেইট সরকারকে যে গুটিকয় রাষ্ট্র সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে এগুলোর মধ্যে আমেরিকা, বৃটেন, ইতালি, জার্মানী এবং এশিয়া থেকে জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও জাপান

মেইজি সংস্কারের যুগে (১৯৬৮-১৯১২) যে সকল জাপানি নাগরিক বর্হিবিশ্বে অভিবাসী হওয়ার ইচ্ছে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সমৃদ্ধ অঞ্চলে গমন করেন তাঁদের মধ্যে কোমাহেই ফুরুইয়া নামে এক ব্যবসায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ্ টাউনে একটি পাইকারী মালামালের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৮ সালে এবং ব্যবসায় সফল হন। এই সময় মেইজি সরকার এই দেশটিকে জাপানি অভিবাসীদের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করে। এমনকি একটি অর্থনৈতিক মিশনও পাঠানো হয় সে দেশের খনিগুলোতে শিক্ষানবিশ হিসেবে জাপানি শ্রমিক প্রেরণ করা যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। এই পরীক্ষার ফলস্বরূপ ১৯০৮ সালে সরকার কর্তৃক প্রেরিত অভিবাসী বহনকারী একটি জাহাজ কেপ্ টাউন এবং ডারবানে পৌঁছে। এইভাবে ক্রমশ দুই দেশের মধ্যে অভিবাসী নিয়োগ এবং বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয় তবে তা খুব শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে উভয় দেশের মধ্যে সামরিক কলা-কৌশল নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয় যার ভিত্তিতে জাপান ১৯১০ সালে স্থানীয় অধিবাসী জুলিয়াস জেপ্পি (Julius Jeppe) নামে এক ভদ্রলোককে সম্মানীত প্রতিনিধি (Honorary Consul) নিযুক্ত করে। কিন্তু দক্ষিণ

আফ্রিকার বর্ণবাদী নীতি জাপানি সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ডকে সংকুচিত করে। ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কর্তৃক কঠোর অভিবাসন বিধি (Immigration Act) তৈরি হয়। কিন্তু তাতে জাপান কোন প্রকার বিরাগ প্রকাশ না করে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যায় দেশটির অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে অনুপ্রবেশের। তার পাঁচ বছর পর ১৯১৮ সালে একটি সুযোগ আসে কেপ্ টাউনে প্রথম কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠা করার। সরকার এই সুযোগকে নিপুণভাবে কাজে লাগায়।

১৯৩০ সালের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাঅর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে জাপানের ওপর থেকে অভিবাসন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। পরিবর্তে সরকার উল্ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বিনিময়ে জাপানও সিল্কসহ অন্যান্য পণ্য পাঠাতে থাকে। স্বাভাবিক সম্পর্কের সুবাদে ১৯৩৭ সালে জাপান দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিনিধি দপ্তর স্থাপন, অনুরূপ দক্ষিণ আফ্রিকাও তার পরের বছর টোকিয়োতে একটি দপ্তর উন্মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ১৯৪২ সালে বিশ্বযুদ্ধের কারণে সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে বাণিজ্য পুনঃস্থাপিত হয়। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জাপানি কনস্যুলেট-জেনারেল অফিস দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া শহরে।

ক্রমশ দক্ষিণ আফ্রিকা-জাপান সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ রূপ ধারণ করে এবং প্রলম্বিত হয় ১৯৬০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। ১৯৬২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা টোকিয়োতে কূটনৈতিক দপ্তর কনস্যুলেট জেনারেল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীল বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হয়। ১৯৮০ সালে জাপান দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬২ সালে যখন জাতিসংঘসহ চার্বিদিক থেকে এপার্টহেইটবিরোধী নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে থাকে, তুমুল সমালোচনা ও বিক্ষোভে ফেটে পড়তে থাকে বিশ্ব, তখন শিল্পোন্নত দেশগুলোর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জাপানি কোম্পানিগুলোর স্বার্থান্বেষী ভূমিকার খবরও প্রকাশ হয়ে পড়ে। ১৯৬৮ সালে সরকার জাপানি কোম্পানি কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় সরাসরি বিনিয়োগ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে এবং বিশ্বকে দেখানোর জন্য 'সেকেন বুন্‌রি'

(Separation of Politics from Economics) নামক এক অধ্যাদেশও জারি করে যার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বিদ্যমান বাণিজ্যিক সম্পর্ক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক স্বাধীন পন্থা হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। নানা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও জাপান-দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে। কিন্তু ১৯৮৫ সালে যখন এপার্টহেইট সরকার রাষ্ট্রব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে তখন যৌথভাবে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয় জাপানের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য। তখন উপায়ন্তর না দেখে জাপান বাধ্য হয়ে এই বছরের অক্টোবর মাসে দুটি বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। একটি হচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সেনা ও পুলিশ বাহিনীর কাছে কম্পিউটার বিক্রি এবং অন্যটি ক্রুগারেন্ড গোল্ড কয়েন আমদানি।

তুমুল চাপের মুখে পড়ে ১৯৮৬ সালে আরও চারটি নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেমনঃ

ক] পিগ আয়রন এবং ইস্পাত আমদানি।

খ] দক্ষিণ আফ্রিকায় পর্যটন ভিসা (অনুমোদন)।

গ] জাপানে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় বিমান আগমন।

ঘ] জাপানি সরকারি কর্মচারীদের দক্ষিণ আফ্রিকার বিমানবহর ব্যবহার।

প্রকৃতপক্ষে, এই নিষেধাজ্ঞাগুলো ছিল নামমাত্র। তাতে করে চলমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর কোন প্রকার প্রভাব পড়েনি। বরং যে সকল স্থান থেকে মার্কিনী ও য়োরোপীয় কোম্পানিগুলো তাদের বিনিয়োগ এবং ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে সুযোগ সন্ধানী বাজপাখীর মতো সেখানেই জাপানি কোম্পানিগুলো ফাঁকা পেয়ে বাজার দখল করতে বিলম্ব করেনি। এইভাবে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত দেশটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম সক্রীয় বাণিজ্যিক অংশীদার।

জাপান প্রধানত আমদানি করত সে দেশ থেকে অশোধিত কাঁচামাল যেমন কয়লা, সোনা, প্লাটিনাম, কৃষিপণ্য মেইজ, চিনি প্রভৃতি। এছাড়া জাপানি রপ্তানি নির্ভর উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন কলকারখানাগুলো চালানো সম্ভব

ছিল না। আর জাপান থেকে রপ্তানি হত ভারী শিল্পপণ্য যেমন যানবাহন, পরিবহন যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যেমন ভিডিও ডেকসেট। রপ্তানিকৃত গাড়িগুলো ছিল অধিকাংশ টয়োটা, নিস্‌সান কোম্পানির তৈরি যার পরিমাণ ৪৪%। এইসব গাড়ি দক্ষিণ আফ্রিকার সেনা ও পুলিশবাহিনী ব্যবহার করত। মোটর কোম্পানিগুলো ছাড়াও সোনি, হিটাচি, তোশিবা প্রত্যেকটির একটি করে প্রতিনিধি দপ্তর ও সরবরাহ কেন্দ্র অবস্থিত ছিল সেখানে। জাপানি টিভি, টেপরেকর্ডার, রেডিও, কম্পিউটার এর বাজার ছিল একতরফা--বিশাল। সর্বমোট জাপানের প্রথম শ্রেণীর পঞ্চাশটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায় যারা এপার্টহেইট সরকারকে সমর্থন যুগিয়েছিল জাপানকে বিশ্বের এক নম্বর বাণিজ্যিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাকে সরাসরি অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে। থোরাই মূল্যায়ন করেছে বিশ্ববিবেককে। এই কোম্পানিগুলো হচ্ছে, মিৎসুই বুসসান (ট্রাস্ট), ইতোচু শোওজি, নিশ্‌শোইওয়াই, মিৎসুবিশি শৌজি, সুমিতোমো শৌজি, মারুবেনি, নিচিমেন, তোমেন, মাৎসুশিতা, তোয়োতা ৎসুশৌ, মেইওয়া সানগিয়ো, সানসেই বুসসান, টৌকিয়ো শোওশা, টয়োটা মোটরস, নিস্‌সান মোটরস, ইসুজু মোটরস, মাজদা মোটরস, মিৎসুবিশি মোটরস, ডাইহাৎসু মোটরস, হিনো মোটরস ম্যানুফেকচারিং, নিস্‌সান ডিজেল, হিটাচি, তোশিবা, সোনি, ফুজি ইলেকট্রিকস, সানয়ো ইলেকট্রিকস, শার্প, হিটাচি কনস্ট্রাকশন, কোমাৎসু কর্পোরেশন, সুমিতোমো ইলেকট্রনিকস, ব্রীজস্টোন, ফুজিফিল্ম, জেট্রো (Japan External Trade Organization) প্রভৃতি।

দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ পাশ্ববর্তী দেশ নামিবিয়া থেকে জাপান ৪৪% ইউরেনিয়াম আমদানি করত, না হলে তখনকার একাধিক নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট (বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র) স্থাপন করা সম্ভব হত না; সম্ভব হত না রপ্তানিযোগ্য যানবাহন, ভারী যন্ত্রপাতি ও ইলেক্‌ট্রোনিক্স পণ্যসাগ্রমী উৎপাদন করা। এক কথায় জাপানের এই সকল শক্তিশালী পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোকে চালু রাখতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে এপার্টহেইট।

১৯৭৪ সালের দিকে জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ন্ত্রিত নামিবিয়ার প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যাকে 'ডিক্রি নং ওয়ান' অভিধায় আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা দেয়া হয়। জাপান এই আইন দীর্ঘদিন অমান্য করেছে। সরকার এবং কোম্পানিগুলো বরং দাবি করে বলেছে যে, ইউরেনিয়াম বৃটেন থেকে আমদানি করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বৃটেনে এই ধরনের কোন খনি নেই, ছিলও না কোনদিন! অথচ এই ইউরেনিয়াম খনিতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যে সকল দরিদ্র কৃষাঙ্গ শ্রমিক কাজ করতেন তাঁদের জন্য জুটত না উপযুক্ত মজুরি কিংবা নূন্যতম নিরাপত্তা। এমনকি শ্রমিকরা জানতেনও না যে, ঘামের জলে সিক্ত যেসব মূল্যবান সম্পদ তোলা হচ্ছে প্রতিদিন গভীর মাটির তলদেশ থেকে তা শুধুমাত্র জাপানিদের জন্য! জাপানই এর বৃহত্তম আমদানিকারক! জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অন্যান্য বিদেশী এমনকি কিছু জাপানি কোম্পানি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেও উপরোক্ত কোম্পানিগুলো বছরের পর বছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাণিজ্য চালিয়ে গেছে। লাভবান হয়েছে বিপুলভাবে। লাভ করেছে প্রভূত পরিমাণ ডলার! বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাদের নিলর্জ্জ কর্মকান্ডের কাছে মাথা নত করেছে বিশ্বমানবতা।

জাপানে অ্যান্টি-এপার্টহেইট আন্দোলন

রাজনীতিকদের মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করে জাপানেও একাংশ সচেতন মানুষ সমবেত হয়ে 'অ্যান্টি-এপার্টহেইট আন্দোলন' গড়ে তোলেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সর্বশ্রেণীর মানুষ টোকিয়ো, ওসাকা মহানগরীর রাজপথে মিছিল, বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন রাজধানী টোকিয়োর কেন্দ্রস্থল এবিসু শহরে 'জাপান অ্যান্টি-এপার্টহেইট কমিটি-টোকিয়ো' কার্যালয়। তার শাখা-প্রশাখা দ্রুত বিস্তার লাভ করে ওসাকা, কিয়োতো, শিজুওকা, হিরোশিমা, মাৎসুদো এমন কি দূরবর্তী দ্বীপ কুমামোতো, হোক্কাইদো প্রদেশের রাজধানী সাপ্পোরো মহানগরেও। মোদ্দাকথা সারা জাপানব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা প্রকাশ

করতে থাকেন বিভিন্ন তথ্যমূলক পত্রপত্রিকা, প্রচারপত্র, পোস্টার; আয়োজন করেন সভা-সেমিনার এবং তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক অবস্থা, পরিস্থিতির আলোকচিত্র, স্লাইড, ভিডিও প্রদর্শনী। এভাবে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহের প্রতি তৎপর হয়ে ওঠেন। চাপ প্রয়োগ করেন জাপান সরকারের ওপর। এই আন্দোলন ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তাঁদের আমন্ত্রণে ১৯৮৭ সালে জাপান সফর করেন এপার্টহেইটবিরোধী বিভিন্ন সংগঠন যেমন ANC=African Natioanl Congress এর নেতা অলিভার তামবো (Oliver Tambo), NF=Natioanal Forum এর চেয়ারম্যান এবং AZAPO= Azanian People's Organization এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সেথস্ কুপার (Saths Cooper), UDF=United Democratic Front এর প্রথম সারির নেতা ড. এলেন বুজাক (Dr. Allan Boesak), নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দক্ষণি আফ্রিকার খ্রীস্টান ধর্মীয় নেতা ডিসমন্ট এম. টুটু, শান্তিবাদী নেত্রী মোউদ জ্যাকসন (Maud Jacson) প্রমুখ। তাঁরা সকলেই জাপান সরকারকে এপার্টহেইট সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিতে আহ্বান জানান। কঠোর সমালোচনাসহ নিন্দা জানান জাপানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী স্বৈরাচারী শেতাঙ্গ সরকারের সঙ্গে যৌথ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য। জাপানি জাতীয় দৈনিকসমূহ ছাড়াও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম তাঁদের বক্তব্য, সংবাদ এবং সাক্ষাৎকার তুলে ধরে।

উল্লেখ্য যে, এই বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে ১৯৬১ সালের দিকে জাপানি রাজনীতিকরা শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার এপার্টহেইট সরকারের পক্ষ থেকে 'অনারারি হোয়াইট' উপাধি লাভ করেন। জাপান সরকার তা গ্রহণও করে নেয়! জাপানে গঠিত হয় 'স্প্রিঙ্গবক ক্লাব' এবং 'জাপান-এস.এ. ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি'। এক নৈশভোজে সংস্থাটি জাপানস্থ দক্ষিণ আফ্রিকার কূটনীতিককেও আমন্ত্রণ জানায়। এই ধরনের সম্প্রীতিমূলক কর্মকান্ড এখানেই থেমে থাকেনি। ১৯৮৪ সালে বিশ্বকে হতবাক করে দিয়ে ক্ষমতাসীন এলডিপি-র ৪০ জন সাংসদ নতুন এক ঐক্য স্থাপন করেন এপার্টহেইট সরকারের সঙ্গে। তাঁরা

এক ভাষ্যে বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকা হচ্ছে দুর্লভ ধাতব সম্পদের ভান্ডার যা সূক্ষ্ম মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি তৈরিতে জাপানের জন্য অপরিহার্য।" তাঁরা রাষ্ট্রদূত বিনিময় এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য জাতীয় বিমান যোগাযোগেরও দাবি জানান। এই সংগঠনটি গঠন করার পর পরই দেশ-বিদেশ থেকে কঠোর নিন্দা ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয় উদ্যোগীদের। যদিও ইতিমধ্যে য়োরোপে 'অ্যান্টি-এপার্টহেইট পার্লা-মেন্টারিয়ান লীগ' গঠিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে ভারতে গঠিত হয় অনুরূপ পার্লামেন্টারি সংস্থা (Parliamentarians for Action for Removal of Apartheid (PARA-India,1986) মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, গোপালকৃষ্ণ গোক্‌লে প্রমুখের ধারাবাহিক অ্যান্টি-এপার্টহেইট কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে। কিন্তু এইসব কর্মকান্ডের প্রতি সামান্যই ভ্রূক্ষেপ করে জাপান সরকার। এই ধরনের প্রকাশ্য কর্মকান্ড যুদ্ধবিরোধী, শান্তিবাদী এবং সকল প্রকার বৈষম্যবিরোধী জাপানি সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তা অবগত হওয়া সত্ত্বেও! 'কালারড্ পিপল্' (সংকর জনগোষ্ঠী) হিসেবে জাপানিরা শ্বেতাঙ্গ সরকারকে সমর্থন করে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটায় সভ্য ইতিহাসে এ কথা বললে কি অন্যায় হবে?

এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার নায়কদের মধ্যে রাজধানী টোকিয়োর বর্তমান গভর্ণর শিনতারো ইশিহারা অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন এই 'জাপান-এস.এ.পালার্মেন্টারিয়ানস্ ফ্রেন্ডশীপ্ লীগে'র নির্বাহী সম্পাদক। এক ভাষ্যে তিনি তখন বলেন, "কৃষ্ণাঙ্গদেরকে এক ব্যক্তি এক ভোট অধিকার প্রদান করলেও সেটা বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করবে, কেননা তারা নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচিত। কালারড্ পিপল হিসেবে জাপানিদের উচিত হবে তাদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রয়োগ করা।" এই ধরনের মন্তব্য প্রিটোরিয়া শাসককুলের চিন্তাচেতনার হুবহু অনুরূপ। ১৯৮৮ সালে ইশিহারা লীগ পরিত্যাগ করেন পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হওয়ার কারণে। এই ধরনের সংবিধানবিরোধী, স্বজাতির প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য ও কর্মকান্ডের হোতা কি করে সরকারের মন্ত্রী হতে পারেন এটাই আশ্চর্যের বিষয়! এই ধরনের একাধিক অপকান্ডের কারণে তিনি সংকীর্ণমনা ন্যাশনালিস্ট এবং রেসিস্ট (জাতি বিদ্বেষী) হিসেবে পরিচিতি

লাভ করেছেন। বলাবাহুল্য, ইশিহারা বাহ্যত লীগ পরিত্যাগ করলেও লীগের দায়িত্বহীন কর্মকান্ড থেমে থাকেনি। ইশিহারারা এখনও বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সোচ্চার এবং সরকারের ভিতরে থেকে প্রভাব খাটিয়ে চলেছেন জাপানে আন্তর্জাতিকতাবাদের পথকে রুদ্ধ করার জন্য।

স্বজাতির প্রতি বৈষম্য

জাপানে 'উবাসুতে-ইয়ামা' নামে একটি কথা আছে। উবা হচ্ছে, বৃদ্ধলোক; সুতে বা সুতেরু অর্থ নিক্ষেপ করা আর ইয়ামা হচ্ছে পাহাড়। তরজমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, বৃদ্ধদেরকে নিক্ষেপ করার পাহাড়। প্রাচীনকালে অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে পাহাড়ে ফেলে আসা হত। অর্থাৎ সামাজিক জীব হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে বিরত থাকা। এই ধরনের বৈষম্য হৃদয়বিদারক বটে! প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, জাপানি তরুণ প্রজন্ম বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল নয়! প্রকৃতপক্ষে, বর্ণ, পেশা ও জাতিবৈষম্য জাপানি সমাজে নতুন কোন ঘটনা নয়। বহু বছরের প্রাচীন 'বুরাকুমিন (অস্পৃশ্য) সমস্যা' আজও এই সমাজের গভীরে শক্তভাবেই প্রোথিত রয়েছে। তাইশো যুগে (১৯১২-২৫) যে ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সংস্কার সাধিত যাকে বলা হয়ে থাকে 'তাইশো ডেমোক্রেসী' তেমন কোন মুক্তিই বয়ে আনেনি নিম্নশ্রেণীভুক্ত 'বুরাকুমিন', 'ছেনমিন' বা 'এতা' শ্রেণীর মানুষদের জন্য। যে কারণে ১৯২২ সালে এই শ্রেণীর মানুষ কলকারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রকাশ করেন 'সুইহেইশা ইশতেহার' (Levelers Declaration) বা সাম্যবাদী সমাজের ঘোষণাপত্র।

বুরাকু মুক্তি আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ লাভ করে এসময় থেকেই। সম্রাট বা সরকারি হর্তাকর্তারা এতে ভ্রূক্ষেপ করেননি আদৌ। কিন্তু তাঁদের আন্দোলন থেমে থাকেনি। আজ তাঁরা সমাজে যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিনীদের তৈরি সংবিধানে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক, মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধান এবং সকল প্রকার বৈষম্যহীনতার উল্লেখ থাকলেও তা কার্যকরী হয়েছে কমই। বৈষম্য

রয়েই গেছে। অবশ্য সরকার বুরাকুসমস্যাকে 'দোওয়া মোনদাই' নামে অভিহিত করে সমাজে সমতা আনার জন্য চেষ্টা করছে না তা নয় কিন্তু বিত্তশালী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং রাজনীতিকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার শ্রেণীস্বার্থ নীতিই এই সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে। সারা জাপানে এখনো ছয় হাজার বুরাকু পল্লী বা 'দোওয়া চিকু' রয়েছে যেখানে নিম্নপদবীর কর্মজীবীরা বসবাস করছেন। তাঁরা হচ্ছেন মুচি, কসাই, ডোম, আবর্জনা পরিস্কারক, জীবজন্তুর শব সৎকারকারী, ধাতব যন্ত্রপাতির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি। অন্ততঃপক্ষে একশ বছর আগে আরও নিম্নপেশাদারী লোকজনরাও বুরাকুমিন হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী, নাপিত, মেথর, অন্ধ, পঙ্গু, ভিক্ষুক প্রভৃতি! এমনকি আজকের বিশ্বখ্যাত জাপানি জাতীয় নাট্যকলা 'কাবুকি' থিয়েটার পর্যন্ত বুরাকুপল্লীর বিনোদন হিসেবে বিবেচিত হত! তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এখনো এই মনোভাব গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে বহু জাপানির মানসিকতায় যা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো বুরাকু বা দোওয়া অঞ্চলের লোকদের চাকরী দিতে নারাজ। তাঁদের কাছে রয়েছে বুরাকু বংশজ ব্যক্তির গ্রন্থভুক্ত তালিকা। একদল বৈষম্যবাদী জাপানি এই বুরাকু তালিকা তৈরি করে বিক্রি করে থাকেন। শিক্ষিত ও এলিট জাপানিদের বদ্ধমূল ধারণা যে বুরাকুরা 'বিদেশী বংশজ'! এই প্রকার বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে সংবিধান পরিপন্থী। কিন্তু কে মানছে তা? জাপানিরা জাপানিদেরকেই ঘৃণা করে আসছেন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়ভাবে বহু বছর ধরে! তাঁদেরকে একঘরে করে রাখার পক্ষে অনড় বর্তমান ইন্টারনেটের যুগেও এক শ্রেণীর ক্ষমতাসম্পন্ন নাগরিক। ভাবলে অবিশ্বাস্য ঠেকে বৈকি! কমপক্ষে হাজার বছর ধরে চলে আসছে এই বৈষম্য। যেখানে স্বজাতিবৈষম্য জাপানে এখনও বিদ্যমান সেখানে দরিদ্র দেশগুলো থেকে আগত বিদেশীরা যে অনুরূপ বৈষম্যের শিকার হবেন তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! আন্তর্জাতিক মহলে বহুল পরিচিত দেশজ আদিবাসী 'আইনু-বিদ্বেষ' (জনসংখ্যা ২৪,০০০) জাপানের ভাবমূর্তিকে

আরেকবার অনুজ্জ্বল করেছিল ইয়াসুহিরো নাকাসোনে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে এক ভাষ্যে আইনুদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসেছিলেন বলে (Former Prime Minister Yasuhiro Nakasone once said he was glad Japan was a homogeneous nation, because it was the blacks and the hispanics that pulled literacy levels down in the United States. As is the case with most Japanese, he ignored two other races -the Ainu on Hokkaido and the Okinawans of the Ryukyu islands.)

এখন একমাত্র হোক্কাইদো অঞ্চলে বসবাসকারী 'আইনু'রা বহু বছর সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সাম্প্রতিককালে সরকার তাঁদের দিকে নজর দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালে 'আইনু'দের মধ্য থেকে প্রথম ও আপাত শেষ ডায়েট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন সমাজতন্ত্রী দলের টিকিট নিয়ে শিগেরু কায়ানো। এ ছাড়া কোরিয়ান নাগরিক (৬,৮০,০০০) এবং জাপানে জন্ম কোরীয়, চীনা প্রভৃতি জাতির প্রজন্মরা সর্বপ্রকার কর পরিশোধ করা সত্বেও পাচ্ছেন না ভোটাধিকার, সরকারি ক্ষেত্রে চাকরী পাওয়া তো দূরের কথা। অন্ততঃপক্ষে বিদেশীদেরকে আঞ্চলিক প্রশাসনিক সংস্থার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এবং ভোটাধিকার প্রদানের একটি প্রস্তাব ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে ডায়েটে। ক্ষমতাসীন 'এলডিপি'র অধিকাংশ সদস্যই আঞ্চলিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে বিদেশীদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মতামত ব্যক্ত করেছেন। তুলনামূলকভাবে উদারমনস্ক স্বদলের সদস্যদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন এবং থাকবেন বলেই মনে হচ্ছে। অথচ এঁরাই যখন-তখন যত্রতত্র আন্তর্জাতিকতার বুলি ছোড়েন! বিদেশীদের সার্বিক সমস্যা বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদেরও কোন চিন্তাভাবনা বা সমর্থন রয়েছে এমনটি আজ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি। বড়ই নিস্পৃহ তাঁরা।

সাম্প্রতিককালে নারী ও শিশুবৈষম্য জাপানে একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অবশ্য জাপানে নারীদের অবস্থা কোনকালেই সুখকর ছিল না। যে শিশুর জন্য জাপান স্বর্গ বলে সুখ্যাত--আজকে সেই জাপানে শিশুনির্যাতন, শিশুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শিশুখুন, শিশুনির্যাতন, অনাহারে রেখে মৃত্যুর দিকে

ঠেলে দেয়ার ঘটনা এখন প্রায়শ পত্রিকার শিরোনাম হয়ে উঠছে। এইসব নির্যাতন থেকে শিশুদের রক্ষাকল্পে জাপানের ৪৪টি প্রধান শহরে তৎপর ১২৮টি শিশুরক্ষা সংস্থার কর্মকর্তারা পর্যন্ত এখন নির্যাতনকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন (The Daily Yomiuri

জাপানি নারীর প্রসঙ্গ উঠলে একটি ইমেজ মাথার মধ্যে ভেসে ওঠে সেটি হল---'গেইশা'। শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে সকল মেয়ে বা নারী বিভিন্ন চারুকলায় পারদর্শী এবং অতিথি-দর্শককে বিনোদনের মধ্য দিয়ে সেবা করেন। যেমন ইকেবানা, নৃত্য-গীত-বাদ্য, চা-পান অনুষ্ঠান ইত্যাদির চর্চা। একসময় সমাজে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্তু 'য়োশিওয়ারা' বা 'গণিকালয়ে'র মেয়েরা বা নারীরা ছিল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন যেমনটি অন্যান্য দেশেও ছিল বা এখনো আছে। ১৭ শতাব্দীতে শোগুন-যোদ্ধা তেয়োতোমি হিদেয়োশি, ইয়েয়াসু তোকুগাওয়া তাঁদের শাসনামলে যথাক্রমে কিয়োতো, এদো (টোকিয়ো) এবং ওসাকাতে য়োশিওয়ারা বা পতিতালয়গুলোকে শহরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করেন। কিয়োতোতে পতিতালয়কে বলা হত 'শিমাবারা', ওসাকাতে 'শিনমাচি' আর এদোতে বলা হত 'য়োশিওয়ারা' বা 'য়োশিহারা'। গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়েরাই সাধারণত এখানে দালালদের মাধ্যমে নিযুক্ত হত। তা ছাড়াও দরিদ্র পিতামাতারা অল্পবয়সী মেয়েদেরকে এইসব পতিতালয়ে বিক্রি করে দিতেন সন্তানের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এদোর য়োশিওয়ারাতে একসময় ৩,০০০ পতিতা ছিল বলে জানা যায়। বলাবাহুল্য, যৌনদাসী এই সকল নারীদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। বছরে তাঁরা শুধু একবার প্রাচীরের বাইরে যেতে পারতেন বসন্তকালে যখন সাকুরা ফুলের উৎসব 'হানামি' অনুষ্ঠিত হত। আর আত্মীয়স্বজন মারা গেলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত হবার অনুমতি পেতেন। বর্তমানে সারা দেশের মহানগরগুলোতে য়োশিওয়ারা না থাকলেও আধুনিক যৌনসেবার অসংখ্য ব্যবসা, সুযোগসুবিধা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান জাপানে পতিতালয় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হলেও এইসব ব্যবসায় বহু দেশী-বিদেশী তরুণী ও নারী ভোগ্যপণ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছেন যুদ্ধোত্তর কাল থেকে। এই

অবস্থার যে খুব পরিবর্তন হয়েছে তাও নয়।

পুরুষশাসিত জাপানি নারীদের অবস্থান কি রকম দীর্ঘদিন এ সমাজে বসবাস না করলে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা অসম্ভব। ধনী দেশেগুলোর মধ্যে একমাত্র জাপানি নারীরাই সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। যা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে! এ দেশের নারীরা কর্মক্ষেত্রে সমকর্মের জন্য পুরুষদের চেয়ে অর্ধেক পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। সন্তান জন্মদানের পর তিন বছরকাল শিশু লালনপালনের জন্য বাধ্যতামূলক ছুটির বিধান যদিও রয়েছে কিন্তু অবসরকালীন বিশেষ কোন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যে কারণে শিশু ও সাংসারিক সকল দায়দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁদেরকে খন্ডকালীন চাকরী না করলে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রেও রয়েছে 'দাইকিয়ো কানগোকু' (Substitute Prison System)সহ নানাবিধ অযৌক্তিক, বৈষম্যমূলক আইন-বিধি-বিধান। 'শিনতাই শোগাইশা' বা 'দৈহিক প্রতিবন্দী'দের ক্ষেত্রেও বৈষম্য-মূলক আচরণ নতুন কিছু নয়। এখন কম্পিউটার না জানার কারণে বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি তরুণ প্রজন্ম এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরূপ আচরণ এবং অনীহা নতুন সামাজিক বৈষম্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর না হলেও জাপানি সমাজের পরতে পরতে বৈষম্য রয়েছে বললে অতিরিক্ত বলা হয় না।

অবশ্য সামাজিক বৈষম্যগুলো দূরীকরণে সরকারি উদ্যোগ রয়েছে। বেসরকারিভাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, NGO, NPO নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে কিছু কাজ হয়নি এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে তবে তা এতই নগন্য যে অন্যান্য শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ। ইতিমধ্যে সুদীর্ঘকাল জাপান প্রবাসী মারুতেই ৎসুরুনেন জনৈক ফিন্ডল্যান্ডবাসী এই দেশীয় নারীকে বিয়ে করে নাগরিকত্ব নিয়ে একাধিকবার ব্যর্থ হয়ে ডায়েটে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন যা গত দেড়শ বছরের মধ্যে এই প্রথম! তবে সমাজে বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ঘটনা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। আপাতত অন্য আর কোন বিদেশী ব্যক্তিত্ব নেই যিনি জাপানি রাজনীতির

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বহু আন্তর্জাতিক, এশিয়া-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক সংগঠন, সংস্থা রয়েছে সরকারি-বেসরকারিভাবে জাপানে কিন্তু তাদের কর্মকান্ডের সুফল 'আন্তর্জাতিকতাবাদ'কে কতখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে তা প্রশ্নাতীত নয়। যেমন বর্তমান বিশ্বায়নেব যুগেও জাপান একটির বেশি নাগরিকত্ব গ্রাহ্য করতে নারাজ। স্থায়ী ভিসা (Permanent Residenceship) পাওয়া সত্ত্বেও বিদেশীদেরকে জাপান ত্যাগের পূর্বে পুনঃপ্রবেশের অনুমোদন (Re-Entry Visa) এর সীল-ছাপ্পর পাসপোর্টে লাগিয়ে নিতে হয়। এই ধরনের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তারা আদৌ তৎপর নন। কয়েক বছর আগেও ভিসা সংক্রান্ত দলিলে বিদেশীদেরকে অহেতুক আঙ্গুলের ছাপ (Finger Print) দিতে হত, এটা এখন রহিত হয়েছে। (অবশ্য সন্ত্রাসবাদের কারণে পুনরায় সেটা চালু হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ।) জাপান সরকারের এই ধরনের রক্ষণশীল মনোভাব অনেকেই জাতি-বৈষম্য অথবা এপার্টহেইটের অনুরূপ বলে বিবেচনা করে থাকেন।

মূলত যাঁরা বৈষম্যবাদী, বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন তাঁরাই সকল প্রকার 'এপার্টহেইট'র সমর্থক হবেন এটা না বললেও চলে। সকল জাপানি না হলেও এই ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন লোক এবং গোষ্ঠী মোটেই কম নয়। তাই এ দেশে রয়েছে নানা ধরনের 'এপার্টহেইট'। উল্লেখ্য যে, যাঁরা এই এপার্টহেইটের হোতা তাঁদের মধ্যে শিনতারো ইশিহারাও একজন। বিদেশী সম্পর্কে তাঁর প্রকাশ্য উস্কানিমূলক, অমাননাকর মন্তব্য দেশ-বিদেশে সমালোচনা, নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় তুলছে। তাঁর এই সকল মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরকারও কোন প্রকার জোরালো মন্তব্য থেকে বিরত থাকার কারণ অজানা! বিশেষ করে ২০০১ সালে প্রদত্ত তাঁর 'সানগোকুজিন' (People from Third Countries) বিষয়ক মন্তব্য ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক, অবমাননাকর। টোকিয়োর নেরিমা শহরে অনুষ্ঠিত এসডিএফ (SDF) এর একটি সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, "time and time again sangokujin, who illegally entered this country, [have] committed atrocious crimes. In the event of an earthquake, riots can be expected, and the army might be

called on to maintain order." প্রকৃতপক্ষে, এই মন্তব্য ছিল সত্যের অপলাপ। ১৯২৩ সালে কানতো বা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মহাভূমিকম্পের পর একটি গুজব রটে যে কোরীয় ও চীনা (তাইওয়ানী) নাগরিকরা জলকূপে বিষ মেশানো এবং আগুন লাগানোর ষড়যন্ত্র করছে। এই রটনা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে এক প্রচন্ড দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। এই দাঙ্গা দমনের লক্ষ্যে প্রায় ৬,০০০ কোরীয় ও চীনা নাগরিককে হত্যা করা হয় বলে কথিত আছে। যদিওবা তৎকালীন বিদেশীদের দ্বারা কোন প্রকার নাশকতামূলক কারসাজির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং বিদেশীরা কোন অপরাধ সংঘটিত করেননি। ইশিহারার বক্তব্যে যা প্রকাশিত হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে! প্রকাশ্যে এই ধরনের ভিত্তিহীন, বৈষম্যমূলক, জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য করাও কিন্তু জাপানি সংবিধানবিরোধী অপরাধ। (Article 14. All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.) দীর্ঘদিন ধরে ইশিহারা এই ধরনের অনেক মন্তব্য করে আসছেন বিভিন্ন সমাবেশ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকারগুলোতে। এই বিষয়ে কিংবা বিলুপ্ত এপার্টহেইট সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্বেও কোন জাপানি রাজনীতিক, কোন অধ্যাপক, কোন ধর্মীয় নেতা তাঁর বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি পর্যন্ত করেননি প্রকাশ্যে কোন সমাবেশে এমনকি কোন গণমাধ্যমে! একমাত্র বিদেশীরাই তাঁর কঠোর সমালোচনা করে আসছেন। খুবই অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে, তাসত্ত্বেও তিনি দুদুবার টোকিয়োর গভর্ণর নির্বাচিত হয়েছেন! এই ধরনের ঘটনা কি এটাই প্রমাণ করে না যে, জাতি এবং সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে 'ইশিহারাদের' প্রতি? আর এই হচ্ছে জাপানের তথাকথিত 'ইন্টারন্যাশলাইজেশন'র নমুনা! এই দেশে একজন বিদেশী জাপানি নাগরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর, এমনকি নাগরিকত্ব পাওয়ার পরও মৃত্যু পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই তাঁকে বিদেশী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে এটা বাস্তব সত্য। 'কোসেকি' (Family Registration Systems) পদ্ধতিই তার প্রকৃত প্রমাণ। জাপানি পারিবারিক কুলজিতে

বিদেশীদের অন্তর্ভুক্তির কোন প্রকার সুযোগ রাখা হয়নি! এটা এক ধরনের হীনমন্যতা বলা যায়। বংশ এবং রক্তের ধারা যেখানে সুসংহত, সুরক্ষিত এবং জাতিশ্রেষ্ঠতার প্রতীক সেখানে জাপান 'আন্তর্জাতিক' হবে কিভাবে? মানব বড় না রক্ত-মাটি বড়? অনেক জাপানির মুখে শুনেছি বিদেশীদের সঙ্গে জাপানিরা সহজে মিশতে না পারা বা তাঁদের ওপর আস্থা রাখতে না পারার প্রধান কারণ হচ্ছে, জাপানিরা 'শিমাগুনি' অর্থাৎ সমুদ্রবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী বা জাতি বলে। এবং এদো যুগে (১৬০০-১৮৬৮) দুশো বছর বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাও এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। ব্যাপারটি কি আসলে তাই? মনে হয় না। সমজাতিক (Homogeneous) বলে কথিত জাপানিদের অভ্যন্তরীণ শ্রেণী ও কর্মভিত্তিক বৈষম্যের ইতিহাস স্পষ্টতই প্রমাণ দিচ্ছে যে, অভিজাত এবং নব্যধনী জাপানিরা 'বংশ' ও 'রক্তের ধারা' সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, খুঁতখুঁতে এবং সংশয়ী। আপন জাতির 'বুরাকু'দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে সম্পূর্ণভাবেই তাঁরা পিছপা, বিদেশীদের ক্ষেত্রেও তাই।

ধনী এবং জি-৭ এর একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও ঐসব দেশগুলোর সঙ্গে বিস্তর ফারাক জাপানের। জাপান এখন পর্যন্ত উন্মুক্ত করেনি আন্ত-র্জাতিক শ্রমবাজার প্রচুর চাহিদা সত্ত্বেও। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু কলকারখানা মুখ থুবড়ে পড়ছে কায়িক শ্রমিকের অভাবে। জাপানি তরুণরা এখন কর্মবিমুখ এবং বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। আঞ্চলিক, দ্বীপবর্তী, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তরুণ-তরুণীরা ছুটছে বড় বড় নগরগুলোর দিকে। ফলে কলকারখানা শুধু নয়, কৃষি, মৎস্যজীবী, ঐতিহ্যবাহী পণ্য প্রস্তুতকারী পরিবারগুলো পর্যন্ত ধ্বসে পড়ছে তরুণ কর্মশক্তি এবং চরম বংশবৃদ্ধি সংকটের কারণে। এই সকল পরিবারের তরুণরা বিয়ের 'পাত্রী' খুঁজে পাচ্ছেন না। চীন, শ্রীংলকা, ভারত, ফিলিপিন্স, ফিজি এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে 'পুত্রবধূ' নিয়ে আসার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু এই সকল বিদেশী বধূরা প্রকৃত জাপানি হতে পারছেন না 'কোসেকি' সমস্যার কারণে। এটি মানবাধিকার পরিপন্থী সমস্যা। এই বিষয়ে জাপানি জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষ আশ্চর্যজনকভাবে নীরব এবং উদাসীন!

বিদেশী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য

জাপানি জনসংখ্যার (১২৭,৬১৯,০০০) মধ্যে আজ বিদেশীদের সংখ্যা হচ্ছে দেড়-শতাংশ (১.৮ মিলিয়ন)। এর বাইরে মাত্র ২,৫০,০০০ বিদেশী আজ ভিসাহীন অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন কম পক্ষে গত ২৫ বছর ধরে জাপানের অভ্যন্তরে! কিন্তু তাঁদেরকে বৈধ করে নেবার কোন পদক্ষেপই সরকার গ্রহণ করেনি একাধিক দেশীয় শ্রমিক সংগঠন এবং কতিপয় আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীর দেন-দরবার, আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও। বরং সংঘবদ্ধ কতিপয় চীনাদের অপরাধ সংঘটনের ধুয়া তুলে এই বিদেশীদেরকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে টোকিয়োসহ সারা দেশ থেকে বিদায় করে দেয়ার জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে টোকিয়ো গভর্ণর এবং কেন্দ্রীয় সরকার। চীনারা একতরফাভাবে একটার পর একটা অপরাধ সংঘটিত করছেন এটাও সত্য। আর অপরাধ সংঘটিত করতে পারছেন তাঁদের পেছনে এক শ্রেণীর শক্তিশালী জাপানির সহযোগিতা, সমর্থন রয়েছে বলেই। এটা কি অস্বীকার করা যাবে? যে কারণে প্রকৃত অপরাধীদেরকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অপরাধীদের ধরার হামলায় ব্যাপক ধরপাকড়ের শিকার হচ্ছেন অন্যান্য দেশের নিরীহ শ্রমিকরা। ঢোকানো হচ্ছে জেলে না হয় জোরপূর্বক ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে স্বদেশে। অনেক ক্ষেত্রে অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারও হচ্ছে। টোকিয়োসহ সর্বত্র ভিসাহীন বিদেশীরা এখন সন্ত্রস্ত, ভীত অবস্থায় কালাতিপাত করছেন। অনেকে গ্রামাঞ্চলে চলে যাচ্ছেন ভয়ে। এশিয়া থেকে আগত অবৈধ বহু বিদেশী শ্রমিকের স্ত্রী-সন্তানও একসঙ্গে অবস্থান করছেন অনেক বছর ধরে। অথচ চরম শ্রমিক সংকটের মধ্যে সরকার ইচ্ছে করলেই বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁদেরকে বৈধ করে নিতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশ দক্ষিণ কোরিয়া বা য়োরোপ যা করেছে। জাপান গো ধরে আছে দক্ষ শ্রমিক ছাড়া সাধারণ কায়িক শ্রমিক সে গ্রহণ করবে না। কিন্তু যাঁরা অন্ততঃপক্ষে গত এক দশক ধরে বিভিন্ন কলকারখানা ও সেবাখাতে কাজ করে আসছেন তাঁরা সকলেই জাপানিদের সমকক্ষ এবং দক্ষ। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা ভাষার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও জাপানিদেব মতোই কর্মদক্ষ তা

বলাই বাহুল্য। বহু ভারীশিল্প ও ক্ষুদ্র কলকারখানা এবং সেবামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাঁদের ওপর নির্ভরশীল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাঁদের না আছে পর্যাপ্ত বাসস্থান, না আছে কোন প্রকার স্বাস্থ্যবীমা, নূন্যতম নিরাপত্তা, আনন্দ-বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা। উপরন্তু, এই সকল শ্রমিক জাপানিদের চেয়ে অনেক কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবহৃত হচ্ছেন, কাজও করছেন প্রতিদিন দীর্ঘসময় ধরে। অনেকের তো বৎসরে কোন ছুটিছাটাও নেই! অবৈধ এবং দুর্বল জেনেই বহু জাপানি অঢেল অর্থের মালিক হয়েছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁদেরকে সস্তায় ব্যবহার করে। কলেকারখায় নানা রকম শারীরিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে শূন্যহাতে স্বদেশ ফিরেছেন তাঁদের সংখ্যাই কি কম? দু/একটি বিদেশী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে তৎপর সংগঠন লড়াই করে চলেছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হলেও ব্যর্থতার ভাগও কম নয়। বৈধ শ্রমিক নয় বিধায় মামলাও দায়ের করা যাচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ জাপানিরা তাঁদের কোন খবরও রাখেন না। রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না বললে সঠিক বলা হয়। পত্র-পত্রিকাও বিচ্ছিন্ন দু/একটি ঘটনা ছাড়া মূল সমস্যা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। অথচ জাপানিরা ভুলে গেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্বে বহু দরিদ্র জাপানি বেঁচে থাকার নিমিত্তে এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ কায়িক শ্রমিক হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের পর সরকারও পাঠিয়েছেন 'আদমব্যবসা'র মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে শত শত জাপানিকে আমেরিকা, ব্রাজিল, পেরু, ডোমিনিকান রিপাব্লিক প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হওয়ার জন্য। কোন কোন অভিবাসী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাবিদাওয়া ও শর্ত পূরণ করেনি বলে অভিযোগ এখনও শোনা যায় তাঁদের কণ্ঠে। তাঁদের অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে একূল-ওকূল দুকূলই হারিয়েছেন। অবশ্য সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী কোইজুমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই প্রতারণার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন (The

'৯০ এর দশকে যে সকল দরিদ্র ফিলিপিনী, থাই, চীনা তরুণীরা

জাপানের পানশালাগুলোতে কাজ করতে আসতেন গণমাধ্যম তাঁদেরকে উপহাস করে 'জাপাইউকি' বা 'জাপানগামিনী' বলে অভিহিত করেছিল! অথচ বহু গ্রামীণ জাপানি নারী দারিদ্র থেকে মুক্তিলাভের আশায় যুদ্ধপূর্ব সময়ে এক শ্রেণীর জাপানির হাত হয়ে এশিয়ার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, হংকং, ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশের নিষিদ্ধপল্লীতে গমন করেছেন, অনেকে বিক্রিও হয়েছেন। তাঁদেরকে তখন বলা হত 'কারাইউকি'। আবার অনেক নারীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পতিতাপল্লীও খোলা হয়েছে। উপরোক্ত অভিসাসীদের দুর্ভাগ্যজনক জীবনের ইতিকথা আজকের জাপানিরা সহজে ভুলে গেলেও ইতিহাস ভোলেনি।

অনুরূপ জাপানে অবস্থানরত মানবেতর জীবনযাপনকারী অবৈধ শ্রমিকদের বৈধতা প্রদান করলে জাপানের ক্ষতি হওয়ার কোন কারণ আছে বলে সচেতন বহু জাপানি মনে করেন না। কেননা কোন কোন ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ী বলছেনও প্রকাশ্যে যে, অদূর ভবিষ্যতে এশিয়া থেকে শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে বর্তমানে কর্মরত অবৈধ শ্রমিক যাঁরা অধিকাংশই এশিয়ার দেশগুলো থেকে আগত তাঁদেরকে বৈধ করে নিতে বাধা কোথায়? সরকারের এই ধরনের উন্নাসিকতা সত্যি বোধগম্য নয়। জাপান সরকার একদিকে এইসব বিদেশী শ্রমিকদের 'মানবাধিকারকে' অস্বীকার করবে অন্যদিকে তথাকথিত 'আন্তর্জাতিকতাবাদে'র জন্য কোটি কোটি ইয়েন ব্যয় করবে এর তো কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! তা হলে কি এই শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক সমাজের বাইরের মানুষ?

অবস্থিত তামাগাওয়া নদীতে একটি সীল (Seal) শাবক কিভাবে পথ হারিয়ে সমুদ্র থেকে চলে আসে এবং বেশ কিছুদিন অবস্থান করে। এই নিয়ে তুমুল কান্ড ঘটে সাধারণ মানুষের মধ্যে। জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে প্রতিদিন সংবাদের শিরোনাম, ফিচার, প্রতিবেদন পর্যন্ত প্রকাশিত, প্রচারিত হয়। প্রাণীটির প্রাণ ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শিশু থেকে বয়স্কদের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না! তারা একে আদর করে নাম দেন 'তামাচান'।

এমনকি তাকে ঘটা করে আনুষ্ঠানিকভাবে কানাগাওয়া-জেলার 'নাগরিকত্ব প্রদান করার ঘটনা পর্যন্ত ঘটে! এই বাড়াবাড়ি সম্পূর্ণভাবে হাস্যকর হয়ে উঠেছে যখন বছরের পর বছর ধরে বিদেশী শ্রমিকদের অমানবিক অবস্থানের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না দেখে! এ কেমন বিচার সভ্য দেশ জাপানের শিক্ষিত নাগরিকদের? ক্রমবর্ধমান বয়স্ক বেকার গৃহহীনদের (হোমলেস) প্রতিও জাপানিদের শীতল মনোভাব অস্বীকার মতো নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের অনীহা, অবজ্ঞা, অবহেলা এক 'এপার্টহেইট' ছাড়া আর কি মনে করা যেতে পারে?

এখন বিদেশীদের খুন, চুরিসহ নানা অপরাধ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। চীনারা অপরাধী বলেই যে সকল বিদেশী অপরাধী হবে এর তো কোন যুক্তি নেই। যেমন বাংলাদেশীদের কথা এখানে আমরা তুলে ধরতে পারি। তাঁদের দ্বারা অপরাধ সংঘটনের হার নিতান্তই কম। কম আফ্রিকানদের ক্ষেত্রেও। অপরাধ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বরং আশংকাজনক হারে জাপানিদের মধ্যেই। সাম্প্রতিককালের 'কিশোর অপরাধ' স্কুল ছাত্রীদের 'এনজো কোসাই' বা 'পয়সার বিনিময়ে দেহবিক্রি' তো জাপানি সমাজের নৈতিক ভিত্‌কেই গুরুতরভাবে ধাক্কা দিয়েছে! ক'জন ধরা পড়ছে আর কজনেরইবা বিচার হচ্ছে? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, 'বিদেশী অপরাধী' যাঁরা জাপানি নাগরিককে বিয়ে করে আছেন তাঁদেরকে সরকার ধরবে কীভাবে? শর্ষের ভূত কি সহজে তাড়ানো যায়? বিদেশীদের ধারণা, আসলে অপরাধের ধুয়া তুলে 'বিদেশী খেদাও' মনোভাবই কাজ করছে এক শ্রেণীর জাপানিদের মানসিকতায়। তার বড় প্রমাণ বিদেশী অপরাধীদের যাঁরা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার মন্তব্য সরকারি-বেসরকারিভাবে প্রতিভাত হয় না। প্রকৃতপক্ষে, "যদি বিদেশীরা এদেশে বসত গেড়ে বসে এবং ক্রমাগত বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটিয়ে চলে জাপানি নারীদের সঙ্গে তাহলে তাঁদের মনোগত 'আর্যরক্ত' কলুষিত হয়ে পড়তে পারে এই আশংকা, সন্দেহ দুই কাজ করছে। যে কারণে তাঁরা বৈধ বিদেশীদেরও ভোটাধিকার দিতে নারাজ"—এমন চিন্তাধারী সচেতন বিদেশী আদৌ কম নয়। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদেশী নিগ্রহের কথাও সংবাদপত্রে মাঝেমাঝে আসে। দ্বিতীয় প্রজন্মের

জাপানি নাগরিক যাঁরা ব্রাজিল, পেরু, আর্জেন্টিন, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশ থেকে এদেশে কাজের জন্য এসেছেন বা জাপানি মালিকদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও বৈষম্যের কথা শোনা যায়। তাঁদের মধ্যে শতকরা একশ ভাগ 'জাপানি রক্ত' থাকা সত্ত্বেও তাঁরা 'বিদেশী' এখানে!

উদ্বাস্তু, শরণার্থী গ্রহণেও জাপান অন্যান্য ধনী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় সর্বনিম্নে। ১৯৯৮ সালে ছিল মাত্র ১৬ জন। গত বছরের শেষদিকে একটি জাতীয় পত্রিকায় দেখা গেল আরও দুজন কমে গিয়ে ১৪ জনে দাঁড়িয়েছে

সরকার গ্রহণ করে না বলে উক্ত কাগজ থেকে জানা গেল। এছাড়া সম্প্রতি জাপানের রক্ষণশীল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও বৈষম্য (Education Apartheid) দেখা দিয়েছে! এর পেছনে সরকারের ইন্ধন রয়েছে বলে শিক্ষকরা মনে করছেন। জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যা সত্যি বিরল।

উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আণবিক বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হওয়ার সুবাদে স্বঘোষিত শান্তিবাদী রাষ্ট্র জাপানকে বাইরে থেকে মানুষ যেভাবে সুন্দর দেশ, সভ্য দেশ, শান্তিপূর্ণ দেশ, বৃহৎ ODA-র দেশ, আধুনিক প্রযুক্তির দেশ বলে মনে করে থাকেন প্রকৃতপক্ষে, এই জাতির অভ্যন্তরে রয়েছে উপরোক্ত নোংরা, কলুষিত দিকগুলো যা তাঁরা খুব কমই জানেন। বোঝা মুশকিল এই জাতিকে যেমন তেমনি রাজনীতিকদেরকেও! জাপানি রাজনীতিকরা অতীত থেকেই রক্ষণশীল এবং 'ন্যাশনালিস্ট' বলে খ্যাত। কিন্তু তাঁদের চিন্তাভাবনা এবং কৃতকর্ম কী সেই ঐতিহ্যের ধারক? জাপানের প্রকৃত ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা 'না সূচক' উত্তরই দেবেন। অন্ততঃপক্ষে যুদ্ধপূর্ব গত ষাট বছর আগেকার জাপান তো এই কথা বলে না। জাপান ছিল এশিয়ার একটি দেশ, এশিয়ারই বন্ধুরাষ্ট্র। সেই ইতিহাসও আছে। যদিওবা আজ চরমভাবে অবহেলিত, বিস্মৃত। আমরা জানি যে একজন প্রকৃত 'ন্যাশনালিস্টই' হতে পারেন একজন সত্যিকার

'ইন্টারন্যাশনালিস্ট'। তাহলে বর্তমান 'ন্যাশনালিস্ট' বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরা আসলে কী এবং কারা? তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন বন্ধুহীন, বিভ্রান্ত, কাগুজে বাঘ এবং স্বার্থপর অর্থাৎ 'আপনপকেট' ভর্তি করার দিকেই তাঁদের আসল লক্ষ্য বলে মনে করা স্বাভাবিক। বর্তমান জাপান সরকারের যে সকল মন্ত্রী, ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনীতিক, ডায়েট সদস্য এবং রাষ্ট্রীয় সচিব রয়েছেন অধিকাংশেরই রয়েছে 'ব্লাড অব লেগেসি'র ইতিহাস অর্থাৎ গত ১০০ বছর ধরে তাঁরা বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক, বাহক এবং শাসক।

জাপানি রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি আর অপরাধের হারও অন্যান্য দেশের তুলনায় বহুগুণ বেশি। তাঁদের দুর্নীতির খবর প্রকাশ হওয়ার ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার। সমালোচকদের কাছে তাঁরা জনপ্রিয় তো ননই বরং 'সেইজিইয়া' অর্থাৎ সাধারণ 'রাজনীতিওয়ালা' নামে পরিচিত। তরুণ প্রজন্মের চোখে তাঁরা 'দুধওয়ালা', 'ফেরিওয়ালা', 'মাছবেপারি' ইত্যাদির 'প্রতিমূর্তি' নিয়ে বিরাজিত। প্রকৃতপক্ষে, এই দেশের জনগণ এবং রাজনীতিকরা বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে সমানভাবে অনাগ্রহী। যে কারণে হতে পারছেন না সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এশিয়ার প্রতিনিধিত্বকারী অগ্রাধিনায়ক। এই অভিযোগ প্রায়শ শোনা যায়।

বস্তুত বিশ্বায়নের এই যুগে, একুশ শতকের প্রারম্ভে জাপানকে তার অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে আন্তর্জাতিকতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে 'বৈষম্যহীন এক সমাজ' প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। যা হয়ে উঠবে বিশ্ব ও বৃহত্তর এশিয়ার জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আর সেই সুযোগ এবং সময় তার হাতেই রয়েছে।